বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত-সার

A special boon to the B. A. students who have taken up Bengali as second language. Some portions of this book will render a substantial help to the M. A. students of Indian vernacular.

(A digest of Dr. Sen, Dr. Chatterjee, Prof. B. C. Majumdar and all prominent Scholars **with new interpretation and new light.**)

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত।

অধ্যাপক—শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস এম-এ

ও

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

[১৯৩২ খৃষ্টাব্দ]

মূল্য ২॥০

মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিঃ, ৫৬নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গ্রন্থকারের নিবেদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় বঙ্গভাষা যাঁহারা ২য় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের সুবিধার্থ এবং অত্যল্প সময়-ব্যয়ে যাঁহারা আমাদের ভাষা-জননীর, জন্ম, ক্রমবৃদ্ধি এবং তাঁহার লোভনীয় সম্পদগুলির পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক তাঁহাদিগের উদ্দেশে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি লিখিত। প্রধানতঃ বি-এ পরীক্ষার্থীদিগের উপযোগী এবং বিশ্ববিদ্যালয়-নির্দ্দিষ্ট **Syllabus** অনুযায়ী করিয়াই ইহা লিখিত হইয়াছে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অদ্যাবধি যত প্রকার আলোচনা ও গবেষণা হইয়াছে, ঐ সকলের সারমর্ম্ম এবং আমাদিগের যৎসামান্য অভিজ্ঞতার ফলও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের কতিপয় অংশ বঙ্গভাষায় এম্-এ পরীক্ষার্থীদিগেরও যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

এই পুস্তক রচনা-কার্য্যে আমরা স্বনামধন্য সাহিত্যাচার্য্য শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ মনস্বী অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, স্বর্গীয় কবি ও সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় প্রমুখ প্রবীণ মহারথগণ হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় বহু লেখকের মতামত এবং তাঁহাদিগের আলোচনা ও গবেষণার সার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। এখানে আমরা তাঁহাদিগের সকলকেই আমাদের ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা ও অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

পরীক্ষার পাঠ্য প্রস্তুত করিবার সুবিধার্থ লিখিত পুস্তিকা সমূহ সাধারণতঃ যে ধরণের হইয়া থাকে, এই পুস্তকখানি সে ধরণের নহে। ইহা পাঠে যাহাতে বঙ্গসাহিত্যের লোভনীয় সম্পদগুলির প্রতি চিত্ত সমাকৃষ্ট হয়,

জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মে, এবং অনুসন্ধিৎসু ছাত্রগণের অনুসন্ধিৎসা পরিবর্দ্ধিত হয় সে বিষয়ে এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে যতটা সম্ভব চেষ্টা আমরা করিয়াছি। তবে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা জানি না।

এবার নানা বিপদের মধ্যেও যথাসময়ে পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে হইল। সেজন্য বঙ্গ-সাহিত্যের আধুনিক যুগটী আমাদের মনের মত করিতে পারিলাম না। শ্রীভগবানের কৃপায় যদি পুনরায় সংস্করণ করিবার আবশ্যক হয়, তবে এ বিষয়ে আমরা অবহিত হইব। এই পুস্তক-রচনা-কার্য্যে সুধীশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাদিগকে সর্ব্ব-প্রকারে যেরূপ সহায়তা করিয়াছেন, তাহা আর ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ রহিলাম।

কলিকাতা
৮ই শ্রাবণ,
১৩৩৯ বঙ্গাব্দ



বিনীত
শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস
ও
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত-সার

প্রথম খণ্ড

ভারতীয় লিপি বা অক্ষরমালার আদি কথা

আমাদের এই বঙ্গাক্ষর বা বঙ্গলিপি অতি প্রাচীন। "ললিতবিস্তর" নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্র নামক আচার্য্যের নিকট হইতে ৬৪ প্রকার লিপি শিক্ষা করেন। এই লিপিগুলির মধ্যে অঙ্গ, বঙ্গ, সৌরাষ্ট্রী ও মাগধী প্রভৃতি লিপি ছিল।

আর্য্যাবর্ত্তবাসীদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন লিপি ব্রাহ্মী-লিপি নামে অভিহিত। এই ব্রাহ্মীলিপিই আমাদের বঙ্গলিপির আদিম উৎস। ভারতীয় আর্য্যগণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন লিপি, এই ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়।

(ক) প্রিন্সেপ (Prinsep) প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে ভারতীয় অক্ষরমালা গ্রীক জাতির অক্ষর হইতে সমুদ্ভূত।

(খ) স্যর উইলিয়ম জোনসের মতে ভারতীয় অক্ষরমালা ফিনিশিয়ান অক্ষর হইতে সঞ্জাত।

(গ) টেলর বলেন, ইহা সেবিয়ান লিপি হইতে গৃহীত।

(ঘ) ওয়েবার (Weber) ও বুলার (Buhler) বলেন, ভারতীয় লিপি উত্তর সেমিটিক প্রদেশ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। এই মতের বিরোধী কানিংহাম (Cunningham) ও টমাস (Thomas) বলেন, সেমিটিক লিপি দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত; আর ভারতীয় লিপি (যথা, অশোক-লিপি) বাম হইতে দক্ষিণ দিকে লিখিত; কিন্তু বুলার ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত একটী মুদ্রা হইতে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, পূর্ব্বে ব্রাহ্মী লিপিও সেমিটিক লিপির ন্যায় দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হইত।

এখানে দেখা যাইতেছে যে, উপর্য্যুক্ত পণ্ডিতগণের মতে ভারতীয় লিপি হিন্দুদিগের নিজস্ব নহে; উহা ভারতের বাহির হইতে আনীত। ইঁহাদের যুক্তির সার মর্ম্ম এই যে,—এদেশের প্রাচীনতম লিপি (যথা, অশোক-লিপি) এত সুন্দর ও সুগঠিত যে উহাকে ঐরূপ অবস্থায় উপনীত হইতে বহু বৎসর ধরিয়া ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া আসিতে হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় নিশ্চয়ই তাহাদের গঠন অসম্পূর্ণ ও বিশৃঙ্খল ছিল; কিন্তু ঐ-সকল বিভিন্ন অবস্থার লিপির নিদর্শন পাওয়া যায় না। পরন্তু, ভারতীয় অক্ষরমালা যদি ভারতবর্ষ হইতেই সমুদ্ভূত হইত, তাহা হইলে বিভিন্ন প্রদেশ সমূহে বিভিন্ন প্রকার লিপির প্রচলন থাকিত; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে কেবলমাত্র অশোক-লিপিই পরিদৃষ্ট হইতেছে।

এই মতের বিরুদ্ধবাদীদিগের যুক্তি :—

অধ্যাপক ডাউসন (Dowson) বলেন যে, আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ তাঁহাদের অক্ষরমালার জন্য অন্য কোনও জাতির নিকট ঋণী নহেন। প্রাচীন হিন্দুগণ ব্যাকরণে যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন এবং কণ্ঠস্বরের সূক্ষ্ম বিভিন্নতা যেরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে অক্ষরের উদ্ভাবনা নিশ্চয়ই সম্ভবপর হইয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন ভারতীয় অক্ষরমালা ভারতবর্ষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, এই মতবাদিগণের প্রবল যুক্তি এই যে, বারবার বৈদেশিক আক্রমণ প্রভৃতি ঘটনা-বিপর্য্যয়ের ফলে ভারতীয় প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির প্রায় সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে; সুতরাং প্রাচীন লিপির বিভিন্ন স্তরের নিদর্শন যে দুষ্প্রাপ্য হইবে, তাহাতে আর বিস্মিত হইবার কি আছে ?

ভারতীয় লিপি ভারতের বাহির হইতে আনীত এই মতবাদিগণের আর একটী প্রবল যুক্তি এই যে, ভারতীয় লিপি যদি ভারতবর্ষেই জন্মলাভ করিত, তাহা হইলে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন লিপির প্রচলন থাকিত; কিন্তু শুধু এক

অশোক-লিপিই পরিদৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু এই মতের খণ্ডন এই যে, মহারাজ অশোক প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট্ ছিলেন। সুতরাং রাজকার্য্য পরিচালনার সুবিধার জন্য অধীন জনপদ সমূহে নিজ প্রদেশের লিপি প্রচলন করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন সে সময়ে অন্য লিপিও ছিল। মহারাজ অশোকের পরবর্ত্তী যুগে মুসলমান নরপতিগণের এবং বর্ত্তমানে আমাদের ব্রিটিশ শাসকগণের পক্ষে রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য নিজ নিজ ভাষা ও লিপির প্রচলন যখন সম্ভবপর, তখন অশোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর না হইবার কোনও কারণ নাই। আর ইংরাজী এখন রাজ-প্রবর্ত্তিত লিপি হইলেও ভারতে অন্যান্য লিপির যেমন প্রচলন আছে, অশোকের সময়েও তেমনি অশোক-লিপি ছাড়া অন্যান্য লিপিও ছিল। নানা ঘটনা-বিপর্য্যয়ে বর্ত্তমানে তাহাদের নিদর্শনগুলি কালের কবলগত হইয়াছে।

(ক) ঋগ্বেদে বর্ণমালা অর্থে "অক্ষর" শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। উহা অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসরের প্রাচীন। কোনও সেমিটিক লিপি এত প্রাচীন নহে। অথর্ব্ববেদের প্রাতিশাখ্যগুলিতে শুধু অক্ষর কেন, অক্ষর গুলির নাম পর্য্যন্ত আমরা পাইতেছি, যথা—ককার, শকার, চকার ইত্যাদি।

(খ) নিজাম-রাজ্যের অন্তর্গত রায়গড়ে ইয়াজ্‌দানি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের গাত্রে অনেকগুলি অক্ষর দেখা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মতে ঐ পাত্রটীর বয়স খৃঃ পূ ৩০০০ বৎসর। (গ) মেগাস্থিনিস তাঁহার বিবরণে ভারতবর্ষে জন্ম-পত্রিকা লিখিবার পদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন। (ঘ) পাণিনি তাঁহার "অষ্টাধ্যায়ী" ব্যাকরণের বহুস্থলে "গ্রন্থ" "বণ" "পটল" "সূত্র," "লিপি" এমন কি "লিখ্" (=লেখা) ধাতুও ব্যবহার করিয়াছেন। পাণিনি যে খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতকের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাণিনীয় মহাভাষ্য-গ্রন্থের ভূমিকায় নিসন্দেহে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মীলিপি হইতে বঙ্গলিপির উৎপত্তি ও তাহার ক্রমবিকাশের নিদর্শন

অশোকের অনুশাসনে যে লিপি দেখা যায়, উহা ব্রাহ্মীলিপিরই এক পরিণত অবস্থা। মৌর্য্যযুগের পর কুষাণ-যুগে ভারতীয় লিপির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। তাহার পর গুপ্তরাজগণের প্রভাব-কালে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন লিপির প্রচলন হয়। উহার মধ্যে যে লিপি উত্তর-ভারতের পূর্ব্বাংশে ব্যবহৃত হইত, কালক্রমে উহাই নানা ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া বঙ্গাক্ষরের রূপ ধারণ করে।

সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত শুশুনিয়া পর্ব্বত-গাত্রে মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মার একখানি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই চন্দ্রবর্ম্মা গুপ্ত-বংশীয়। ইনি খৃষ্টীয় ৪র্থ শতকে রাজত্ব করিতেন; সুতরাং ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালার প্রাচীন লিপি আর নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে রাজসাহী জেলায় মহারাজ কুমারগুপ্তের কয়েকখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। গুপ্ত-যুগের পর পালরাজাগণের লেখমালায় ও লক্ষ্মণসেন, বিশ্বরূপসেন, কেশবসেন প্রভৃতি সেনরাজগণের তাম্রশাসনে বঙ্গলিপির ক্রমোন্নতির ইতিহাস পাওয়া যায়। বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়-সংগৃহীত "কাশীখণ্ড" নামক গ্রন্থ ৯৩০ শকে লিখিত; উহার লিপি কুটিল লক্ষণাক্রান্ত বঙ্গলিপি।

জাপানে প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের কয়েকখানি পুঁথি ১০ম শতকের বঙ্গাক্ষরে লিখিত। কেম্‌ব্রিজ নগরে যে তিনখানি বাঙ্গলা পুঁথি (গুহ্যাবলী-বিবৃতি, পঞ্চাকার ও যোগরত্ন) রক্ষিত আছে উহারা যথাক্রমে ১১৯৮, ১১৯৯ ও ১২০০ খৃষ্টাব্দের বঙ্গাক্ষরে লিখিত—নেপাল হইতে স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত গ্রন্থগুলির অক্ষরও এই অক্ষরেরই অনুরূপ। অধ্যাপক শ্রীযুত বসন্ত রঞ্জন রায় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" গ্রন্থে ১৪শ শতকের বঙ্গাক্ষরের নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয়।

বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ব্রহ্মদেশ বাদ দিয়া ভারতবর্ষে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা প্রায় ১৪৬টী। ভারতে যতগুলি ভাষা ও উপভাষা প্রচলিত আছে, তাহা নিম্নোক্ত ৪টী গোষ্ঠীর যে কোনও একটী হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। (১) আর্য্য-গোষ্ঠী, (২) দ্রাবিড়-গোষ্ঠী, (৩) কোল-গোষ্ঠী, (৪) ভোটচীনা বা তিব্বত-চীন-গোষ্ঠী।

বিগত ১৯২১ অব্দের লোক-গণনার হিসাবে দেখা যায় যে, বঙ্গভাষা ৪ কোটী ৯০ লক্ষ লোকের কথিত ভাষা। মাতৃভাষা হিসাবে বঙ্গভাষা ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাগুলি অপেক্ষা অনেক বেশী সংখ্যক লোকের কথিত ভাষা। এই হিসাবে ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালার স্থান প্রথম এবং পৃথিবীর মধ্যে সপ্তম।

১ম উত্তরচীনা—২০ কোটী লোকের কথিত ভাষা।
২য় ইংরেজী—১৫ কোটী লোকের কথিত ভাষা।
৩য় রুস—প্রায় ৮ কোটী লোকের কথিত ভাষা।
৪র্থ জার্ম্মান—৭॥০ কোটী লোকের কথিত ভাষা।
৫ম স্পেনীয়—৫॥০ কোটী লোকের কথিত ভাষা।
৬ষ্ঠ জাপানী—৫ কোটী ২০ লক্ষ লোকের কথিত ভাষা।
৭ম বাঙ্গালা—৪ কোটী ৯০ লক্ষ লোকের কথিত ভাষা।

আমাদের বঙ্গভাষা পূর্ব্বোক্ত আর্য্য-গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত। যে ভাষার শব্দ-সম্ভারে পরিপুষ্ট হইয়া, সাম ও ঋকের ভাষা-মন্দাকিনী দেবকল্প—ঋষিগণের শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া পঞ্চনদের উপল-খণ্ডের উপর পড়িয়াছিল, এবং যাহা জগতের হিতের জন্য শতধারে বিস্তারিত হইয়াছিল, আমাদের ভাষা-জননী সেই গোষ্ঠী-সমুদ্ভূতা। বর্ত্তমানে আমরা আমাদের ভাষা-জননীর জন্ম, শৈশব ও কৈশোরের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

কোনও জাতির ভাষা আলোচনা করিতে হইলে, সেই জাতির ইতিহাস আলোচনা একান্ত কর্ত্তব্য। সেই জাতি কোন্ কোন্ জাতির সংস্পর্শে

আসিয়াছে এবং তাহার ভাষা ঐ সকল জাতির ভাষা দ্বারা কিরূপে প্রভাবান্বিত হইয়াছে ইত্যাদি বিষয়ের বিচার করা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজন। তাই আমাদের বঙ্গভাষার ইতিহাস আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তির বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব। এই সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গের সীমা এবং সীমান্ত সমূহের অধিবাসিগণ সম্বন্ধেও মোটামুটি ভাবে দুই চারিটী কথা আমাদিগকে জানিয়া লইতে হইবে।

বেদ-সংহিতা গ্রন্থে "বঙ্গ" নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। অথর্ব্ববেদে অঙ্গদেশের (আধুনিক ভাগলপুর জেলার) উল্লেখ আছে, কিন্তু বঙ্গদেশের নাম পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ পালিগ্রন্থও বঙ্গদেশ সম্বন্ধে নীরব (**Rhys Davids P.23 29**)। ঐতরেয়-আরুণ্যকে বঙ্গদেশের নাম প্রথম পাওয়া যায়; তখন এদেশ অসভ্য বর্ব্বর জাতির বাসস্থান বলিয়া উপেক্ষিত ছিল। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বাঙ্গালা দেশে আর্য্যদের আগমন খৃঃ পূঃ ৬ শতকের পূর্ব্বে হয় নাই।

(কিন্তু আর্য্যজাতি কর্তৃক উপেক্ষিত হইলেও এবং প্রাচীন আর্য্যগ্রন্থে বঙ্গদেশের উল্লেখ না থাকিলেও চীন-দেশীয় বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, খৃঃ পূঃ ৭ম শতকে এই দেশ হইতে Luck-lom নামধারী এক জাতি সুদূর বর্ম্মাসীমান্তে ও আনাম প্রদেশে তাহাদের প্রাধান্য-বিস্তার ও রাজ্য-স্থাপন করে। বলাবাহুল্য, এই **Luck-lom** জাতি দাক্ষিণাত্যের তামিল ও তেলেগুভাষা-ভাষী দ্রাবিড় জাতির শাখাবিশেষ। তখন এদেশের নাম ছিল Bong-long; অর্থাৎ জাতির নাম ছিল Bong, এবং Bong জাতির বাসস্থান বলিয়া দেশের নাম ছিল Bong-la, কারণ long শব্দ অনার্য্য **suffix** 'লা' এর আনাম-দেশীয় বিকৃতিমাত্র। এই সব কারণে শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন যে, খৃঃ পূঃ ৭ম শতক হইতে অর্থাৎ আর্য্যদের আগমনের পূর্ব্ব হইতেই এই দেশ বাঙ্গালা আখ্যা লাভ করিয়াছিল।)

প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক আয়তন

প্রাচীন বাঙ্গালার ভৌগোলিক বিবরণের সহিত বর্ত্তমানের কোনরূপ সাদৃশ্য নাই। ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে অভিহিত হইত। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, বীরভূম ও মেদিনীপুর অঞ্চল রাঢ় নামে পরিচিত ছিল। মহা-ভারত ও পুরাণের যুগে এখানে এক অসভ্য দস্যুজাতি বাস করিত। হাওড়া অঞ্চল সুহ্মজাতির এবং হুগলী, ২৪ পরগণা ও নদীয়া বঙ্গজাতির বাসস্থান বলিয়া তাহাদের নামে পরিচিত হইত। বরাহ-মিহিরের বৃহৎসংহিতা (খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতক) বলে যে, পূর্ব্বে এদেশ সমতট নামে কথিত হইত এবং ইহার সীমা পূর্ব্বে ত্রিপুরা ও চাঁটিগা পর্য্যন্ত, উত্তর-পশ্চিমে মিথিলা পর্য্যন্ত ও দক্ষিণে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উত্তরবঙ্গ ও আসাম তখন প্রাগ্জ্যোতিষপুর নামে উল্লিখিত হইত। প্রাচীন কালে বঙ্গ বলিতে যে পূর্ব্ব-বঙ্গ বুঝাইত ইহা ভুল। খৃঃ ৯ম শতকে এদেশ "গৌড়" আখ্যা লাভ করে এবং পালরাজগণের সময়ে গৌড়ের সীমা সুদূর শ্রাবস্তী ও কোশল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। তারপরে মুসলমান অধিকারের পরে খাঁটী গৌড়ের সীমা মালদহ, রাজসাহী ও মুর্শীদাবাদ অঞ্চলে নিবদ্ধ থাকিলেও "পঞ্চগৌড়" বলিতে উড়িষ্যা, কান্যকুব্জ, সারস্বত, অঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশ গুলিও বুঝাইত। সম্প্রতি ইংরাজ অধিকারের প্রারম্ভে উড়িষ্যা, বিহার ও আসাম কিছু দিনের জন্য বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

বাঙ্গালীজাতির উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ৪টী বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব। ইহার মধ্যে তিনটীই আর্য্য-গোষ্ঠীর বহির্ভূত। অনেকের মতে মৌর্য্যযুগে বঙ্গদেশ আর্য্যাবর্ত্তের সংস্পর্শে আসে। তাহার পূর্ব্বে কোল, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতি মিলিয়া বঙ্গে একটী বিশিষ্ট মিশ্র সভ্যতার

বিকাশ সাধন করিয়াছিল। মৌর্য্য সম্রাট্‌গণ বঙ্গদেশ জয় করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের সহিত ইহার নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করেন। এই সময়ে মগধের রাজকর্ম্মচারী, সৈনিক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বঙ্গদেশে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন এবং ইঁহাদের দ্বারা বঙ্গে মগধের আর্য্যভাষা আনীত হয়।) এখানে কথা উঠিতে পারে যে, যদি মৌর্য্যযুগে বঙ্গে আর্য্য-ভাষার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতকে বাঙ্গালী বীর বিজয় সিংহ কর্ত্তৃক লঙ্কাজয় সম্ভবপর হয় কি প্রকারে? কেননা বিজয় সিংহের সঙ্গীদের বর্ত্তমান বংশধরগণ সিংহলী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। আর এই সিংহলী ভাষা আর্য্য-ভাষা। ইহাতে বুঝা যায়, বিজয় সিংহ বাঙ্গালা হইতে যাইবার সময় বঙ্গদেশ হইতে আর্য্য ভাষা লইয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, মৌর্য্যযুগের অনেক পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গে আর্য্য-ভাষার প্রচলন ছিল। কিন্তু ভাষাতত্ত্ব-বিদ্যায় দক্ষ বৃহস্পতি, সুধী অধ্যাপক সুনীতি-কুমার প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিজয়সিংহ বাঙ্গালী নহেন; তিনি গুজরাট অঞ্চলের অধিবাসী। পালিগ্রন্থের বিবরণ অনুসারে তিনি 'লাল' বা 'লাড়' দেশীয় রাজার ছেলে। এই 'লাল' বাঙ্গালার 'রাঢ়' বা 'লাঢ়' নহে—ইহা গুজরাটের প্রাচীন নাম 'লাট' বা 'লাড়'। এতদ্ভিন্ন "মহাবংশ" ও "দীপবংশ" নামধেয় গ্রন্থদ্বয়ের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বিজয়সিংহ লঙ্কায় যাইবার সময় "ভরুকচ্ছ" ও সুপ্পারক নামক দুইটী বন্দর দিয়া যাইতেছেন। এই দুইটী বন্দরই গুজরাট অঞ্চলে বিদ্যমান। ইহাদের বর্ত্তমান নাম—যথাক্রমে "বরোচ" ও "সোপারা"। জার্ম্মান পণ্ডিত গাইগার সাহেব সিংহলী ভাষার আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পশ্চিম ভারতের প্রাকৃত ভাষার সহিত ইহার যোগ আছে, মাগধীর সঙ্গে নহে। এতদ্ভিন্ন সুনীতি বাবু শব্দের "অনুকার"-রীতি অবলম্বনে সিংহলীর সহিত গুজরাটী ভাষার মিল দেখাইয়াছেন। (পূর্ব্বোক্ত কোল, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয় এবং উত্তর-ভারত হইতে সমাগত আর্য্য ও আর্য্য-ভাষা-ভাষিগণের সংমিশ্রণেই বর্ত্তমান বাঙ্গালী

হিন্দু-সমাজের গোড়া পত্তন হয়। খৃষ্টীয় ৭ম শতকের মধ্যে বাঙ্গালী একটী বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হয়। চীন-পরিব্রাজক ইউয়ন চোয়াঙ খৃঃ ৭ম শতকে ভারতে আগমন করেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ হইতে বেশ প্রতীয়-মান হয় যে, ঐ সময়ে বঙ্গদেশে আর্য্যভাষা ও আর্য্য-সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। ৮ম শতকের মধ্যভাগে বঙ্গে পাল রাজাদের অভ্যুদয় হয়। এই পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। ইঁহাদের শাসনকাল বঙ্গ-ইতিহাসের সুবর্ণ যুগ। এই সময়ে বাঙ্গালী প্রতিভার যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধিত হইয়াছিল, এমন আর কখনও হয় নাই। তাহার পর সেন রাজাদের আমল। সেন রাজগণের শাসনকালে বঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের এক বিরাট্ অভ্যুত্থান হয়। এই বংশের শেষ নরপতি, লক্ষ্মণসেনের সময়ে বখতিয়ার খিলজির পুত্র মহম্মদ খিলজী নবদ্বীপ অধিকার করেন। মুসলমান-বিজয়ের সংঘাতে প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া জাতি মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে এই জাতির মধ্যে আবার প্রাণের সঞ্চার দেখা দিল। বাঙ্গালার চিন্তাশক্তি আবার সাহিত্যে আত্ম-প্রকাশ করিতে লাগিল। ঠিক এই সময়েই চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া এই নব জাগরণকে সার্থক করিলেন।

এতাবৎকাল বাঙ্গালী কেবল নিজ গৃহ-কোণেই আবদ্ধ ছিল। আজ এই নব জীবনের প্রভাতে প্রাদেশিক সংকীর্ণতাকে পরিহার করিয়া বিশ্বের সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষাই উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার আজিকার এই নব অভিযানের সেনাপতি হইয়াছেন রামমোহন, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ।

বাঙ্গালায় যে কোল, দ্রাবিড় প্রভৃতি অনার্য্য জাতির বাস ছিল, তাহা বাঙ্গালার অনেক গ্রাম বা পল্লীর নাম হইতে এবং গ্রাম-প্রচলিত শব্দগুলি হইতে জানা যায়। এই সকল গ্রাম্য শব্দের মধ্যে এমন অনেক শব্দ আছে, যাহা সংস্কৃত অথবা প্রাকৃতের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না এবং আর্য্য গোষ্ঠীর কোনও ভাষার সহিতই তাহাদের মিল নাই। বর্ত্তমানে এই সকল-

শব্দ পল্লীবাসী কৃষক ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। এই সকল শব্দ সংগ্রহ করিয়া অভিধানজাত করিয়া ফেলা একান্ত প্রয়োজন।) বঙ্গের বিভিন্ন জেলার শব্দ সংগ্রহ করিয়া একখানি অভিধান প্রণয়ন করিবার কল্পনা-জল্পনা অনেক দিন হইতেই বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে চলিয়া আসিতেছে। (এই গ্রাম্য শব্দ-সংগ্রহ-ব্যাপারে স্বনামধন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ই প্রথম উদ্যোক্তা। তাঁহার যে সংগ্রহটী ছিল, তাহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৮ম বর্ষে মুদ্রিত হয়।) তৎপরে অনেকেই নানাস্থান হইতে গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

বঙ্গভাষার আদিকথা

ভারতবর্ষে প্রচলিত বর্ত্তমান আর্য্য-ভাষা সমূহে অনার্য্য-প্রভাব যতই থাকুক না কেন, আদিতে তাহারা যে ছান্দস ভাষা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই ভাষাতেই জগদ্‌গুরু আর্য্যঋষি-গণ বেদের রচনা করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীনকালে এই ছান্দস ভাষাই একাধারে লিখিত ও কথিত ভাষা ছিল। কালক্রমে জনসাধারণের উচ্চারণ-শক্তির তারতম্য অনুসারে এবং বাহিরের নানা প্রভাব-বশে কথিত ও লিখিত ভাষার মধ্যে ক্রমশঃ একটী ব্যবধান দেখা ছিল। এখানে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, সাহিত্য ও ধর্ম্ম-পুস্তকের ভাষা ব্যাকরণের কঠোর শাসনে কথিত ভাষা হইতে বিশেষভাবে পৃথক্ হইয়া পড়িল। আবার কথিত ভাষাও স্বাভাবিক গতি অনুসারে এবং বাহিরের নানা প্রভাব-বশে ভিন্ন আকার ধারণ করিতে লাগিল। এইরূপে একই ছান্দস ভাষা হইতে দুই রকমের বিভিন্ন দুইটী ভাষার উৎপত্তি হইল। একটী লোক-ব্যবহারে অপ্রচলিত পোষাকী ভাষা সংস্কৃত এবং অপরটী লোক-ব্যবহারের ভাষা প্রাকৃত। কোন্ সময়ে যে ছান্দস ভাষা হইতে উৎপন্ন, লোক-ব্যবহারে অপ্রচলিত ভাষাকে সংস্কৃত আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে দেখা

যায় যে "বিনয়-পিটকে" বুদ্ধদেব এই ভাষাকে সংস্কৃত এবং পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণে ইহাকে লৌকিক নামে অভিহিত করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ছান্দস ভাষা হইতে স্বাভাবিক ভাবে উৎপন্ন কথিত ভাষাকে প্রাকৃত আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। এই প্রাকৃত ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নাম ও বিভিন্ন আকার ধারণ করে। যেমন বর্ত্তমানে বাঙ্গালা ভাষা সমগ্র বঙ্গের কথিত ভাষা হইলেও, কলিকাতা, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, প্রাকৃত ভাষাও তেমনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ সমূহে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যথা—মাগধী, শৌরসেনী, সৌরাষ্ট্রী ও মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি। এই মাগধী প্রাকৃতকেই সিংহলবাসিগণ পালি আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু ভাষা পরিণামী। ব্যাকরণ অজ্ঞ ও অশিক্ষিতের বাক্-প্রচেষ্টা শাসন করে বটে, কিন্তু উহা কখন প্রবাহময়ী ভাষা-নির্ঝরিণীর গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। বৌদ্ধ-যুগে ভগবান্ বুদ্ধের কল্যাণে এই মাগধী প্রাকৃত বা পালি লিখিত ভাষায় পরিণত হয়। ফলে কালক্রমে ছান্দস ভাষার ন্যায় মাগধী প্রাকৃতেরও কথিত ও লিখিত এই দুইটী রূপ দেখা দিল। লিখিত মাগধী প্রাকৃত কথিত ভাষা হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িল। পরে এই কথিত মাগধী প্রাকৃত মাগধী অপভ্রংশে পরিণত হইল। এই মাগধী প্রাকৃত হইতেই পরবর্ত্তী সময়ে হিন্দুধর্ম্মের নবজাগরণের ফলে ও বাহিরের নানা প্রভাব-বশে বাঙ্গালা, ওড়িয়া, মৈথিলী ও অসমীয়া ভাষার উৎপত্তি হয়।

বর্ত্তমান সময় হইতে বৈদিকযুগ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা আলোচনার উপাদান

বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে দুইদিকে দুইটি সীমা পাওয়া যায়। একদিকে এই বর্ত্তমান সময় ও অপর-দিকে বেদের ও বৈদিক সাহিত্যের রচনা-কাল। ঋগ্বেদের পূর্ব্বে আর্য্য-ভাষার

রূপ কিরূপ ছিল, সেবিষয়ে আমাদের ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ এখনও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, বঙ্গভাষার উৎপত্তির আলোচনা-প্রসঙ্গে আমাদের অতদূর যাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান রূপ তো আমরা প্রতিদিনই দেখিতেছি। একশত বা দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, তাহাও তখনকার লিখিত পুস্তকাদি হইতে জানিতে পারি। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে বঙ্গভাষা প্রথম ছাপার হরফে উঠে। তাহার পূর্ব্বে হাতে লেখা পুঁথিই নানা বিষয়ক জ্ঞান-চর্চ্চার একমাত্র অবলম্বন ছিল। ১৮শ শতক হইতে ১৬শ শতক পর্য্যন্ত হাতেলেখা পুঁথি যথেষ্ট মিলে। ইহাতে আমরা ঐ সময়কার ভাষার নমুনা পাই। এতদ্ভিন্ন ১৬শ শতকের কিছু পূর্ব্বে রচিত অথচ ১৬শ হইতে ১৮শ শতকের মধ্যে নকল করা অনেক পুঁথি পাওয়া যায়। এই সকল পুঁথির ভাষা লিপিকরদিগের হাতে পড়িয়া কিছু পরিবর্ত্তিত হইলেও ইহার মূল রূপটী ধরিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। খৃঃ ১৫শ শতকের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের পুঁথির একান্তই অভাব ছিল। এইজন্য বাধ্য হইয়া বহুদিন যাবৎ এখানেই আটকাইয়া থাকিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সৌভাগ্যক্রমে দুইখানা পুঁথি আবিষ্কৃত হওয়ায় ১৫শ শতকের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের পুঁথি মিলিয়াছে। ইহার মধ্যে একখানি চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" ও অপরখানি মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত "চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়"। প্রাচীন লিপিবিৎ স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন ১৩৫০ হইতে ১৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত। এই পুস্তকখানি উহার আবিষ্কারক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় কর্ত্তৃক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়কে অপর তিনখানি পুঁথির সহিত একত্র করিয়া, "হাজার বছরের পুরাণো বৌদ্ধ গান ও দোহা" নাম দিয়া, শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে ১০০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমাদের ভাষার নিদর্শন মিলিতেছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের কোনও

পুঁথি এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। পূর্ব্বকালের রাজারা ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি প্রভৃতি দান করিতেন। এই সকল দান-পত্র তামার পাতে খোদাই করিয়া লেখা হইত। এইরূপ তাম্রশাসন প্রভৃতি হইতে কতকগুলি নাম পাওয়া যায়। এই নাম গুলিই ঐ সময়ের ভাষা-চর্চ্চার একমাত্র উপাদান। যথা 'কনামোটিকা'=কানামুড়ী, 'রোহিতবাড়ী'=রুইবাড়ী 'নড়জোলি'=নাড়াজোল প্রভৃতি। এই নামমালা হইতে ধারণা করা যায় যে, এই সময়ে বঙ্গদেশে প্রাকৃত শ্রেণীর একটী ভাষা ছিল। সেই ভাষার অনেক শব্দই বর্ত্তমানে আমরা কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্যবহার করিতেছি! তবে এই সকল নাম হইতে ভাষার যথাযথ পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং চর্য্যাপদ হইতে একেবারে আমাদিগকে মাগধী প্রাকৃতে উপনীত হইতে হয়। এই মাগধী প্রাকৃতের নিদর্শন পাওয়া যায় সংস্কৃত নাটকে নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণের কপোথকথনের মধ্যে। এতদ্ভিন্ন বররুচির প্রাকৃত ব্যাকরণে ইহার উল্লেখ আছে। মাগধী প্রাকৃত বররুচির পূর্ব্বে মগধে, পূর্ব্ব ভারতে, কাশী. বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যবহৃত হইত। মাগধী প্রাকৃতের পূর্ব্বে এই সকল স্থানের আর্য্য ভাষার যেরূপ আকার ছিল, তাহার সহিত পরিচয় লাভ করা যায় মহারাজ অশোকের অনুশাসনে। ইহার পূর্ব্বে এই ভাষার রূপ কি প্রকার ছিল, তাহা অনুমান করা যায় বৌদ্ধ পালি-সাহিত্য এবং ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ হইতে। এই সময়ে কথিত আর্য্যভাষার তিনটী রূপ ছিল। (১) উদীচ্য—ইহা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আর পাঞ্জাবে ব্যবহৃত হইত। (২) মধ্য দেশীয়—বর্ত্তমান যুক্ত প্রদেশে ইহার ব্যবহার ছিল (৩) প্রাচ্য—ইহা কোশল, কাশী, মগধ, ও বিদেহ অঞ্চলের ভাষা। এই প্রাচ্য নামধেয় ভাষাই কালে মাগধী প্রাকৃতে পরিণত হয়। বুদ্ধদেবের সময়ে বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী এই প্রাচ্য ভাষা বৈদিক ভাষার একটী রূপান্তর-বিশেষ।

"ইহার মধ্যে যে যে সময়ের ভাষার নমুনা পাওয়া যাইতেছে না, ঐ সকল

যুগের ভাষার সম্ভাব্য রূপগুলি ভাষা-বিজ্ঞানের সূত্র বা অনুমোদিত পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। এইরূপে ঐ সকল সময়ের শূন্যতাকে পূর্ণ করা যাইতে পারে। অধ্যাপক সুনীতিকুমার রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী" কবিতা হইতে দুইটী ছত্র লইয়া উহার সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

বাঙ্গালা ভাষা আর্য্যগোষ্ঠী সমুদ্ভূত কি না ?

গৌড়ীয় ভাষাগুলির সহিত সংস্কৃত ভাষার শব্দগত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ক্রেফোর্ড, ল্যাথাম ও কল্ডওয়েল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, বঙ্গীয় বা হিন্দি ভাষা সংস্কৃত হইতে সমুদ্ভূত নহে। তাঁহারা বলেন যে, বিভক্তি-চিহ্ন ও ক্রিয়াপদগত সামঞ্জস্য দ্বারাই এক ভাষার সহিত অপর ভাষার সম্পর্ক নির্ণয় করা সমীচীন ; কেবল মাত্র শব্দগত সাদৃশ্য দেখিয়াই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। ডাক্তার কল্ডওয়েল বলেন, বাঙ্গালা বিভক্তি-চিহ্ন "কে" ও হিন্দি "কো" দ্রাবিড় বিভক্তি চিহ্ন "কু" হইতে আসিয়াছে। তাঁহার মতে বাঙ্গালা ও হিন্দি ভাষা অনার্য্য-গোষ্ঠীর দ্রাবিড় ভাষা হইতে সমুদ্ভূত। প্রত্নতাত্ত্বিক স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হর্‌নলী সাহেব এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

যাহা হউক বাঙ্গালা ভাষার বিভক্তি ও ক্রিয়াপদগুলি যে হয় সংস্কৃত আর না হয় প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে তাহা একটু আলোচনা করিলেই অনায়াসে বোধগম্য হয়।

বাঙ্গালা প্রথমা বিভক্তি সংস্কৃতেরই অনুরূপ ; কেবল মাত্র অনুস্বার বা বিসর্গ বিবর্জ্জিত এই মাত্র প্রভেদ। প্রথমার একবচনে প্রাকৃতে যেমন "এ" ব্যবহৃত হয়, প্রাচীন বাঙ্গালাতেও সেই "এ" দেখা যায়।

যথা, "কোনও মতে বিধাতাএ করেছে নির্ম্মাণ।"

প্রাকৃতের বহুবচনে অনেক স্থলে মাত্র "আ" এর প্রয়োগ দেখা যায়। প্রাচীন বাঙ্গালাতেও সেরূপ আছে। যথা,—"নরাগজা বিশেশয়।"

কর্ম্ম ও সম্প্রদান-বিভক্তির "কে" অধ্যাপক বিজয়চন্দ্রের মতে দ্রাবিড় "কু" হইতে, ট্রম্প সাহেবের মতে সংস্কৃতের সপ্তমীতে প্রযুক্ত "কৃতে" হইতে জাত। ম্যাক্‌স্‌মূলার বলেন, সংস্কৃতের স্বার্থে "ক" হইতে বাঙ্গালা "কে" আসিয়াছে।

করণ-কারকের পৃথক্ চিহ্ন বাঙ্গালায় নাই বলিলেও চলে। সং— রামেণ,=প্রাকৃত রাম এ,=বাঙ্গালা রামে। যথা 'রামে ডাকিয়াছে', 'কুড়ালে পা কাটিয়াছে' ইত্যাদি।

প্রাকৃত পঞ্চমী বিভক্তির 'হিংতো' হইতে বাঙ্গালা "হইতে" আসিয়াছে। যথা "হাড় হন্তে নির্ম্মিয়া করয় পুনি হাড়"। এই "হিংতো" র অপর রূপ 'হনে' অনেক পুঁথিতে দেখা যায়। যথা,—

"সেই হনে প্রাণ মোর আছে বা না জানি।"

প্রাকৃত ষষ্ঠী বিভক্তি চিহ্ন "র্ণ" হইতে বাঙ্গালা 'র' আসিয়াছে। যথা "অগ্‌গিণ"='অগ্নির' প্রাকৃত "ণ" সাধারণত "র" বা "ড়" তে পরিণত হয়।

সপ্তমী বিভক্তির "তে" সংস্কৃত "তসিল্" হইতে আগত। সংস্কৃতের একার যথা গহনে, কাননে—প্রাকৃত এবং বাঙ্গালায় ঠিক তদ্রূপই আছে। সংস্কৃত "শালায়াং" "বেলায়াং" প্রভৃতির স্থলে প্রাকৃত "সালাএ" "বেলাএ" প্রভৃতি হইয়াছে। বলা বাহুল্য আধুনিক 'শালায়' 'বেলায়' প্রভৃতি ইহারই রূপান্তর মাত্র।

এখন বেশ দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালা বিভক্তি চিহ্নগুলির সমস্তই হয় সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত হইতে আগত। সুতরাং বাঙ্গালা অন্যান্য গোষ্ঠীর ভাষা হইতে সমুৎপন্ন নহে।

এইবার আমরা ক্রিয়াপদ লইয়া আলোচনা করিব। ক্রিয়াপদের আকার হইতেও বাঙ্গালা ও প্রাকৃতের নৈকট্য বা ঘনিষ্ঠতা প্রমাণিত হয়। প্রাকৃত হোই, পড়ই, করই, নচ্চই প্রভৃতি হইতে বাঙ্গালা হয়, পড়ে, করে, নাচে ইত্যাদি ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

প্রাকৃত অসমাপিকা ক্রিয়া 'করিঅ' হইতে বাঙ্গালা "করিয়া" আসিয়াছে।

প্রাকৃত 'করসি' 'খাঅসি' 'করন্তি' প্রভৃতি ক্রিয়া পদের অনুরূপ আকার প্রাচীন বাঙ্গালাতে যথেষ্ট মিলে। যথা,—

"পরণাম করিয়া হংস বলন্তি সেই কালে।"

"ভিক্ষুকের কন্যা তুমি কহসি আমারে!"

সুতরাং ক্রিয়াপদের উৎপত্তি ও সাদৃশ্য লইয়া বিচার করিলেও ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়।

শব্দের শ্রেণী-বিভাগ

বাঙ্গালা এবং অন্যান্য আধুনিক আর্য্য-ভাষাগুলির সৃষ্টিতে নিম্নোক্ত প্রকারের উপদানগুলি নিহিত আছে। (১) তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দ। এই শ্রেণী শব্দগুলিই বাঙ্গালা ভাষার প্রধান সম্পদ। (২) তৎসম বা সংস্কৃতসম শব্দ। সংস্কৃতের ভাণ্ডার হইতে এই সকল শব্দ কথিত ভাষাগুলি গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ সম্পৎ-সম্ভারের বৃদ্ধি করিয়াছে। (৩) অর্দ্ধ তৎসম শব্দ। উপর্য্যুক্ত তৎসম শব্দগুলি কথিত ভাষায় আসিয়া তাহাদের বিশুদ্ধ রূপটী অব্যাহত রাখিতে পারে নাই। এতদ্ব্যতীত জনসাধারণের উচ্চারণের অক্ষমতাবশতঃ এই শব্দগুলির বিশেষ রূপ বিকার ঘটে এবং ইহার ফলে এই তৎসম শব্দগুলির একটী নূতন রূপ দাঁড়াইয়া যায়। এই শব্দ গুলিকে পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ অর্দ্ধ তৎসম শব্দ নামে অভিহিত করিয়াছেন। তদ্ভব, তৎসম ও অর্দ্ধতৎসম এই তিন জাতীয় শব্দগুলি আধুনিক আর্য্য-গোষ্ঠীর কথিত ভাষাগুলির আর্য্য-উপাদান।

এতদ্ভিন্ন দেশী ও বিদেশী এই দুই প্রকারের উপাদান আছে। ইংরাজী, পর্টুগীজ, ফরাসী, আরবী, পারসী প্রভৃতি ভাষার বহু শব্দ প্রথমে লোক-মুখে অনবরত চলিতে চলিতে ভাষায় আসিয়া আমাদের ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। এই শব্দগুলি বিদেশী শব্দ নামে পরিচিত। যথা, চাবি, সাবান, পেনসিল, বাক্স, চেয়ার, টেবিল, গোসা, মামলা, প্রভৃতি।

পূর্ব্বোক্ত তদ্ভব, তৎসম, অর্দ্ধ-তৎসম ও বিদেশী শব্দ ছাড়া আর এক শ্রেণীর শব্দ আছে, সে গুলির মূল নির্ণয় করা বড়ই কঠিন; কিন্তু এগুলির ব্যবহার খুবই বেশী। এই শব্দগুলিকে দেশী শব্দ নামে অভিহিত করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ গাড়ী, ঘুড়ী, ঝাড়, ঝাঁটু, ঝোপ, ধামা, ধুচুনি, ঢেঁকি, কুলা প্রভৃতি শব্দের নাম করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত তদ্ভব, তৎসম ও অর্দ্ধতৎসম এই তিন প্রকার শব্দের আকার বা রূপ আমরা 'কর্ণ' ও 'চন্দ্র' শব্দদ্বয় অবলম্বন করিয়া বিবৃত করিব।

তৎসম	অর্দ্ধতৎসম	তদ্ভব
কর্ণ	কন্ন	কাণ
চন্দ্র	চন্দ	চাঁদ

উপর্য্যুক্ত পাঁচ প্রকার শব্দ ব্যতীত আর এক প্রকার শব্দ আছে যাহা সকল জাতির ভাষাতেই দৃষ্ট হয়। তাহাদিগকে অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক শব্দ (Onomatopoetic words) বলে; কেননা উচ্চারণ বা ধ্বনির দ্বারাই তাহাদের অর্থ বোধগম্য হইয়া থাকে। যথা, খট্‌খট্, হাম্বা, কড়মড়, ইত্যাদি। ইহাদিগকেও দেশী শব্দ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

বাঙ্গালা উচ্চারণ-পদ্ধতি

(Bengali Phonology)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বাঙ্গালা উচ্চারণ-পদ্ধতির নিম্নোক্তরূপ সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"অ"এর উচ্চারণ :—

"অ"এর উচ্চারণ সাধারণতঃ ইংরাজী hot বা pot শব্দের "o" এর ন্যায়। প্রাচীনকালে এই "অ" এর উচ্চারণ ইংরাজী hut বা but শব্দের "u" এর ন্যায় ছিল। কিন্তু অথর্ব্ব প্রাতিশাখ্যতে এইরূপ উচ্চারণ

ব্যতীত সংবৃত (close) উচ্চারণও দৃষ্ট হয়। পালি বা মাগধী প্রাকৃতে এই সংবৃত উচ্চারণের প্রচলন নাই; সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা ইহা অথর্ব্ব প্রাতিশাখ্য হইতে গ্রহণ করিয়াছে বলা যাইতে পারে। যথা,—

ভালো for ভাল, মতো for মত, কোনো for কোন। বৈদিক যুগের আর একটী রীতি বঙ্গভাষায় পরিলক্ষিত হয়। "অ" এবং "আ" সম্পূর্ণভাবে উচ্চারিত হইলে উহাতে একটা অনুনাসিক যোগ হইয়া থাকে। যথা,— বাঁকুড়া জেলার করিয়াঁ, খাইয়াঁ ইত্যাদি। যুক্ত অক্ষর-বিশিষ্ট অন্তস্থিত "অ" পূর্ব্বস্থিত "উ" কিংবা "ই" এর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। যথা,— ইষ্ট=ইষ্টি, মিষ্ট=মিষ্টি, তুষ্ট=তুষ্টু, উচ্চ=উচু ইত্যাদি।

"আ"এর উচ্চারণ :—

বঙ্গভাষাতে "আ" এর উচ্চারণ সাধারণতঃ short, কিন্তু দমক বা accent দিলে long হয়। "আ" এর যত প্রকার উচ্চারণ হইতে পারে, তাহাদিগকে বিভিন্ন তিনটী ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, long, half long ও short. "আ" এর পরবর্ত্তী ব্যঞ্জন বর্ণে হসন্ত থাকিলে, আ half long উচ্চারিত হয়। যথা,—আজ, রাত, ভাত ইত্যাদি। কিন্তু "আ" এর সঙ্গে অনুনাসিক যোগ থাকিলে, "আ" long হয়। যথা,—আঁসটে, আঁচড়, কাঁঠাল, বাঁশী ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন আপন, কাপড়, পাতা, বাড়ী প্রভৃতি শব্দের "আ" এর উচ্চারণ short। "ই"কার-যুক্ত বর্ণের পরে আকার থাকিলে "আ" "এ"তে পরিণত হয়। যথা,—বিশ্বাস=বিশ্বেস, মিঠা=মিঠে ইত্যাদি। উকার-যুক্ত বর্ণের পরে আকার থাকিলে, উহা ওকারে পরিণত হয়। যথা,—কুটা=কুটো, বুড়া=বুড়ো, ইত্যাদি। কিন্তু "আ" "য়" এর সহিত যুক্ত হইলে, উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। যথা, নদীয়া=নদে, করিয়া= ক'রে ইত্যাদি।

"ই" ও "ঈ" এর উচ্চারণ :—

বাঙ্গালায় "ই ও ঈ" এর উচ্চারণের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও পার্থক্য নাই। সংস্কৃত শব্দগুলির বানানের অনুকরণে ঈ ও ঊ এই বর্ণ দুইটী বাঙ্গালাতে আসিয়াছে। আমরা "ঈশ্বর" ও "ইচ্ছা" একই রূপ উচ্চারণ করি। অনেক সময়ে "স" যুক্ত আদি বর্ণের উচ্চারণের সুবিধার্থ "ই" এর আগম হয়। যথা,—স্কুল=ইস্কুল।

"এ, ঐ, ও, ঔ" এর উচ্চারণ :—

বৈয়াকরণিক কাত্যায়নের মতে এ=অ+ই এবং ও=অ+উ। ঐ এবং ঔ স্বর দুইটী "এ" আর "ও" এর **lengthened form** মাত্র। খাঁটী দেশী শব্দগুলিতে একার ইংরাজী **Bat** শব্দের "a" ন্যায় উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালা ব্যতীত অপর কোনও আর্য্য-ভাষাতে এরূপ পরিদৃষ্ট হয় না। বিজয় বাবুর মতে ইহা দ্রাবিড় প্রভাবের ফল। তৎসম শব্দের আদি 'এ' ইংরাজী **met** শব্দের "e" এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। কিন্তু এক, ফেন, বেলা, হেলা, প্রভৃতি শব্দ তৎসম-শব্দ হইলেও **Bat** শব্দের "a"র ন্যায় উচ্চারিত হয়। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, ঐ সকল শব্দ সাক্ষাত সম্পর্কে সংস্কৃত হইতে না আসিয়া প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গের তৎসম শব্দের একার **Bat** শব্দের "a" এর মত উচ্চারিত হয়। যথা,—কেশব=কে̿শব, দেবতা=দে̿বতা ইত্যাদি, (এখানে **Bat** শব্দের "a"এর ন্যায় উচ্চারণ বুঝাইতে বাঙ্গালা একারের উপরে (=) চিহ্ন দেওয়া হইল।) আজকাল অনেকে 'গেল' শব্দের **Bat** এর "a"এর ন্যায় উচ্চারণ বুঝাইতে গ্যাল লিখেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ 'য' ফলার প্রকৃত উচ্চারণ "ইয়্"। দ্বিতীয়তঃ য (্য) ফলা দেওয়ার কোন প্রয়োজন করে না; কারণ আপনা হইতেই আমরা স্থান বিশেষে বা শব্দ বিশেষে একারকে **Bat** শব্দের "a"এর ন্যায় উচ্চারণ করিয়া থাকি।

আদিতে একারযুক্ত monosyllablic শব্দের শেষ ব্যঞ্জন বর্ণে হসন্তকার থাকিলে, আদি এ met শব্দের e এর ন্যায় উচ্চারিত হয়, যথা,—টের, ঢের ইত্যাদি। কিন্তু একটী syllableএর অধিক হইলে অনুরূপ উচ্চারিত হয়, যথা,—ঢেরা, টেরা ইত্যাদি। আবার অনুনাসিক থাকিলে একটী syllable হইলেও আদি এ এ হয়, যথা—থেঁট, টেঁক ইত্যাদি।

বিসর্গের উচ্চারণ ও চিহ্ন :—

বিসর্গের বিশিষ্ট উচ্চারণ ও চিহ্ন বাঙ্গালা, পালি ও প্রাকৃতে নাই। কয়েকটী বিসর্গযুক্ত সংস্কৃতশব্দ বাঙ্গালায় আছে বটে, কিন্তু তাহাদের উচ্চারণ প্রাকৃতের অনুযায়ী। যথা,—নিঃশ্বাস=নিস্‌শাস্‌, দুঃখ=দুক্‌খ।

অনুস্বরের উচ্চারণ :—

ইহা সংস্কৃততে 'অম'এর ন্যায় এবং বাঙ্গালাতে 'অঙ' এর ন্যায় উচ্চারিত হয়।

"ঙ, ঞ,"এর উচ্চারণ :—

ঙ, "গ"এর সহিত যুক্ত হইলে, 'গ' সম্পূর্ণ উচ্চারিত হয় না। যথা, গঙ্গা, রঙ্গ, সঙ্গ। শব্দের 'চ' বর্গের কোনও বর্ণের সঙ্গে ঞ যুক্ত হইলে, ঞ "ন"এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা, অঞ্চল, বাঞ্ছা, অঞ্জন, ইত্যাদি। "ঞ" "জ"এর পরে থাকিলে, "জ" "গ"এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা,—আজ্ঞা, প্রজ্ঞা, ইত্যাদি।

ণ

"ণ" বাঙ্গালাতে যথাযথভাবে উচ্চারিত হয় না। পরন্তু দেশী ও বিদেশী শব্দের বানানে উহার বিশেষ আবশ্যকতা নাই।

ম

"ম" যখন ফলারূপে ব্যবহৃত হয়, তখন বাঙ্গলাতে ইহার উচ্চারণ হয়

না। যথা, পদ্ম, পদ্ম=পদ্দ, লক্ষ্মী=লক্খী, শ্মশান=শশান ইত্যাদি। আবার স্থানে স্থানে "ম" থাকে, কিন্তু যুক্তবর্ণের অপর বর্ণটী লোপ পায়। যথা, শ্মশ্রু=মশ্রু=প্রা—মস্সু, বাঙ্গালা—মোচ।

য

কাত্যায়নের মতে য=ই+অ। কিন্তু বাঙ্গালাতে "য" "জ" এর মত উচ্চারিত হয়। যথা, যৌবন=জৌবন।

ঋ ও র

প্রাচীনকালে ইরান দেশে "ঋ" ও "র" "এর-অ" রূপে এবং পাঞ্জাবে "অর-অ" রূপে উচ্চারিত হইত। "ঋ" ও "র"এর আদিতে যে "অ" বা "এ" ধ্বনি বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রমাণ প্রাকৃত হইতেই পাওয়া যায়। যথা, বিকৃত=বিকট, ঘৃত=ঘেয়ত, মৃত=মেরত ইত্যাদি। তৎসম শব্দের আদিতে "র" যুক্ত হইলে "এ"র আগম হয়। যথা, প্রসন্ন=পেসন্ন, প্রহ্লাদ=পেল্লাদ, ব্রজ=বেরজ ইত্যাদি।

ল এর উচ্চারণ :—

স্বরবর্ণের "ঌ" হইতে ব্যঞ্জন বর্ণের "ল"এর উৎপত্তি। বৈদিক ও দ্রাবিড় ভাষাতে "ল" "ড়"এ পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। যথা, ঈলে=ঈড়ে, কুলি=কুঁড়ি, ইত্যাদি।

"ব" এর উচ্চারণ :—

ব=উ+অ। বাঙ্গালাতে ইহা ঠিক ভাবে উচ্চারিত না হইলেও উক্তরূপ ধ্বনির আভাস পরিদৃষ্ট হয়। যথা, গুবাক=গুয়া, দেবর=দেঅর, দ্বার=দুয়ার, স্বাদ=সোয়াদ ইত্যাদি। তৎসম শব্দের "ব" ফলা বাঙ্গালাতে অনেক স্থলে লুপ্ত হয়। যথা—দ্বি=দি, স্বাদ=সাদ। অনেক সময়ে যে বর্ণে "ব" ফলা থাকে, তাহার দ্বিত্ব হয়। যথা অদ্বিতীয়=অদ্দিতিয়, বিস্বাদ=বিস্সাদ।

শ, ষ, স, এর উচ্চারণ :—

"ষ" বাঙ্গালাতে "শ" এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। "শ" উচ্চারণ বেশ স্পষ্ট। কেবল "র" ও "ল" এর সহিত যুক্ত হইলে "স" এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা, শ্রী, শ্রেণী।

"ক্ষ" এর উচ্চারণ :—

প্রাচীন কাল হইতেই ইহা "খ" এর ন্যায় উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে। যথা, ক্ষুদ্র=খুল্ল।

"হ"এর উচ্চারণ :—

পূর্ব্ববঙ্গ ব্যতীত সর্ব্বত্রই শব্দের আদিস্থিত "হ" বেশ স্পষ্টই উচ্চারিত হয়। কিন্তু শব্দের মধ্যস্থলে থাকিলে, একটু নরম ভাব প্রাপ্ত হয়। যথা, মহাশয়=মশাই, মহিষ=মোষ ইত্যাদি। "হ" এর সহিত "য" যুক্ত হইলে, "জ+ঝ" এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। পূর্ব্ব-বঙ্গে "শ" "হ" এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা, শ্যালা=হালা। কেহ কেহ ইহাকে মঙ্গোলিয়ান প্রভাবের নিদর্শন মনে করেন; কিন্তু তাহা নহে। অনুজ্ঞা অর্থে মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া পদের "হ" লুপ্ত হইলে অন্তবর্ণ স্পষ্ট হয়। যথা, করহ=কর, চলহ=চল ইত্যাদি।

Non হসন্ত final বিশিষ্ট শব্দগুলির উচ্চারণ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম পরিলক্ষিত হয়।

শব্দের উপান্ত-বর্ণে হসন্ত থাকিলে, অন্ত-বর্ণ স্পষ্ট হয়, যথা, শক্ত, জব্দ, কষ্ট ইত্যাদি।

যে সকল বাঙ্গালা শব্দের শেষ বর্ণ যুক্ত অক্ষরের অবশিষ্ট ভাগ মাত্র অথবা যে সকল বাঙ্গালা শব্দের শেষ ভাগ একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, এরূপ শব্দের শেষ বর্ণ হসন্ত শূন্য হয়। যথা, ভদ্র=ভদ্দ=ভাল, দ্বাদশ=বাড়শ=বাড়হ=বার।

Participle forming "ত" স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয়। যথা, কৃত, ক্রীত, প্রীত, আগত, ইত্যাদি।

শব্দের আদি বর্ণে "র" বা "ল" ফলা থাকিলে এবং আদি ও অন্ত বর্ণের মধ্যে "অ" ব্যতীত অন্য কোনও স্বরবর্ণ না থাকিলে এবং ব্যঞ্জন "হ" বা "ব" মধ্যস্থলে অবস্থিত না হইলে অন্তবর্ণ স্পষ্ট হয়। যথা, ব্রজ, ব্রত, প্রমথ, শ্লথ। মধ্যে আ স্বরবর্ণ-বিশিষ্ট গ্রাস, প্রাণ, প্রসাদ প্রভৃতি শব্দগুলির উচ্চারণ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

দমক বিচার (Study of accent.)

বৈদিক যুগে অনেক শব্দের **flexional** অন্তবর্ণের অন্তস্বর এবং ক্রিয়া-বিশেষণ শব্দের অন্তস্বর কখনও হ্রস্ব কখনও বা দীর্ঘ উচ্চারিত হইত। কখনও কখনও শুধু **syllable** নহে, সম্পূর্ণ শব্দ, এমন কি সমগ্র বাক্যটীই **accent** বা দমক সহকারে উচ্চারিত হইত। ইহা হইতে বেশ অনুমান করা যায় যে, এই বৈদিক ভাষা এক কালে কথিত ভাষা ছিল। বেদে যেমন শব্দের অংশবিশেষের উপর **accent** বা দমক পরিবর্ত্তিত হইলে, অর্থেরও পরিবর্ত্তন ঘটে, বাঙ্গালাতেও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। বেদে "রাজপুত্র" ("রা"তে **accent**) যাহার পুত্র রাজা, "ত্র"তে **accent** দিলে অর্থ হয় রাজার পুত্র। বাঙ্গালাতে কলম ("ক"তে **accent** দিলে) = গাছ, কলম ("লম্"এ **accent** দিলে) = লেখনী।

কতিপয় স্থলে দমকের সহিত **gesture** স্পষ্ট হইয়া পড়ে ও অর্থের পার্থক্য ঘটে। যথা, "গন্ধ" শব্দের "গ"তে দমক দিলে সুগন্ধ বুঝায়, আর শব্দের শেষ ভাগস্থিত "অ"তে দমক দিলে দুর্গন্ধ অর্থ প্রকাশ করে। "বাপরে" শব্দটীর "বা"তে দমক দিলে বিস্ময় এবং "রে"তে দমক দিলে যন্ত্রণার ভাব (**painful feeling**) জ্ঞাপন করে। দমক অনেক সময়ে দ্বিত্বের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা, অত = অত্‌ত, এত = এত্ত, ছোট = ছোট্ট ইত্যাদি।

অনেকস্থলে বৈদিক দমক রীতির সহিত আধুনিক বাঙ্গালার দমক রীতির

মিল দেখা যায়। বৈদিক ভাষায় প্রশংসা সূচক বা সাদর সম্ভাষণ-পূর্ণ সম্বোধনে শব্দের শেষ ভাগে দমক দেওয়া হইত। বাঙ্গালাতেও তদ্রূপ দেখা যায়। যথা, "ওগো উর্ব্বশী," "ওগো ও শুনছ" ইত্যাদি। হিন্দি ও উড়িয়াতে ইহার বিপরীত। যথা, "য়ে উর্ব্বশী," "ইয়ে পিয়ারে" ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষাতে সাধারণতঃ শব্দের প্রথম পদাংশের (Syllable) উপর দমক দেওয়া হয়। তবে পূর্ব্ববঙ্গে ইহার বিপরীত নিয়ম দেখা যায়। পূর্ব্ব-বঙ্গে দ্রাবিড় প্রভাবের ফলে শেষ শব্দাংশে দমক দিবার রীতি প্রচলিত আছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রথমাংশে দমক দিবার ফলে শেষবর্ণ অস্পষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কখনও শব্দের অন্তস্থিত দমক যুক্ত (accented বর্ণের বিলোপ ঘটিতে দেখা যায়। যথা, মাথা=মাতা, কোথায়=কোথা, করিলাম=করলাম ইত্যাদি। অনেক সময়ে প্রথম ও তৎপরবর্ত্তী বর্ণদ্বয়ের মিশ্রণ ঘটে। যথা, আইল=এল, আইস=এস, ইত্যাদি।

শব্দের "হ" দমকের অভাবে অনুচ্চারিত থাকে। যেমন, তাহার=তার তাহাতে=তাতে। এইরূপে "হ" অনুচ্চারিত হইলেও শব্দে "হ" এর আভাস থাকিয়া যায়; সুতরাং যাঁহারা লিখিবার সময় "তাহার" স্থলে উচ্চারণ অনুযায়ী 'তার' লিখেন, তাঁহারা ভুল করেন।

বাঙ্গালা ছন্দের উচ্চারণ ও দমক বিচার

প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের কবিতাপাঠে জানা যায় যে, তাঁহারা প্রত্যেক বর্ণকে এক একটী Syllable ধরিতেন এবং মৈথিলী ভাষার অনুকরণে ছন্দে শব্দের অন্তব্যঞ্জনবর্ণকে non-হসন্ত উচ্চারণ করিতেন। ইহাতে অনেকে বাঙ্গালাকে মৈথিলী ভাষা সমুদ্ভূত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মত নিতান্তই ভ্রমপূর্ণ। মিথিলা ও বঙ্গ বহুকাল পরস্পর মিলিত থাকিলেও প্রাচীন কালের কয়েকজন বৈষ্ণব কবি ব্যতীত বাঙ্গালার অন্য সমস্ত কবিই কবিতা

রচনাকালে অক্ষর ও Syllable কে সমান গণনা করেন নাই। পয়ারে অবশ্য অধিকাংশ সময়ে অক্ষর ও Syllable অভেদ দেখা যায়। যথা, "তুমি অতি শিশু ছেলে কোথা যাবে একাকী" এখানে ১৫টী অক্ষরে ১৫টী Syllable। কিন্তু এমন অনেক কবিতা আছে, যাহাতে ১৫টী Syllable কিন্তু ২০।২২টী অক্ষর। যথা—

"আ—শ্বিন মা—সের ভো—রের বে—লায় বা—গান ত—খন ফুল—প—রা। স—তেজ শ্যা—মল ত—রুর ত—লায় গ—ঙ্গা ছি—ল কূল—ভ—রা।" বৈষ্ণব যুগের সমসাময়িক কৃত্তিবাসের কবিতাতেও আছে :—

"এক—দিন শু—ক্র গে—ল ত—প—স্যা ক—রি—তে। হে—ন কা—লে দন্—ড রা—জা গে—লেন প—ড়ি—তে॥" ইহাতে পরিদৃষ্ট হয় যে অক্ষর ও Syllable ঠিক সমান সংখ্যক নহে। যথা, গেলেন শব্দে ৩টী অক্ষর কিন্তু Syllable দুইটী মাত্র।

দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, তাঁহারা সমস্ত সময়ে অন্তব্যঞ্জন বর্ণকে non হসন্ত উচ্চারণ করিতেন। কিন্তু এ ধারণাও ভ্রান্তি পূর্ণ। যথা,—

"অতিকায় পড়ে রণে রাবণ চিন্তিত।
যোড় হাতে বাপের আগে কহে ইন্দ্রজিৎ॥"

"যোড়" ও "বাপের", "চিন্তিত" ও "ইন্দ্রজিৎ" শব্দগুলির উচ্চারণ লক্ষ্য করিবার বিষয়। অন্নদা-মঙ্গলে সংস্কৃত শব্দ বিশিষ্ট কবিতাগুলি ব্যতীত অন্যান্য স্থলে এইরূপ নীতিই দৃষ্ট হয়।

যথা,—

"ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়া কাঁদি॥"

সন্ধি ও সমাস বাক্যে দমক

সংস্কৃত ব্যাকরণে সন্ধি সম্বন্ধে কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে।

Ease, fluency এবং অর্থ জ্ঞাপনার দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া, সন্ধির সুযোগ পাইলেই সন্ধি করা হয়। কিন্তু বৈদিক ভাষাতে এরূপ নিয়ম পরিদৃষ্ট হয় না। এ কারণ দেখা যায় যে, বেদের "বয়ম্ অন্ত ইন্দরস্ত প্রেইষ্টা" সংস্কৃততে "বয়মদ্যেন্দ্রস্য প্রেষ্ঠা" তে পরিণত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, বৈদিক ভাষা যখন লোক-ব্যবহারে অপ্রচলিত লিখিত ভাষায় বা সংস্কৃতে পরিণত হইল, তখন পণ্ডিতেরা এই সকল আইন-কানুনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পালি ও বাঙ্গালাতে এরূপ কঠোর নিয়ম পরিদৃষ্ট হয় না। ইহার একমাত্র কারণ এই ভাষাগুলি সংস্কৃতের মত প্রাণ-হীন ছিল না।

বেদে যেরূপ দমকযুক্ত (accented) শব্দাংশের (Syllable) সহিত দমকহীন (unaccented) শব্দাংশের (Syllable) সন্ধি হইলে দমকের প্রভাবে unaccented Syllable এর অন্তস্বরবর্ণের বিলোপ হয়, বাঙ্গালা-তেও সেরূপ হইয়া থাকে। যথা, বেদে চারু+বাক=চার্ব্বাক, অনু+আপ=অনূপ, বাঙ্গালাতে ঘোড়া+গাড়ী=ঘোড়গাড়ী, কাঁচা+কলা=কাঁচকলা ইত্যাদি।

দমকের প্রভাবে কখন বা Vowel দীর্ঘ হয়। যথা বেদে বিশ্ব+মিত্র =বিশ্বামিত্র। বাঙ্গালাতে কপ+কপ=কপাকপ, টপ+টপ=টপাটপ ইত্যাদি।

বৈদিক ভাষাতে যেরূপ স্বাভাবিক নিয়মে উৎপত্তিগত বা মৌলিক মিল বশতঃ একটী ব্যঞ্জনবর্ণ অপর ব্যঞ্জন বর্ণে পরিণত হয়, বাঙ্গালাতেও সেইরূপ রীতি দেখা যায়। যথা—ছোট+দাদা=ছোড়দা, যত+দিন=যদ্দিন ইত্যাদি।

সমাস-বাক্য গঠনেও আমরা accent এর জন্য স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের পরি-বর্ত্তন ঘটিতে দেখি। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, খাঁটী বাঙ্গালা শব্দের সমাস

প্রয়োগ নাই। কিন্তু ইহা সত্য নহে। প্রাচীন বৈদিক ও স্বাভাবিক রীতি অনুসারে বাঙ্গালাতেও সমাস ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

খাঁটী বাঙ্গালা শব্দের সমাস

অব্যয়ীভাব সমাস :—

বাঙ্গালা সমাসে অব্যয় শব্দগুলি সংস্কৃতের অনুযায়ী না হইলেও অব্যয় অর্থজ্ঞাপক বটে। বীপ্সা-বোধক অব্যয় :—গলি গলি, বাড়ী বাড়ী, রাস্তায় রাস্তায়, রোজ রোজ ইত্যাদি। ক্রম-বোধক অব্যয় :—পর পর, পিছু পিছু ইত্যাদি।

সমষ্টি-জ্ঞাপক অব্যয় :—মাঠকে মাঠ, গ্রামকে গ্রাম, বাজারকে বাজার, ইত্যাদি। সংস্কৃতে যেখানে পর্য্যন্ত বুঝাইতে "আ" ব্যবহার হয়, (আকণ্ঠ) বাঙ্গালাতে সেখানে শব্দটীর দ্বিত্ব হইয়া থাকে। যথা, গলায় গলায়, কানায় কানায় ইত্যাদি।

তৎপুরুষ :—

কর্ত্তা প্রধান তৎপুরুষ :—দাগলাগা, বাজপড়া ইত্যাদি।

কর্ম্ম প্রধান তৎপুরুষ :—মানুষখেকো, মনচোরা, ইন্দুরধরা, বইপড়া ইত্যাদি।

করণ প্রধান তৎপুরুষ :—হাতগড়া, কাপড়-ঘেরা, আরশুলা চাটা, বাদুড় চোষা, ইত্যাদি।

উদ্দেশ্য বাচক তৎপুরুষ :—তেলধুতি, পাজামা, মরা কান্না ও বসতবাটী ইত্যাদি।

অপাদান বাচক তৎপুরুষ :—পালছাড়া, সৃষ্টিছাড়া ইত্যাদি।

সম্বন্ধ বাচক তৎপুরুষ ঃ—বিয়ে-বাড়ী, মাস-কাবার, বন-বিড়াল ধর্ম্ম-ভয় ইত্যাদি।

অধিকরণ জ্ঞাপক তৎপুরুষ ঃ—গাছপাকা, ঘর পোষা, ইত্যাদি।

দ্বিগু ঃ—

াচগজি, তেহাতি, দুপিঠে ইত্যাদি।

া-মরা, হাঁড়ি-মুখো, পাড়া-বেড়ানী, গোঠ-মজানী ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব ঃ—

লেপ-কাঁথা, গরু-বাছুর, আলু-পটোল ইত্যাদি।

কর্ম্মধারয় ঃ—

কালাপণ্টন, সোনামুগ, রাঙ্গামুখ ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষাতে কতকগুলি শব্দ আছে যাহাদের অধিক্য বুঝাইতে গিয়া দমকের জন্য দ্বিত্ব হয়। তাহারা সমাস বাক্য হইতে পৃথক্। যথা,—সোজাসুজি, পাশাপাশি, মাঝামাঝি, হাঁটাহাটি, ছুটাছুটি, টানাটানি ইত্যাদি।

পুনরুল্লেখ অর্থে, যথা, মোটামুটি গুড়-গুড়ি ইত্যাদি।

নৈকট্য অর্থে, যথা, হাতাহাতি, মুখোমুখি, চোখোচোখি ইত্যাদি।

কতকগুলি শব্দ আছে, তাহারা আধিক্যবোধক হইলেও তাহাদের আকারের পরিবর্ত্তন হয় না। যথা, দাদা দাদা, বাড়ী বাড়ী ইত্যাদি।

"প্রায়" "মত" অর্থ জ্ঞাপক ও 'ভাব' ব্যঞ্জক শব্দগুলির বিনা পরিবর্ত্তনে দ্বিত্ব হয়। যথা, কাদা কাদা, জ্বর জ্বর, শীত শীত, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ইত্যাদি।

কতকগুলি শব্দ আছে যেগুলি নিজের সহিত দ্বিত্ব না হইয়া প্রতি শব্দের সহিত দ্বিত্ব হয়, ইহারাও সমাস নহে। যথা, ভেবে চিন্তে, করে কর্ম্মে, মেগে যেচে ইত্যাদি।

কতকগুলি শব্দের প্রতিশব্দের প্রচলন এখন আর নাই; কিন্তু এইরূপ স্থানে তাহাদের প্রয়োগ আছে। যথা, আশে পাশে (বৈদিক আশা= পাশ বা side), খুঁজে পেতে (হিন্দি পাত্তা), ইত্যাদি।

অনেক সময়ে "কোনও রূপ" এই অর্থ প্রকাশ করিতে শব্দটীর দ্বিত্ব হয়। যথা, মানে মানে, প্রাণে প্রাণে, ইত্যাদি।

"ইত্যাদি" অর্থ প্রকাশ করিতে অনেক সময়ে শব্দটীর দ্বিত্ব হয়। যথা, কাজ টাজ, ভাত টাত, মাছ টাছ ইত্যাদি।

বিরক্তি অর্থে ভাত ফাত, কাজ ফাজ ইত্যাদি।

বঙ্গভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব

কোনও জাতির ভাষা আলোচনা করিতে গেলে যে, সেই জাতির সহিত অপরাপর জাতির সম্পর্ক ও সংমিশ্রণের ইতিহাস আলোচনা করা একান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তির বিবরণেও আমরা দেখাইয়াছি যে, বঙ্গে আর্য্যগণের আগমনের পূর্ব্বে দ্রাবিড় ও কোল জাতি এখানে বসবাস করিত। তাই বঙ্গভাষার উপর দ্রাবিড় প্রভাব প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান।

পণ্ডিত প্রবর Sten Konow সাহেব প্রমাণিত করিয়াছেন যে, আর্য্য ভাষা সমূহের Dental অক্ষরগুলি যে Celebralএ পরিণত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণভাবে দ্রাবিড় প্রভাব-বশতঃ।

দ্রাবিড় গোষ্ঠির তামিল ভাষাতে একটী নিয়ম দেখা যায় যে, শব্দের আদিবর্ণ একাধিক যুক্তবর্ণে গঠিত হইতে পারে না এবং বিভিন্ন বর্গের ব্যঞ্জন বর্ণ একত্র যুক্ত হইতে পারে না। প্রাকৃত ও পালি ভাষাতেও আমরা এই নিয়ম দেখিতে পাই। সং—ব্রাহ্মণ=প্রা—বরাহ্মণ, সং—স্নেহ=প্রা—সিনেহ বা নেহ, সং—ধর্ম্ম=প্রা—ধম্ম, সং—প্রস্তর=পথর, ইত্যাদি।

বিজয় বাবুর মতে বাঙ্গালা সম্প্রদান বিভক্তি-চিহ্ন"কে" দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তামিল সম্প্রদান চিহ্ন "কু" হইতে আসিয়াছে।

দ্রাবিড় ভাষায় "অর" এবং "গল" শব্দ যোগে বহুবচন প্রকাশ করিবার রীতি আছে। বাঙ্গালা বহুবচন প্রকাশক "গুলি" এবং প্রাকৃত "গল" এই "গল" হইতে আসিয়াছে। বাঙ্গালা বহুবচন প্রকাশক "রা" পূর্ব্বোক্ত "অর" হইতে সমুদ্ভূত। শুধু "অর" যোগে বহুবচন ব্যবহারও বাঙ্গলায় পাওয়া যায়। যথা, পদ+অর=পয়ার।

বঙ্গভাষায় দ্রাবিড় প্রভাবের আর একটী নিদর্শন এই যে, বাঙ্গালায় এক বচনে ও বহু বচনে ক্রিয়া পদের রূপান্তর ঘটে না। যথা, আমি যাইতেছি এবং আমরা যাইতেছি।

দ্রাবিড় ভাষার আর একটী বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছান্দস, সংস্কৃত, প্রাকৃত প্রভৃতিতে সব সময়েই "না" শব্দ ক্রিয়ার পূর্ব্বস্থান অধিকার করে। কিন্তু দ্রাবিড়ের ন্যায় বাঙ্গালাতে আমরা ইহার বিপরীত প্রয়োগ দেখি।

সম্বন্ধ জ্ঞাপক শব্দকে বিশেষণ রূপে ব্যবহার করা দ্রাবিড় ভাষার একটী বৈশিষ্ট্য। আমরা বাঙ্গালাতেও ইহার প্রচলন যথেষ্ট দেখিতে পাই। যথা, সুখের খবর, গোলের কথা, ঝালের মাছ ইত্যাদি।

পতঞ্জলির মহাভাষ্য হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও, উহাতে দ্রাবিড় শব্দের প্রচলন স্থগিদ করা যায় নাই। (অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র কতকগুলি শব্দের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দ্রাবিড় জাতি আর্য্য বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতির সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। আমরা তাঁহার প্রদত্ত তালিকা হইতে কতকগুলি শব্দের সন্নিবেশ নিম্নে করিতেছি।

দ্রাবিড় শব্দ—	অর্থ ;	বাঙ্গালা শব্দ—	অর্থ
কাড় বা কাল	(darkness)	কালো	(black)
কাট্টিল	(bed stead)	খট্টা বা খাট	(bed stead)
বল	(to surround)	বলয়	(bangle)
মালৈ	(flower)	মালা	(garland)
মলৈ	(any mountain)	মলয়	(দক্ষিণ-দেশীয় কোন নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বত)
মীন	(fish)	মীন	
শালা	(house, স ও চ এর উচ্চারণ একরূপ)	চালা	(ঘর)
কোদাল		কুঠার	
উড়ুত্তু		ওড়না	
ওরম্	(end)	ওর	(as in 'ওর নাই)
কোকাকুকি		খোকাখুকী	
খুট্টা	(to collect)	খোটা	(to pick up)
চক্কণি	(beautiful)	চিকন	(as in চিকণকালা)
সোল	(sound, whisper)	সোর	(সোরগোল)
তিট্টু	(to abuse with cruel joke)	ঠাট্টা	
নোলা	(tongue)	নোলা	(লোভ)
মোটা	(bundle of luggage)	মোট	(ভার)

বাঙ্গালা ভাষায় কোল প্রভাব

সংস্কৃত কোল শব্দের অর্থ শূকর। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে প্রাচীন হিন্দুগণ শূকরভোজী অনার্য্যগণকে ঘৃণাসহকারে কোল আখ্যা প্রদান

করিয়াছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক সুনীতিকুমার ও **Mr Jellinghaus** বলেন যে, এইরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। তাঁহাদের মতে কোল শব্দ "মনুষ্য" অর্থে প্রযুক্ত কোল শব্দের রূপান্তর বা বিকৃতিমাত্র, ইহা জাতি অর্থে ব্যবহৃত হইত; ইহাতে ঘৃণা বা অবজ্ঞার ভাব আদৌ ছিল না। অধুনা যাহারা মুণ্ডা নামে অভিহিত, তাহারা এই কোল জাতিরই শাখা-বিশেষ।

যাহা হউক, অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই কোলজাতি ভারতবর্ষে বসবাস করিয়া আসিতেছে। আর্য্যজাতির আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতেই ইহারা প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষময় ব্যপ্তিলাভ করিয়াছিল। অধ্যাপক সুনীতিকুমার অনুমান করেন যে, বর্ত্তমান বাঙ্গালীজাতির উৎপত্তি আলোচনায় যে **Alpine short heads** নামে এক উপাদানের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা এই কোলজাতিরই সম্প্রদায়-বিশেষ, ইহাদের অবিকৃত রূপ পাওয়া যায়, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের জাতি বিশেষের মধ্যে। ইহাদেরই বংশধরগণ এখন আসামের চা-বাগানে কুলীর কাজ করিয়া থাকে। সুদূর অতীতে ইহাদের ভাষা ও আচার ব্যবহার যে দ্রাবিড় ও আর্য্যজাতির সহিত কিয়ৎপরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা আরও স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যখন দেখা যায় যে, আর্য্যজাতি কর্ত্তৃক দীর্ঘকালব্যাপী অনার্য্যপ্রভাব স্খালনের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও বর্ত্তমান আর্য্যভাষা সমূহে যথেষ্ট কোল শব্দের প্রচলন রহিয়া গিয়াছে। কোলজগতের নিকট হইতে গৃহীত উপাদানের কথা পশিলুস্কি (**Przyluski**) এবং লেভির (**Sylvain Levi**) ফরাসী ভাষাতে লিখিত প্রবন্ধগুলি হইতে পাওয়া যায়। পশিলুস্কি দেখাইয়াছেন যে "কম্বল" "কদলী" "ফল" "বাণ" "তাম্বল" "লাহল" "লিঙ্গ" "লগুড়" (লগী) প্রভৃতি কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ মূলে প্রাচীনকালে কোলদিগের ভাষা হইতে আসিয়াছে। অধুনা বাঙ্গালায় কথিত "আজগুবি" "বইটী" (**Kitchen Knife**) ও "ঝিঙ্গা" (তরকারী) "শড়াজা" প্রভৃতি শব্দও কোল ভাষা হইতে আগত।

বঙ্গভাষায় মুসলমান-প্রভাব

রাষ্ট্র-বিপর্য্যয়ে চিরদিনই ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। মুসলমান-বিজয় শুধু আমাদের রাজনীতিক ও সামাজিক ইতিহাসেই যুগান্তকর ব্যাপার নহে, আমাদের ভাষা এবং সাহিত্যের ইতিহাসেও ইহা একটী ফলিতার্থময় ঘটনা। আমরা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা-কালে দেখিতে পাইব যে, মুসলমান-নরপতিগণই পণ্ডিত-সমাজ কর্ত্তৃক অনাদৃত ও উপেক্ষিত বঙ্গভাষাকে সর্ব্বপ্রথমে সাদরে রাজসভায় স্থান দিয়াছিলেন। ভাষার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও বঙ্গভাষা বিজেতৃগণের শব্দ-ভাণ্ডার হইতে প্রভূত সম্পদ আহরণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে। মুসলমান-বিজয়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় ভাষা পারসিক প্রভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫ম শতকে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশ পারস্যের অধীনে গিয়াছিল। এই সময় হইতেই পারস্যের সহিত ভারতবর্ষের ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদান চলিয়াছে। পারসিক ভাষার শব্দও যে এই সময়ে ভারতীয় ভাষায় প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন অনেক মিলে। (অধ্যাপক সুনীতি-কুমারের The origin and development of the Bengali language গ্রন্থের ১৯৩—১৯৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক মুসলমান-বিজয়ের পর হইতেই আরবী ও পারসীর শব্দসম্ভারে বঙ্গভাষা বিশেষভাবে সু-সমৃদ্ধ হইয়াছে। নিম্নে আমরা মুসলমান-বিজয়ের ফলে যে সকল শব্দ-সম্পদ লাভ করিয়া বঙ্গবাণী তাহাদিগকে একরূপ নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন, তাহার মোটামুটি একটী তালিকা দিতেছি :—

কতল, কেল্লা, নস্কর, কল্মা, কেতাব, আমীর, দরবার, খেতাব, মালিক, হুজুর, জখম, কাবু, তাঁবু, তোপ, বাহাদুর, শিকার, আয়না, আতর, কাগজ, কলম, কুলুপ, গোলাপ, খাতা, পরদা, পাজামা, পোলাও, ফরাস, মিছরী, মুহুরী, রেকাব, রুমাল, দালান, তাকিয়া, কিশমিস, বারকোশ, দলিল, দস্তখত, বখরা, বাজেয়াপ্ত, শানাই, শাল, শিশি, সিন্দুক, হুঁকা ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষায় পর্টুগীজ প্রভাব

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে ইউরোপীয় মিশনারীগণের প্রচেষ্টার ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে গেলে, সর্ব্বপ্রথমেই পর্টুগীজ মিশনারীদিগের প্রচেষ্টার প্রতি দৃষ্টি পড়ে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয়ের মতে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে পর্টুগীজগণ বঙ্গদেশের নানাস্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। Bernier এর ভ্রমণ-কাহিনীতে দেখা যায়, ১৬৬০ অব্দে বঙ্গদেশে ৮।৯ হাজারের বেশী পর্টুগীজ পরিবার বাস করিতেছিল। বহু প্রামাণিক বিবরণ হইতে জানা যায় যে, এই সময়ে হুগলী, চট্টগ্রাম ও ঢাকা অঞ্চল পর্টুগীজ রোমান ক্যাথলিক মিশনারীগণের প্রচার-কেন্দ্র ছিল। ইঁহারা ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশীয় লোকের সহিত মেলা মেশা এবং বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে যত্নবান্ হন। ঢাকা মিশনের অধ্যক্ষ Manoel da Assampcao-লিখিত একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থের এক কপি বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। গ্রন্থখানির নাম "কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ"। ইহাতে গুরু ও শিষ্যের কথোপকথনের মধ্যদিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-মতের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তখনও বাঙ্গালায় ছাপিবার অক্ষরের সৃষ্টি হয় নাই। তাই পুস্তকখানি রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। এতদভিন্ন উক্ত পাদরী সাহেব বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভি-ধান প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। পণ্ডিতপ্রবর গ্রীয়ার্সন তাঁহার linguistic surveyতে এসম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বিবরণ দিয়াছেন।

পর্টুগীজগণের বাণিজ্য ও ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে এদেশে যাতায়াত ও নিয়মিতভাবে বসবাসের ফলে, পর্টুগীজ ভাষা হইতে বহু শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় আসিয়াছে। কেদারা, জানালা, ফিতা, গির্জ্জা, জোলাপ, আলমারি, আলপিন, বাল্‌তি, গামলা, পেরেক, বরগা, চাবি, এবং শপথ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত "মাইরি" প্রভৃতি শব্দ বঙ্গভাষায় পর্টুগীজ প্রভাবের সাক্ষ্য দিতেছে।

মাগধী, ওড়িয়া, বাঙ্গালা ও অসমীয়া ভাষার তুলনামূলক আলোচনা।

সর্ব্বনামগত সাদৃশ্য

আমি—বৈদিক বহুবচন অস্মে> অম্হে> অম্হি, অম্ভি> আম্হি, আম্ভি> আমি ; মই> মুই। ওড়িয়াতে মু, মুই বা মুহি ও আম্হে (উচ্চারণ অম্হে) এবং অসমীয়াতে "আমালোক" ব্যবহৃত হয়।

তুমি—সংস্কৃত যুষ্মৎ> তুস্মে>তুম্হে>তুম্হি, তুম্ভি> তুমি।

আপনি—সংস্কৃত আত্মানঃ>প্রাঃ অত্তণ বা অপ্পণ>বাঙ্গালা আপনি। ইহার ওড়িয়া আকার "আপন" ও অসমীয়া আকার "আপুনি"।

সে—সংস্কৃত সঃ> প্রাঃ সো> অর্দ্ধমাগধী সে> বাঙ্গালা সে।

কারক-চিহ্নগত সাদৃশ্য

কর্ত্তৃকারক ঃ—পূর্ব্বে আমরা "এ" যোগে কর্ত্তৃকারকের উল্লেখ করিয়াছি। এই একার বাঙ্গালাতে প্রায় সমস্ত কারকেই ব্যবহৃত হয়। যথা, "গ্রামে লোকে একমনে, পূজিয়ে দেবতাগণে, খড়্গে ছাগে কাটে লোকহিতে।" এখানে লোকে কর্ত্তা, দেবগণে ও ছাগে কর্ম্ম, খড়্গে করণ, লোকহিতে ৪র্থী, গ্রামে অধিকরণ। জৈন প্রাকৃতে এবং অসমীয়া ভাষায়ও একার যোগে কর্ত্তৃকারক গঠিত হইতে দেখা যায়।

কর্ম্মকারক ঃ—অধ্যাপক বিজয়চন্দ্রের মতে দ্রাবিড় 'কু' হইতে কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারকের 'কে' উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। ওড়িয়াতে এই 'কু' ঠিক অবিকৃতই আছে। এই 'কে' অনেকস্থলে 'ক'তে পরিণত হইতে দেখা যায়। যথা—লোক, তাহাক ইত্যাদি।

করণ-কারক ঃ—বিজয় বাবুর মতে সংস্কৃত তৃতীয়া বিভক্তি-চিহ্ন 'ভিস্' বা 'ভিঃ' হইতে পালি 'হি' উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা হইতে বাঙ্গালা 'ই' বা 'এ'র উৎপত্তি। জৈন প্রাকৃতের 'তে' বা 'দে' হইতে বাঙ্গালা 'দিয়া' হইয়াছে। 'হ'তে' তৃতীয়া হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ৫মীর চিহ্ন। যথা, "আমা হ'তে হেন কার্য্য না হবে সাধন।" মধ্যযুগের বাঙ্গালা হন্তে, হোন্তে>হইতে, হন্তে>হ'তে।

সম্প্রদান-কারক ঃ—কর্ম্ম ও সম্প্রদান বিভক্তির 'কে' সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। বাঙ্গালা হেতু অর্থ-জ্ঞাপক বিভক্তি-চিহ্ন 'লাগি' অসমীয়া সম্প্রদান-চিহ্ন 'লৈ' হইতে আসিয়াছে।

অপাদান-কারক ঃ—সংস্কৃত পঞ্চমী 'অৎ' শব্দ 'ই', 'ইদ', 'এ' 'এত' শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া 'ইৎথি' বা 'এৎথি' উৎপন্ন হইয়াছে। উহা হইতে পরে 'থি' বা 'থে'র উৎপত্তি।

সম্বন্ধ ঃ—সংস্কৃত ষষ্ঠী চিহ্ন স্য> প্রাকৃত সস> অ অ। উচ্চারণের সুবিধার জন্য এই 'অ' হইতে 'র' এর উৎপত্তি।

ক্রিয়াপদের উৎপত্তি বিচার ও তুলনামূলক আলোচনা

সংস্কৃত বর্ত্তমান কাল-জ্ঞাপক ক্রিয়াপদ 'করোতি' হইতে প্রাকৃত 'করই' এবং তাহা হইতে বাঙ্গালা 'করে' আসিয়াছে। ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষাতেও এই 'করে' আছে। প্রাকৃত আকার 'করই' প্রাচীন বাঙ্গালাতে অনেক দেখা যায়। এই সময়ে একবচন ও বহুবচনে পার্থক্য ছিল না। 'করন্তি', 'যান্তি' প্রভৃতি কখনও কখনও সম্মানসূচক অর্থে ব্যবহৃত হইত।

সেই জন্য 'করন্তি' হইতে করেন এবং 'যান্তি' হইতে 'যান' প্রভৃতি সম্মান-বিজ্ঞাপক ক্রিয়াপদগুলি উৎপন্ন হইয়াছে। 'করোসি'র 'সি'র নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। যথা, তুই করিস, মরসে ইত্যাদি। অনেকে বলেন যে উত্তম পুরুষের 'মি'এর নিদর্শন আর এখন পাওয়া যায় না; কিন্তু এই ধারণা ভ্রমাত্মক। রঙ্গপুর অঞ্চলে ভবিষ্যৎ অর্থে করিম, খাম, যাম এবং মৈমনসিংহ জেলার করিমু, খামু প্রভৃতি হইতে ইহার আভাস পাওয়া যায়।

The Present Progressive

অস্+তি='অস্তি' হইতে বাঙ্গালা 'আছে' উৎপন্ন হইয়াছে। এই 'আছে' Principal Verbএর সঙ্গে যুক্ত হইয়া বাঙ্গালা 'করিয়াছে' এবং ওড়িয়া 'করু অছি' প্রভৃতি আসিয়াছে।

Present Perfect and Past

ইহার মাত্র দুইটী রূপ আছে। যথা (বাঙ্গালা 'ধরিল' ও 'ধরিয়াছে' এবং ওড়িয়া 'ধরিলা' ও 'ধরিঅছি')। Past বুঝাইতে পরে এই 'আছি'র সহিত 'ল' যোগ করা হয়। যথা, আছিল, ধরিল ইত্যাদি। এই past form হইতে present perfect গঠনের জন্য 'আছে' যুক্ত করা হইল। যথা, করিল আছে=করিলছে, ফুটিল আছে=ফুটিলছে ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে এইরূপ present perfect formএর ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়।

Participial Forms

কৃত> কিদ বা কিড। পরে ড বা দ স্থানে অতীত চিহ্ন "ল" হইয়াছে। যথা, খাড বা খাদ=খাল। কোথায়ও বা ত স্থানে অ বা আ হয়। যথা, করা কাজ, কওয়া কথা, গলা টাকা, ছাড়া কাপড় ইত্যাদি। অনেক স্থলে ত স্থানে ন হয়। যথা, কোঁচান কাপড়, সাজান বাগান ইত্যাদি।

Special Past Forms

Negative participle ন, 'অৎথি'র সহিত যুক্ত হইয়া 'নৎথি'র এবং তাহা হইতে 'নাই'এর উৎপত্তি। এই 'নাই' কেবল মাত্র Negativeই নহে, ইহাতে verb to be মিশ্রিত আছে এবং ইহা একাধারে Negative ও past বোধক form. যথা—করি নাই=did not do.

Imperative Forms

Imperative forms বা অনুজ্ঞা অর্থ-জ্ঞাপক রূপ প্রাকৃতের ১ম পুরুষে করউ, জাউ, থাউ ইত্যাদি ওড়িয়াতেও আছে। বাঙ্গালাতে ইহার সহিত "ক" মুক্ত হইয়া করুক, যাক, থাক, প্রভৃতি নিষ্পন্ন হইয়াছে। মধ্যম পুরুষের প্রাকৃত অনুজ্ঞা করহ, জাহ, থাহ ইত্যাদি। বাঙ্গালাতেও তদনুরূপ কর, যাও, থাও প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন "ইও" যোগে অনুজ্ঞার একটী রূপ বাঙ্গালাতে আছে।

The Future Tense

"ইও" (যথা—করিও) এর অর্থ asked to be done not immediately ; সুতরাং ইহার মধ্যে ভবিষ্যতের অর্থ অনেকখানি নিহিত আছে। অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র অনুমান করেন এই "ইও" হইতে ভবিষ্যৎ-জ্ঞাপক চিহ্ন "ইব" হইয়াছে। "তব্য" এর সহিত এই 'ইও' বা 'ইব' এর কোনও সম্পর্ক নাই।

Adverbs

অসমাপিকা ক্রিয়া যোগে adverb. যথা, "বেলা যাচ্ছে হেঁটে চল"। 'করে' যোগে adverb. যথা, ভাল করে কাপড় পর, বুদ্ধি করে কাজ কর, ইত্যাদি। Reduplication দ্বারা adverb. যথা—সোজাসুজি, মাঝামাঝি ইত্যাদি।

'করে' যোগে Adjective

যথা, রোগাকরে লোকটী, মোটাকরে বৌটী, ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ গঠন

অ বা আ final শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গে ঈকার হয়। যথা, রামী, বাঁদরী, শয়তানী, কাকী, খুকী, ছুঁড়ী ইত্যাদি।

শ্রেণী বা জাতি বুঝাইলে ইনী, আনী বা নী হয়। সাপিনী, বাঘিনী, ময়রাণী, কলুনী, ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ছন্দের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ

সঙ্গীত হইতেই ছন্দের উৎপত্তি। এই সঙ্গীতই মানব-কণ্ঠের আদি ভাষা। সমালোচক শশাঙ্কমোহনের ভাষায় বলিতে গেলে "সরস্বতী মনুষ্যত্বের আদি দেবতা, সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কয়েকটী নামের মধ্যেই মনুষ্যের অতীত ইতিবৃত্ত-পথে এই দেবতার ক্রম-বিকাশ-পদ্ধতি সূচিত হইতেছে। গির্—বাক্—বাণী—বীণাপাণি। বাক্ প্রকাশের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার নাম গির্। বাক্যের রস ঋক্ এবং ঋকের রস উদ্‌গীথ। ইতর প্রাণিজগৎ এখনও এই অবস্থায় আছে, মনুষ্যও ছিল। ক্রমে বর্ণাত্মিকা বাগ্‌দেবী প্রকটিত হইয়া, মনুষ্যের জ্ঞান ভাব এবং ঈষণার প্রবৃত্তিকে গর্ভে ধারণ করিয়া বাণীরূপে মানব-সভ্যতার আদি ধাত্রীরূপে দাঁড়াইয়াছিলেন। উহার পর হইতেই সঙ্গীত এবং কাব্য আত্মজাগরণ লাভ করিয়া আপন আপন বিশিষ্ট ধারায় ছুটিয়া গিয়াছে।" সমস্ত ভাষার ছন্দাবলীই প্রথমতঃ **Tribal festive songs** বা জাতীয় উৎসবানুষ্ঠান-বিষয়ক সঙ্গীত হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। আর মানবের আদিম ভাব-বোধক ধ্বনি হইতেই এই সঙ্গীতের সৃষ্টি। অধ্যাপক বিজয়চন্দ্রের মতে সংস্কৃত মানবকক্রীড় ছন্দ ছেলেদের ছড়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি নিম্নোক্ত—

"আদিগতং | তুর্য্যগতং | পঞ্চমকং | চান্ত্যগতং | ছত্রটী অবলম্বন করিয়া, আমাদের ছেলে ভুলান ছড়ার নিম্নোক্ত—

হাত ঘুরুলে | নাড়ু দেব | নৈলে নাড়ু | কোথা পাব।
ডালিম গাছে | ফিলপু নাচে | তাক ধিনাধিন | বাদ্যিবাজে।

ছত্র দুইটীর সহিত সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে এই ছন্দটীকে গ্রাম্য বালক-বালিকাগণ সংস্কৃত হইতে গ্রহণ করে নাই; পণ্ডিতগণই তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার মতে সংস্কৃত লঘু ত্রিপদী যথা—

"চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং
শীলয় নীল নিচোলম্।"

ছেলে ভুলান ছড়া হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি উপর্য্যুক্ত ছত্রটীর সহিত ছেলে ভুলান ছড়ার নিম্নোক্ত—

ঘো ঘো রাণী, ঘো ঘো রাণী,
এতত টুকু পাণি"

ছত্রগুলির মিল দেখাইয়াছেন।

আমাদের বাঙ্গালা ছন্দ বঙ্গবাণীর নিজস্ব সম্পদ; উহা আদৌ মাতামহী সংস্কৃতের নিকট গৃহীত নহে। সঙ্গীত এবং শিশুকণ্ঠ-নিঃসৃত আনন্দের অভিব্যক্তি হইতেই উহাদের উদ্ভব। পয়ার ও লাচাড়ী এই দুইটীর মধ্যেই বাঙ্গালা ছন্দের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশের ইতিহাস নিহিত আছে। ইহাদের মধ্যে প্রথমটী পদচারণা সহকারে গীত হইত বলিয়া পয়ার এবং দ্বিতীয়টী নৃত্যসহকারে গীত হইত বলিয়া লাচাড়ী নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে ভাটগণ বিবাহাদি উপলক্ষে পাত্র পাত্রীর গৃহে যশোগান করিত। প্রাচীন সাহিত্যে এই ভাট-গীতির যথেষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। এই রূপ নানা জাতীয় গাথাই পয়ারের পুষ্টি সাধন করিয়াছে। গানে অক্ষর সম্বন্ধে বিশেষ কড়াকড়ি নাই। তাই প্রাচীন পয়ারে কোনও রূপ

শৃঙ্খলা পরিদৃষ্ট হয় না। তাহার পর লাচাড়ীর কথা। এই লাচাড়ীকে ছেলে মেয়েদের ছড়া হইতে গ্রহণ করিয়া প্রতিভাশালী কবিগণ ইহাকে নানা বেশে সুসজ্জিত করিয়াছেন। নিম্নে আমরা পয়ারের ক্রম-বিকাশের দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী তালিকার সন্নিবেশ করিব—

৯ অক্ষরের পয়ার :—

"গাছ রুইলে বড় কর্ম্ম।
মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম্ম"——খনার বচন

১০ অক্ষরের পয়ার :—

"আজু কেগো মূরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যাম রায়॥"——চণ্ডীদাস

১২ অক্ষরের পয়ার :—

"নয়ন-যুগলে সলিল গলিত।
কনক-মুকুরে মুকুতা খচিত॥"——রামপ্রসাদ

১৩ অক্ষরের পয়ার :—

"সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥"——চণ্ডীদাস

১৪ অক্ষরের পয়ার :—

"কার কিছু নাহি চাই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥"——কৃত্তিবাস

পয়ার এইরূপে ১৪ অক্ষরের সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া ক্রমান্বয়ে পঞ্চদশ, ষোড়শ ও অষ্টাদশ অক্ষর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

১৫ অক্ষরের পয়ার :—

"সরোবরে স্নান হেতু যেওনা লো যেওনা।
কমল-কানন পানে চেয়োনা লো চেয়োনা॥"—ভারতচন্দ্র

১৬ অক্ষরের পয়ার ঃ—

"মরি কিবা মুরহর পুরহর একদেহে।"

১৮ অক্ষরের পয়ার ঃ—

"আদিম বসন্ত প্রাতে উঠে ছিলে মন্থিত সাগরে।
ডান হাতে সুধাপাত্র বিষ-ভাণ্ড লয়ে বাম করে॥"—রবীন্দ্রনাথ

এইবার আমরা সমালোচক শশাঙ্কমোহনের প্রদর্শিত পথাবলম্বনে লাচাড়ীর ক্রম-বিকাশের ধারাগুলির একটু উল্লেখ করিব। লাচাড়ীর মূল ছড়া হিসাবে ছেলে ভুলান ছড়ার একটীকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

মূল লাচাড়ীর ছড়া ঃ—

১। "যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবেন শ্বশুর-বাড়ী কাজিতলা দিয়ে॥"

২। "তাল গাছ কাটন বোসের বাটন গৌরী হেন ঝি।
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করবো কি॥
টঙ্কা ভেঙ্গে শঙ্খা দিলুম কানে মদন কড়ি।
বিয়ের বেলা দেখ্‌তে এলুম মুখে পাকা দাড়ি॥
চোখ থাক্ তোর মা বাপ চোখ থাক্ তোর খুড়ো।
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছে হুঁকো টানা বুড়ো॥"

এই লাচাড়ী হইতেই ত্রিপদী, লঘুত্রিপদী, চৌপদী, লঘুচৌপদী, মাল ঝাঁপ প্রভৃতি অজস্র ছন্দের উদ্ভব হইয়াছে। বর্ত্তমানে আমরা লাচাড়ীর নানামুখী বিকাশের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিব।

১। "চিকন কালা, গলায় মালা, বাজান নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে, ভ্রমর বুলে; তেরছ চোখে চায়॥"

২। "হেলিছে দুলিছে, তুলিয়া ফেলিছে চল বল স্রোতসা।
জ্ঞানদাসের কেবল ভরসা ও রাঙা দুখানি পা॥"

৩। "হেরি হেরি ফিরি ফিরি বাহু ধরাধরি নাচত রঙ্গিনী মেলি।
জ্ঞানদাস কহে নাগর রসময় করু কত কৌতুক কেলি॥"

বৈষ্ণব পদাবলী হইতে পাঁচালী ও কাব্যকারগণের হাতে পড়িয়া লাচাড়ীর অক্ষর-সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে চৌপদী প্রভৃতি ছন্দের উদ্ভব হইয়াছে।

৪। "কত মায়া কর কত মায়া ধর হেরি হেরি হর হারে।
জিত মরামর হয় সেই নর তুমি দয়া কর যারে॥"

৫। "নিদ্রার আবেশে, রজনীর শেষে,
মনোহর বেশে বঁধু আসিয়া।
প্রেম পারাবার, করিল বিস্তার,
নাহি পাই পার যাই ভাসিয়া।"

শশাঙ্কমোহনের ভাষায় বলিতে গেলে, এই চৌপদীই ক্রম-বিকাশের পথে চলিতে চলিতে "নবীনচন্দ্রের মধ্যে কর্ণফুলীর তীরে বসিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে"—

"এই কালিন্দীর তীরে
এই কালিন্দীর নীরে
এই তরুতলে, এই গভীর কাননে,
বসি এই শিলাতলে,
এই নির্ঝরিণী কূলে
বলেছিলে কত কথা ভুলিলে কেমনে।"

ইহাই আবার হেমচন্দ্রের মধ্যে আসিয়া ভারত-মহাসাগরের তরঙ্গ-ভঙ্গীর অনুকরণ করিয়া গাহিয়াছে—

"গাহিছে পশ্চিমে পূরবে দক্ষিণে
ভারতসাগর আনন্দে তরল।
নাচিয়া নাচিয়া, নীলিমা অসীমে
দেয় করতালি তরঙ্গ চঞ্চল॥"

লাচাড়ী রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের হাতে পড়িয়া যেরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছিল, মহাকবি মধুসূদনের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গীয় কবিগণ নানাভাবে উহারই নাড়া চাড়া করিয়াছেন। রায় গুণাকরের প্রায় শতাধিক বর্ষ পরে মহাকবি মধুসূদনই বাঙ্গালার ছন্দঃ স্রোতস্বিনীতে নবজীবনের কল-কল্লোল আনয়ন করিলেন। একদিকে যেমন তিনি "প্রতিভার বলে চরণ-শৃঙ্খল কাটিয়া" বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষরের প্রচলন করিলেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার "রসাল ও স্বর্ণলতিকা" "আশার ছলনা" ও "বঙ্গভূমির প্রতি" প্রভৃতি কবিতায় এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্যে বাঙ্গালার ত্রিপদী চৌপদীকে অপূর্ব্ব স্বাধীনতায় মণ্ডিত করিয়া তুলিলেন। তৎপর কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ এবং ছন্দোরাজ সত্যেন্দ্রনাথের সাধনায় উহা নানা অভিনব সুষমায় বিভূষিত হইয়াছে।

সংস্কৃতের পদ-লালিত্যে বিমুগ্ধ হইয়া মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ভুবনমোহন চৌধুরী-প্রমুখ বহু লেখক অনুষ্টুপ, শশিবদনা, মালিনী, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি ছন্দকে বাঙ্গালা ভাষায় অবতারিত করাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

বৈদেশিক প্রভাব গ্রহণ সম্বন্ধে মতামত

বৈদেশিক প্রভাব যথোচিতরূপে গ্রহণ করিতে পারাই জীবন্ত ভাষার লক্ষণ। যে ভাষায় এই ক্ষমতা নাই, সে ভাষা পরিবর্ত্তন-শীল যুগের সহিত আপনাকে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে না। কিন্তু গ্রহণ করিবার একটী বিশেষ ক্ষমতা থাকা চাই। যে ভাষায় এই ক্ষমতা যথোপযুক্ত পরিমাণে আছে, সেই ভাষাই নানা ভাণ্ডার হইতে সম্পদ আহরণ করিয়া আপনাকে পরিপুষ্ট করিতে সমর্থ হয়।

এক ভাষাকে অন্য ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিতে হয় তিনটী কারণে। ১ম রাজকীয় প্রভাব। ২য় বিজাতীয় সংস্পর্শ ও সাহচর্য্য। ৩য় বিলাসিতা ও তজ্জাতীয় উপকরণ সমূহের নামকরণ ইত্যাদি। সংস্কৃতের মত সাধু ভাষাও এবম্বিধ ক্ষেত্রসমূহে আপনাকে বিশুদ্ধ রাখিতে পারে নাই। আমাদের

বঙ্গভাষাতেও অনার্য্য এবং বৈদেশিক শব্দ যথেষ্ট পরিমাণেই রহিয়াছে। কিন্তু এই শব্দগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাইব, বঙ্গভাষার উচ্চারণ-প্রণালীর বিশেষ পদ্ধতির এবং ব্যাকরণের ছাঁচে পড়িয়া এখন সে গুলি যেন একেবারে আমাদেরই নিজস্ব হইয়া পড়িয়াছে। একটী অল্পবয়স্ক বালকও তাহাদের অর্থ বুঝিতে পারে। এগুলির অর্থনিরূপণ জন্য অভিধান বা কোনওরূপ পাদটীকার আদৌ প্রয়োজন হয় না। এইরূপে যে সকল বৈদেশিক শব্দ আসিয়া ভাষায় আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা আর সমাজে অপাংক্তেয় থাকে না, তাহারা একান্ত আপনার জনের মতই হইয়া পড়ে। এই সকল শব্দ প্রথমে লোক মুখে অনবরত চলিতে চলিতে পরে পুস্তকাদিতে স্থান লাভ করে। ইহাকেই প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রহণ করা বলা যায়।

বর্ত্তমানে আমাদের বঙ্গভাষার অনেক লেখক অন্য ভাষা হইতে অভিধান দেখিয়া বাছাই করা শব্দ আনিয়া, বঙ্গভাষায় আমদানী করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইঁহাদের কেহ কেহ আবার শুধু শব্দ-চয়নই নহে, বিজাতীয় ভাষার বাক্যগঠন-প্রণালীতে বাঙ্গালাকে 'ঢালিয়া সাজিতে' উদ্যত। ইহার ফলে বর্ত্তমানে আমাদের বাঙ্গালা ভাষার বিভিন্ন তিনটী রূপ দেখা দিয়াছে। ১ম প্রকৃত বা খাঁটী বাঙ্গালা। নিম্নে আমরা বর্ত্তমান যুগের খাঁটী বাঙ্গালা বা আদর্শ ভাষার নমুনা দিব :—

১। "আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা।"

— রবীন্দ্রনাথ

২। "কিন্তু সংসারে অত ক্ষুদ্রের অত বড় দোহাই দেওয়া শুধু বিফল নয় বিপদের কারণ। রক্ষা এই যে অত ক্ষীণ কণ্ঠ অত বড় কানে গিয়া পৌঁছায়

না—না হইলে তাহার মুখের অন্ন ও চোখের নিদ্রা দুইই ঘুচিয়া যাইত। তাহার পরে কি ঘটিল বিস্তারিত করিয়া বলার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ঘণ্টা খানেক পরে যখন সে জমিদারের সদর হইতে ফিরিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল তখন তাহার চোখ ফুলিয়া উঠিয়াছে।" —শরৎচন্দ্র

সবদিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে ইহাই বর্ত্তমান সময়ের প্রকৃত বা আদর্শ বাঙ্গালা। ইহাই বঙ্গবাণীর অকৃত্রিম ও অনুপম নিজস্ব মূর্ত্তি। "আলালের ঘরে দুলালে" প্যারীচাঁদ বঙ্গবাণীর যে অনবদ্য নিজস্ব মূর্ত্তির সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন, বর্ত্তমানে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রতিভা সেই অনবদ্য মূর্ত্তিকেই বঙ্গের বাণীমন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

২য় প্রকারের ভাষাকে আমরা ইংরাজী-বাঙ্গালা নাম দিব।

উদাহরণঃ—"প্রখর বলিয়া বিজলী বাতিটা নিভানো রহিয়াছে টেবিলের উপর ক্যাণ্ডেল ষ্টাণ্ডে।"

৩য় প্রকারকে গজলী বাঙ্গালা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই ভাষা বিদ্রোহী কবি নজরুল এবং তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণের বাঙ্গালা। আরবী ও পারসী অভিধান হইতে বাছিয়া বাছিয়া আহৃত, পাদটীকা-সমন্বিত, শতকরা—৭৫টি শব্দের সহিত বাঙ্গালার সংমিশ্রণে সম্ভূত অভিনব বঙ্গভাষা। উদাহরণঃ—

১। "সাব্বাস ভাই, সাব্বাস দিই, সাব্বাস তোর শমসেরে।"

২। "খুবকিয়া ভাই খুবকিয়া,
বুজদিল ঐ দুশমন সব বিলকুল সাফ হোগিয়া।"

—নজরুল

৩। "আমার দাদীর তরে যেন গো ভেস্ত নাজেল হয়।"

—জসিমউদ্দিন

এই ভাষার প্রবর্ত্তক বিদ্রোহী কবির রচনা হইতে ইহার যথেষ্ট উদাহরণ

মিলিবে। কবিবরের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয়, তিনি শুধু সাহিত্যেই নহে, ভাষার উপরও একটা মৌলিকতার ছাপ রাখিয়া যাইতে চান। তাই সম্পূর্ণ অস্বাভাবিকভাবে আভিধানিক আরবী ও পারসী শব্দ বঙ্গভাষায় প্রবেশ করাইতে ইনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এই ঝোঁকটা কবিবরের এখন এতই বেশী চাপিয়াছে যে, যে সকল আরবী বা পারসী শব্দ একটু রূপান্তরিত অর্থে বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে, সেগুলিকেও মূল ভাষার বিশুদ্ধ অর্থে আনয়ন করিতে তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "খুন" শব্দটীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। "খুন" শব্দটী আমরা গ্রহণ করিয়াছি হত্যা অর্থে। বহুকাল ধরিয়া শব্দটীকে এই অর্থে ব্যবহার করিতে করিতে উহাকে আমাদের নিজস্ব করিয়া লইয়াছি। কিন্তু এই শব্দটীকে মূল ভাষার 'রক্ত' বা 'লাল' অর্থে আনয়ন করিতে কবিবর বদ্ধ-পরিকর। তাই তিনি অনেককেই 'খুনে' লাল করিয়াছেন। ইহার মধ্যে নিরপরাধা সরস্বতীদেবী এবং পলাশী জেতা ক্লাইব সাহেবের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১। "তাজা খুনে লাল করেছি সরস্বতীর শ্বেত কমল।"

২। "বাঙ্গালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর।"

পূর্ব্বোক্ত ইঙ্গ-বঙ্গ সম্প্রদায় এবং এই গজলীদল যাহা করিতেছেন, তাহা ভাষাকে বৈদেশিক সম্পদে সুসমৃদ্ধ করা নহে; ভাষার স্বাভাবিক গতিমুখে কতকগুলি আবর্জ্জনা স্তূপাকার করিয়া দেওয়া মাত্র। তবে ইহাতে ভাষার কোনও ক্ষতি নাই। কেননা পরবর্ত্তী বংশধরগণ যখন দেখিবে যে ভাষা এই সব কারণে সাধারণের দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া উহার নিজস্ব রূপটীই বাহির করিবে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত সার

দ্বিতীয় খণ্ড

"সন্তানে যার তির্ব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ।
তুই যে না মাগো তাদের জননী তুই যে না মাগো তাদের দেশ।"

বঙ্গ-সাহিত্যের হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ

বঙ্গ-ভাষার জন্ম ও ক্রমবৃদ্ধির ইতিহাস শেষ করিয়া, এইবার আমরা বঙ্গসাহিত্যের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিব। বঙ্গ-সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশের মূলে বিভিন্ন চারিটি ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র বিপ্লবের প্রভাব নিহিত আছে। ১ম—বঙ্গে বৌদ্ধ মতের অভ্যুদয়, ২য়—হিন্দু ধর্ম্মের নবজাগরণ, ৩য়—মুসলমান বিজয়, ৪র্থ—বৃটিশ অধিকারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাব ধারার সম্মেলন। বর্ত্তমানে আমরা বঙ্গে বৌদ্ধ মতের অভ্যুদয় বঙ্গ-সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশে যে অসামান্য প্রেরণা দিয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। সমালোচক শশাঙ্কমোহন যথার্থই বলিয়াছেন,—"ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি চিরকাল সমাজস্থ জনসাধারণের উন্নতির উপরেই নির্ভর করে। যে জাতির জনসাধারণ জাগে নাই, কিংবা কোনও বিশেষ দিকে জ্ঞান ভাবের প্ররোচনা প্রাপ্ত হয় নাই, এবং ঐ প্রেরণা যাহাকে আত্ম প্রকাশে প্রয়াসী করিয়া তুলে নাই, সেজাতির মধ্যে কষ্ট শিক্ষিত ভাষার বাক্য প্রকারে ধর্ম্ম দর্শন কিংবা পৌরোহিত্য প্রকৃতির গ্রন্থ সুবহু রচিত হইতে পারে; কিন্তু উহার প্রকৃত সাহিত্য হয় না। মনুষ্য মধ্যে সাহিত্যোন্নতির মূল কারণ তাহার সাধারণের জাগরণ।"

বঙ্গে বৌদ্ধমতের অভ্যুদয়ে সাধারণের জাগরণ ও বঙ্গ-সাহিত্যের সৃষ্টি

"বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙ্গালী দীপঙ্কর।"

—সত্যেন্দ্রনাথ

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম এক সময়ে বঙ্গদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের প্রারম্ভে চীন পরিব্রাজক ইউয়ন চোয়াঙ মুঙ্গের এবং সমুদ্রের অনুবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহে বহু বৌদ্ধ প্রচারক দেখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গের পাল-রাজগণ বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। এই সময়ে বঙ্গে বৌদ্ধ মত বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালী অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে বুদ্ধের অমৃত-ময় বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীই একদিন চীন ও জাপানে বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। শান্তরক্ষিত, শীলভদ্র-প্রমুখ বৌদ্ধ মনীষিবৃন্দ আমাদের বঙ্গজননীর ক্রোড়ই সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই বৌদ্ধ যুগে জনসাধারণের জাগরণের ফলেই আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যের সৃষ্টি। এদেশীয় বৌদ্ধ প্রচারকগণই সর্ব্বপ্রথম পণ্ডিত-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অনাদৃত ও উপেক্ষিত গৌড়-প্রাকৃতকে লিখিত ভাষায় পরিণত করিয়া বঙ্গসাহিত্যের বনিয়াদ স্থাপন করেন। শশাঙ্কমোহনের ভাষায় বলিতে গেলে,—"জগতের ইতিহাসে—মনুষ্যের উন্নতির ইতিহাসে বুদ্ধদেবের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। বুদ্ধদেব একভাবে মানব সভ্যতার আদি পুরোহিত ও সাধারণ তন্ত্রের আদিম স্রষ্টা, মানুষের পরম স্বত্বের আদি উপদেষ্টা, শঙ্কিত ভীত মুগ্ধ অজ্ঞানান্ধ মনুষ্যের নেত্রে প্রথম বিজ্ঞানের সূর্য্যালোক।.........এই সময়েই মানবাত্মার প্রধান জাগরণ—মনুষ্য মনের প্রথম বিপ্লব—মানুষের ধর্ম্মে ও কর্ম্মের আদর্শে নব-জীবনের সূত্রপাত।......বঙ্গদেশের অধিকাংশ মানুষ এক সময়ে এই বৌদ্ধ পতাকার আশ্রয় লইয়াছিল। তাহার প্রভাবেই প্রাচীন কালে বেদ ব্রাহ্মণোক্ত

কর্ম্মের স্থিতি এদেশে এত বিচলিত হইয়া গিয়াছিল যে, পরিশেষে বেদ-পরিপন্থী ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার যুগে, নবম শতাব্দীতে কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমদানী করার আবশ্যক পড়িয়াছিল। বঙ্গদেশে বৈদিক ঋষির বা পৌরোহিত্যের প্রতিষ্ঠা থর্ব্ব হইয়া সংস্কৃত ভাষার প্রভাবও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু জনসাধারণের হৃদয় মধ্য হইতে আর একটী যুগোপযোগী মহাশক্তির আবির্ভাব হইতেছিল, তাহা বঙ্গভাষা।" সুদূর অতীতে বুদ্ধদেব তাঁহার উপদেশবলী লোক ব্যবহারে প্রচলিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিবার যে আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাদেশিক কথিত ভাষাগুলি উন্নতির পথে যথোপযুক্ত প্রেরণা লাভ করিয়াছিল। ইহার ফলেই পরবর্ত্তী যুগে খৃষ্টীয় ৮ম শতক হইতে ১২শ শতকের মধ্যে গৌড়ীয় প্রাকৃত হইতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সমুদিত হইয়া জনসাধারণের হৃদয়-রাজ্য অধিকারে সমর্থ হইল।

আমাদের সকল যুগের সাহিত্যই ধর্ম্মমত বা পূজাপদ্ধতির প্রভাবেই প্রভাবান্বিত। ধর্ম্মভাবকে অবলম্বন করিয়াই এদেশীয় সাহিত্য প্রতিভার উদ্বোধন হইয়াছে। এযুগের সাহিত্যেও আমরা ইহাই দেখিতে পাইব।

হিন্দু বৌদ্ধযুগের সাহিত্য

(১) শূন্যপুরাণ, (২) মানিকচাঁদের বা ময়নামতীর গান, (৩) নাথ-গীতিকা, (৪) কথা-সাহিত্য (৫) ডাক ও খনার বচন এইগুলিকে আমরা বৌদ্ধযুগের সাহিত্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকি।

(১) শূন্যপুরাণ

আলোচ্য গ্রন্থখানি ধর্ম্মপূজা-প্রবর্ত্তক রামাই পণ্ডিত বিরচিত। পুস্তক-খানি বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া, বিগত ১৩১৪ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি "বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির" ইহার একটী নূতন সংস্করণ বাহির করিয়াছেন।

এই নূতন সংস্করণের সংস্কর্ত্তা শ্রীযুত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার সুদীর্ঘ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা লিখিয়াছেন, ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেব ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়।

বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের মতে রামাই পণ্ডিত ২য় ধর্ম্ম পালের রাজত্ব-কালে খৃষ্টীয় ১১শ শতকের প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। ইনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিকৃতরূপ ধর্ম্ম-পূজার প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। ইঁহার বংশধরগণ এখনও নানাস্থানে বিদ্যমান। ধর্ম্ম সেবক সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও ইঁহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে।

এই ধর্ম্মরাজ বা ধর্ম্মদেব ভগবান্ বুদ্ধেরই নামান্তর মাত্র। এই ধর্ম্ম-পূজা প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধদেবেরই পূজা। ধর্ম্ম সেবকগণের মধ্যে তাম্রধারণ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। বর্ত্তমানে এই তাম্র বলয় উঠিয়া গিয়া তাম্র অঙ্গুরীর প্রচলন হইয়াছে।

শূন্যপুরাণে মোট ৫১টী অধ্যায় আছে। তন্মধ্যে ৫টী সৃষ্টিপত্তন সম্বন্ধীয়। এই সৃষ্টিপত্তন সম্বন্ধে রামাই পণ্ডিত মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ-দিগের মতানুবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, বিদ্যানিধি, এম-এ, মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার অষ্টত্রিংশ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ডে, শূন্যপুরাণ সম্বন্ধে একটী বিস্তৃত গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। শূন্যপুরাণের রচয়িতা সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন—"সমগ্র শূন্যপুরাণ এক কবির বা গায়কের রচিত নয়, এক দেশেরও নয়। এক কৃত্তিবাস হইতে যেমন বহু কৃত্তিবাসের উদ্ভব হইয়াছে, এক রামাই হইতে তেমনি অনেক রামাই জন্মিয়াছিলেন।"

শূন্যপুরাণের রচনা সময় সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "শূন্যপুরাণের রচনার কালও একটী নয়। যে সকল পদ্যে পারসী শব্দ আছে, সে সকল বাদ দিলেও একটী কাল নয়। কাল মাপিবার গজও নাই। সে গজ এক দেশীয় সমান বিদ্বান্ কবির নির্ম্মিত না হইলে, প্রমাণ হইতে পারে না।

এইরূপ গজ অন্ততঃ দুই তিন কালের থাকা চাই। কারণ সকল দেশের ভাষা পরিবর্ত্তন এক ক্রমে এক বেগে হয় না। এই হেতু দেশ না জানিলে ভাষা দৃষ্টে কাল অনুমান দুঃসাধ্য। নগেন্দ্রবাবু পুঁথির লিপি দৃষ্টে ইহা ৩০০ বৎসরের প্রাচীন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাষায় দেড়শত বৎসরও পাইতেছি। ইহার প্রাচীনতম অংশ ত্রয়োদশ খৃষ্ট শতাব্দের মনে হয়।" অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র বলেন,—"রচনা প্রাচীন ও জটিল এবং উহা একাদশ শতাব্দীর বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের দ্বিধা হয় না।"

ধর্ম্মপূজা ও শিবের গাজন

বঙ্গদেশের নানাস্থানে প্রচলিত শিবের গাজন শূন্য পুরাণোক্ত ধর্ম্মপূজারই একটী বিশিষ্ট রূপান্তর। অধুনা প্রচলিত গাজনে শিবঠাকুর প্রধান দেবতা হইলেও গাজনের ছড়া ও গানে অনেক স্থলেই ধর্ম্মঠাকুরের প্রাধান্য ও দোহাই রহিয়া গিয়াছে। গাজনের শিবও পৌরাণিক যুগের শিব নহেন; বৌদ্ধযুগের সেই কৃষক শিব। ইনি প্রতিদিন ক্ষেত্রে কৃষিকর্ম্ম করেন, এবং গৃহে ফিরিয়া শিবানীর সহিত ইতর লোকের ন্যায় কলহ করিয়া থাকেন। "আদ্যের গম্ভীরা" নামক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট মালদহের গাজন-গাথাতে এবং কিছুকাল পূর্ব্বে "মাসিক বসুমতী" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত আমাদিগের "নদীয়া ও যশোহরের গাজন-গীতি" শীর্ষক প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট গাজনের গানও ছড়াগুলিতেও এই কৃষক শিবের অতি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। ধর্ম্মপূজায় সেবকগণের যেরূপ তাম্র-ধারণের বিধি আছে, শিবের গাজনেও তেমনি ভক্তরা তাম্র অঙ্গুরী সূতায় গাঁথিয়া গলায় পরিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অনুষ্ঠান ও পূজাপদ্ধতিতে ধর্ম্মপূজার সহিত শিবের গাজনের যথেষ্ট মিল দেখা যায়।

মাণিকচন্দ্রের বা ময়নামতীর গান

এই মাণিকচন্দ্রের বা ময়নামতীর গান পণ্ডিতপ্রবর গ্রীয়ার্সন সাহেব ১৮৭৮ অব্দের এশিয়াটিক সোসাইটীর জার্নালে প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি প্রথমে এই গীতোক্ত রাজা মাণিকচন্দ্রকে ১৪শ শতকের লোক বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎপরে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র তাঁহাকে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, এই গানে কড়ি দ্বারা রাজকর আদায়ের যে প্রথা দেখা যাইতেছে, উহা হিন্দু আমলের প্রথা। যাহা হউক, বর্ত্তমানে ইহা অপেক্ষা আরও সুদৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল যুদ্ধে পরাভূত করেন। এই রাজেন্দ্র চোল ১০১৩ হইতে ১০৪৪ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

আমাদের আলোচ্য এই ময়নামতী বা গোবিন্দচন্দ্রের গান পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই গাথা সম্বন্ধে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"বঙ্গীয় রাজা গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের গাথা ভারত-বিশ্রুত। * * * ইঁহার সন্ন্যাস-জনিত করুণ মর্ম্মস্পর্শী গীতি সমস্ত ভারতবর্ষের মনোবীণায় এক সময়ে করুণসুরে বাজিয়া উঠিয়াছিল।" উড়িয়া ভাষায় লিখিত গোপীচন্দ্রের গানের একখানি পুঁথি ময়ূরভঞ্জ হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গ লইয়া এখনও মহারাষ্ট্র অঞ্চলে নাটকাদি রচিত হইয়া থাকে। বিশ্ব-বিশ্রুত রাজ-চিত্রকর রবিবর্ম্মা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের একখানি অতি মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কাশী, পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দীতে লেখা "গোপীচাঁদকী পোথী" পরিদৃষ্ট হয়।

রাজা মাণিকচন্দ্র ময়নামতীকে বিবাহ করিয়া মেহেরকুল বা ত্রিপুরা-রাজ্যের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন। ত্রিপুরার পার্শ্বস্থ শৈলমালা এখনও ময়নামতী নামে অভিহিত হইতেছে।

স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতার মতে এই গোপীচন্দ্রের নাম হইতেই "গোপীযন্ত্র" নামধেয় বাদ্যযন্ত্রের নামকরণ হইতেছে।

গাথায় বর্ণিত আখ্যায়িকা

এই গাথায় বর্ণিত ময়নামতীর প্রকৃত নাম ছিল শিশুমতি। ইনি অল্প বয়সেই সাধু গোরক্ষনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গোরক্ষনাথ ইঁহাকে মহাজ্ঞান শিক্ষা দেন। এই মহাজ্ঞান প্রভাবে চিরায়ু হওয়া যায় এবং সকল রোগ-শোক দূরীভূত হয়। ময়নামতী ইঁহার গুরু-প্রদত্ত নাম। মাণিকচন্দ্র ময়নামতীকে বিবাহ করিবার পর রাণী তাঁহাকে মহাজ্ঞান শিখাইতে অভিলাষী হন। কিন্তু রাজা স্ত্রীকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী হন নাই। পরে মাণিকচন্দ্র ত্রিপুর রাজগণের প্রথানুযায়ী অনেকগুলি যুবতীর পাণিগ্রহণ করেন। জনৈকা সপত্নীর সহিত কলহ হওয়ায় রাজা ময়নামতীকে রাজপ্রাসাদ হইতে দূর করিয়া দেন। অতঃপর ময়নামতী ফেরুসা নগরে বাস করিতে থাকেন।

রাজা জনৈক দাড়িয়াল বাঙ্গাল মন্ত্রীর পরামর্শে প্রজাপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। উৎপীড়িত প্রজাগণ রাজার মৃত্যু-কামনায় অভিচার অনুষ্ঠান করে। রাজার মৃত্যুকাল সমুপস্থিত হইলে, ময়নামতী রাজপ্রাসাদে আনীত হন। স্বামীর প্রাণ-রক্ষার জন্য তিনি যমরাজ ও যমদূতকে যথেষ্ট প্রহার করেন; কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অকৃতকার্য্য হন। রাজার মৃত্যুকালে গোবিন্দচন্দ্র মাতৃগর্ভে ছিলেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর তিনি সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

গোবিন্দচন্দ্র ঢাকা সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যা অদুনার পাণিগ্রহণ করেন এবং পদুনাকে যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ভট্টশালী মহাশয় সম্পাদিত ময়নামতীর গানে পাওয়া যায়,—দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল তাঁহার এক কন্যা গোবিন্দচন্দ্রকে সমর্পণ করিয়া, তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন

করেন। গোবিন্দচন্দ্র অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলে, রাণী ময়নামতী তাঁহাকে দ্বাদশ বর্ষের জন্য সন্ন্যাস-গ্রহণের আদেশ দেন। তরুণ-বয়স্কা রাণীরা এই সন্ন্যাসের বিশেষ বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা বিষ-প্রয়োগে ময়নামতীর জীবনান্ত করিবার প্রয়াস পর্য্যন্তও পাইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি মহাজ্ঞান-প্রভাবে সমস্তই ব্যর্থ করিয়া দেন। বৃদ্ধা রাণীর একমাত্র যুক্তি এই ছিল যে, ১২ বৎসর সন্ন্যাস-গ্রহণে অতিবাহিত না করিলে ১৯শ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত। যাহাহউক, অবশেষে তাঁহাকে সন্ন্যাস-গ্রহণই করিতে হইল। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছেন, "এই সন্ন্যাস উপলক্ষে অদুনা পদুনার বিলাপ কারুণ্যের নির্ঝর। প্রাচীন গ্রাম্য ভাষার কর্কশ উপলখণ্ডের মধ্য হইতে সেই মর্ম্মান্তিক কষ্টের ঝরণা বহিয়া আসিয়াছে।" নিম্নে আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"না যাইও না যাইও রাজা দূর দেশান্তর।
কারে লাগিয়া বান্দিলাম সীতল মন্দির ঘর॥

* * * *

নিন্দের স্বপনে রাজা হব দরিসন।
পালঙ্গে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন॥
খালীঘর জোড়া টাটী মারে লাঠীর ঘা।
বয়স কালে যুবতী রাড়ী নিতে কলঙ্ক-রাও।
আমাক সঙ্গে করি লইয়া যাও॥

* * * *

আইল পাতার দেখিলে কথা কহিয়া যামু।
গিরি লোকে বাড়ী গেলে গুরু স্থাম বলিমু॥"

বহু বর্ষ পরে সন্ন্যাসি-বেশে গোবিন্দচন্দ্র স্বীয় রাজধানীতে উপনীত হন। রাণী অদুনা তখন তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। রাজপুরীতে এই

অনধিকার প্রবেশের জন্য রাজহস্তীকে তাঁহাকে পদদলিত করিতে এবং রাজপুরীর কুকুরকে তাঁহাকে দংশন করিতে লেলাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু হস্তী শুঁড় নোয়াইয়া প্রবাস-প্রত্যাগত রাজাকে অভ্যর্থনা করিল এবং কুকুরটী তাঁহার পদতলে লুটাইয়া প্রভু-ভক্তি নিবেদন করিল। তৎপর রাণীরা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন।

ময়নামতীর চরিত্রে সম্বন্ধে মতামত

সন্ন্যাস-গ্রহণের-প্রস্তাব প্রসঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র বলেন যে, রাণী ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্য হাড়িসিদ্ধার হাতের পান লইয়াছেন এবং তাহার সহিত প্রণয়-স্থাপন করিয়া মহাজ্ঞান শিখিয়াছেন। ময়নামতীর বিরুদ্ধে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ এই যে, রাণী ময়নামতী হাড়িসিদ্ধার সহিত পরামর্শ করিয়া, তাঁহার পিতা মাণিকচন্দ্রকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিয়াছেন। অনুমান করা যাইতে পারে, গোবিন্দচন্দ্রের মহিষীগণ পতির সন্ন্যাস-গ্রহণ ব্যাপারে উত্তেজিত হইয়া এই সকল কুৎসা রটনা করিয়াছিলেন; কিন্তু "গোরক্ষ-বিজয়" পুস্তকে ময়নামতীর দলভুক্ত লেখকগণও হাড়িসিদ্ধার সহিত ময়নামতীর এই প্রণয়ের কথা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের সর্ব্বত্রই ময়নামতী ও হাড়িসিদ্ধার যথেষ্ট সুখ্যাতি দেখা যায়।

ময়নামতীর গানে বৃদ্ধা ময়নামতীর কখনও শ্যেনরূপে' কখনও কপোতরূপে রূপ-পরিবর্ত্তন প্রভৃতির সহিত গ্যালিক উপাখ্যানগুলির আশ্চর্য্যরূপ মিল আছে।

গোরক্ষবিজয়

"গোরক্ষবিজয়" মহম্মদ আবদুল করিম কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গোরক্ষনাথ নাথ-সম্প্রদায়ের অধিনেতা। ইনি রাজা মাণিকচন্দ্র ও ময়নামতীর সমসাময়িক। সুতরাং

ইনিও একাদশ শতকের লোক। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্রের মতে ইনি পঞ্জাবের জালন্ধর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। "গোরক্ষবিজয়" এবং বিশ্বকোষ-অভিধানের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, এই গোরক্ষনাথই কালীঘাটের কালী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গোরক্ষনাথ নাথ-সম্প্রদায়ের অধিনেতা। এই নাথধর্ম্ম বৌদ্ধ ও শৈবমতের সংমিশ্রণে গঠিত। গোরক্ষবিজয় ও "ময়নামতীর গানে" বৌদ্ধ মহাযান-মতের অনেক কথাই আছে।

এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"গোরক্ষ-বিজয়ে"র মত এরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থ যে বঙ্গসাহিত্যের আদি যুগে লিখিত হইয়াছিল ইহা আমাদের গৌরবের কথা। গোরক্ষ যোগীর চরিত্র শরৎ-শেফালিকা বা যূথিকার ন্যায় শুভ্র; তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্য বঙ্গসাহিত্যের আদি যুগের একটী প্রধান দিক্-নির্দ্দেশক স্তম্ভ। ইহা বৌদ্ধযুগের চরিত্র-বল, উচ্চনীতি, গুরুভক্তি প্রভৃতি মহৎ গুণরাশিকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। * * * * গোরক্ষ ভগবতীর সমস্ত প্রলোভন একটী একটী করিয়া জয় করিয়া, ইহুঁদি-শ্রেষ্ঠ জোবের মত অকুণ্ঠিত ভাবে স্থৈর্য্য-পরায়ণ। নারীর ললাম সৌন্দর্য্য ও প্রেম-নিবেদনের নব নব কষ্টিপাথরে তাহার চরিত্র কতবার কষিত হইল, কিন্তু প্রত্যেক বারই প্রমাণিত হইল তাহা খাঁটী সোনা।"

কথাসাহিত্য

আমাদের দেশে যে সকল রূপকথা এবং পল্লীতে প্রচলিত বালিকাদিগের ব্রতকথা আছে, তাহার অনেক গুলিই অতি প্রাচীন। তবে এগুলির মূল ভাষা পাইবার উপায় নাই। কেননা এসম্বন্ধে কোনও পুঁথি পত্র নাই; লোকমুখেই বরাবর চলিয়া আসিতেছে। এইরূপে লোক-মুখে চলিতে চলিতে ইহার ভাষাও পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে।

তবে এগুলি যে খুব প্রাচীন তাহার প্রথম প্রমাণ ভাষা। ভাষা রূপান্তরিত

হইয়াছে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে বহু প্রাচীনতা-জ্ঞাপক শব্দ রহিয়া গিয়াছে; যথা, "থুয়া পূজি থুয়ালী। আঘন মাসের ভূঞালী॥ অকালে ভাতন্তী। অকালে পুতন্তী॥ ঢেঁকি পড়ন্ত। গাই বিয়ন্ত॥" ইত্যাদি।

এগুলির প্রাচীনতার ২য় প্রমাণ এই যে, ইহাতে দেখা যায় ঐ সময়ে বাঙ্গালী বড় বড় ডিঙ্গা সাজাইয়া সমুদ্রে গমনাগমন করিত। পৌরাণিক যুগে হিন্দুর সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছিল; সুতরাং ইহা পৌরাণিক হিন্দু অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। মনসার ভাসান, চণ্ডীমঙ্গল, সত্যনারায়ণের পাঁচালী প্রভৃতিতে যে সমুদ্র-যাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা বহু পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত কাহিনী সমূহ অবলম্বনে লিখিত। কিন্তু এই সকল রূপকথাতে নৌকা-যাত্রা প্রভৃতি বিষয়ের বিশদ বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়।

৩য় প্রমাণ মুসলমানী বঙ্গসাহিত্যে মিলে। আমাদের দেশে প্রচলিত সাপের মন্ত্র, ভূতের মন্ত্র, বশীকরণের মন্ত্র ও রূপকথা প্রভৃতি হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদিগের মধ্যেই বেশী প্রচলিত। অথচ এগুলির সমস্তই কেবল হিন্দু দেবদেবীর কথাতেই পূর্ণ। এতদ্ভিন্ন মুসলমান ফকিরগণ এখনও পল্লী-গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে লক্ষ্মীর পাঁচালী গাহিয়া থাকে। ইহা কিছুতেই সম্ভব পর নহে যে, মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর তাহারা ইহা গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বে হিন্দু বা বৌদ্ধ থাকার সময়ে এগুলি তাহাদিগের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় ছিল। তাই পরে মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াও এগুলিকে ত্যাগ করিতে পারে নাই।

রূপকথার সংগ্রহ-সম্বলিত পুস্তকের মধ্যে শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের "ঠাকুরদাদার ঝুলি"ই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে "মধুমালা" "পুষ্পমালা" "কাঞ্চনমালা" "মালঞ্চমালা," ও "শঙ্খমালা" এই পাঁচটী মনোরম রূপকথা পাওয়া যায়। এই সকল রূপকথার সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"প্রত্যেকটী গল্পেই বঙ্গীয় পল্লী-লক্ষ্মীর পদাঙ্ক-চিহ্ন পড়িয়া আছে; বাঙ্গালী রমণী হৃদয়ের অফুরন্ত স্নেহ-সুধা,

তাঁহাদের অটল চরিত্রবল এবং দুশ্চর তপস্যা, তাঁহাদের নীরব প্রেমের ত্যাগশীল সহিষ্ণুতা লজ্জা-শীলতা ও স্থৈর্য্য প্রত্যেক গল্পের মধ্যে আত্মগরিমায় প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছে। * * * সাহিত্যিক লিপি-কুশলতা এই সকল গল্পে অত্যন্ত আশ্চর্য্য রূপ দৃষ্ট হয়। রচয়িতা বিশেষণ শব্দ প্রায়ই ব্যবহার করেন নাই, তিনি নিজে কোনও কথা কহিয়া পাঠকের রুচি বা মানসিক ভাবকে কোন দিকে পরিবর্ত্তিত করিতে আদৌ চেষ্টা করেন নাই, শুধু ঘটনার পর ঘটনা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—তাহাতেই চরিত্রগুলি এরূপ ফুটিয়াছে যে, কোন সমাসের ঘটা, রূপবর্ণনার আতিশয্য বা লেখকের বক্তৃতায় তাহা হইতে পারিত না।" এই সকল আখ্যায়িকার সহিত মধ্যযুগের ইউরোপের এই জাতীয় আখ্যায়িকাগুলির যথেষ্ট মিল দেখা যায়।

এই জাতীয় মন্ত্র, রূপকথা এবং পল্লীতে পল্লীতে প্রচলিত ছড়া, গাথা, গান ইত্যাদির মধ্যে অনেক মূল্যবান্ সম্পদ লুক্কায়িত আছে। এগুলি যে শুধু আমাদের গ্রাম্য সাহিত্যের নিদর্শন তাহা নহে। ইহার মধ্যে বাঙ্গালার জাতিতত্ত্ব ও সামাজিক ইতিহাস প্রভৃতির অনেক তথ্য নিহিত রহিয়াছে। গান, পদ প্রভৃতি হইতে দেশের সভ্যতার বিকাশ, চিন্তার ধারা, এবং জনসাধারণের শিক্ষা ও রুচির বিষয় জানিতে পারা যায়। আমরা যদি এই সকল ছড়া, গান, গাথাপ্রভৃতি সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটা দিকের উপর আলোক-সম্পাত করিতে পারিব। বাঙ্গালার সহিত এবং বাঙ্গালী জীবনের বৈশিষ্ট্যের সহিত পরিচিত হইতে হইলে, আমাদিগকে এগুলির শরণাপন্ন হইতে হইবে। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন, "আপনাদিগের সম্মুখে কর্ম্মতালিকা বিরাট্। সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম দেশের সঙ্গে পরিচয়স্থাপন। বাঙ্গালা দেশের সঙ্গে পরিচয়-স্থাপনের পর যে অনুরাগের সৃষ্টি, তাহাই স্বরাজের ভিত্তি। নতুবা এখনকার উৎসাহের কতটা আসল ও কতটা ভেল, তাহা ঠিক বলিতে পারিতেছি না।" (মাসিক বসুমতী—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬)।

বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন গাথা, পালা-গান ইত্যাদি সংগ্রহে অবহিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, কয়েকজন সাহিত্যানুরাগী যুবককে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে দেখা যাইতেছে। তবে আমাদের দেশে এসকল বিষয়ে উৎসাহ প্রদান ও পৃষ্ঠপোষকতা করিবার মত লোক খুবই বিরল।

ডাক ও খনার বচন

ডাকের বচনে জ্যোতিষ ও ক্ষেত্রতত্ত্ব এবং বিশেষভাবে মানব-চরিত্রের ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হইয়াছে। খনার বচনে শস্যাদি বপন করিবার সময় এবং যাত্রার দিন, লগ্ন প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।

ডাক ও খনার বচন কোনও ব্যক্তি-বিশেষের রচনা নহে। এইরূপ ভণিতা দিয়া বিভিন্ন ব্যক্তি তাহার স্বীয় অভিজ্ঞতা সমূহ শ্লোকাকারে গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

ইহাদের প্রাচীনতা

ইহাতে বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শন স্বরূপ, পুষ্করিণী খনন, রাজপথ নির্ম্মাণ প্রভৃতি নানারূপ লোক-হিতকর কার্য্যগুলিই বিশেষভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে; কিন্তু একবারও কোনও দেবদেবীর নাম লওয়া বা পূজা মানত করিবার কথা বলা হয় নাই। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্রের মতে এই সব বচন মাণিক চাঁদের গান হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। ভাব ও ভাষা দৃষ্টে ডাকের বচনকে দীনেশ বাবু ৮০০ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।

ডাক ও খনার বচন সম্বন্ধে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"এই সব বচন পড়িতে পড়িতে আমাদের আর একটী কথা মনে হয়। এখন আমাদের ভিক্ষা করিতে হইলেও বিলাত হইতে ঝুলি কিনিয়া আনিতে

হইবে। কিন্তু যখন ঐ সব বচন রচিত হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালী ভালরূপ গৃহস্থালী জানিত ও পরমুখাপেক্ষী ছিল না। কৃষক সারাজীবন পরিশ্রম করিয়া, রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করিয়া যে সত্যের আভাস পাইয়াছিল, সেই জ্ঞান এসব বচনে প্রচুর আছে। * * * * আমরা শুধু জুলিয়েটের বিরহ ও ওথেলোর সন্দেহ বিষয়ে প্রাজ্ঞ হইতেছি ও পোপোকেটিপেটল কোথায় তাহা মানচিত্রে দেখাইতে শিখিয়াছি, কিন্তু আমরা এতদূর স্বাবলম্বন শূন্য হইয়া পড়িয়াছি যে, ভূমি এবং তদুৎপন্ন শস্যাদি সংক্রান্ত অতি সাধারণ কথাগুলি শিক্ষা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি এবং গৃহস্থালীর বুদ্ধিটুকু একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এই দুর্দ্দিনে তাই এইসব বচনগুলি বড় প্রিয় বোধ হয়।"

এগুলিতে আর একটী জিনিস বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। ইহাতে দেখা যায়, এই সময়ে বাঙ্গালী দৈবশক্তিতে সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল হইয়া সকল বিষয়ে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। লোকে হাঁচি টিকটিকিতে ও কাকের রবে সর্ব্বদা প্রমাদ গণিত।

হিন্দু বৌদ্ধ যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

এই যুগের সাহিত্যে সংস্কৃতের প্রভাব আদৌ নাই। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, তখনও রামায়ণ মহাভারতাদির অনুশীলন এদেশে আরম্ভ হয় নাই। পরবর্ত্তী সাহিত্য সংস্কৃতের সম্পদে সুসমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা বিশেষভাবে চলিয়াছিল। কিন্তু এযুগের লেখকদিগের সেদিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ নাই। এসম্বন্ধে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র লিখিতেছেন,—"চিরপরিচিত বঙ্গকুটীর, মেয়েলীছড়া, প্রাচীন প্রবাদ-বাক্য এই সমস্ত গাথার প্রাণ-স্বরূপ এবং ইহাতে বঙ্গীয় কাব্যশ্রী সামান্য বসন-পরিহিতা বঙ্গীয় পুরস্ত্রীর মতই অনাড়ম্বর ভাবে আমাদিগকে দর্শন দিতেছেন।"

এই সময়কার রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার

(Manners and Customs of the age)

সাহিত্য মানবজীবন ও সমাজের ছবি। কবি যথার্থই বলিয়াছেন, "কবিরা কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক।" এই যুগের সাহিত্য হইতে ঐ সময়কার রীতি-নীতি প্রভৃতির বিষয়ে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। বিশ্বেশ্বরবাবু ও নলিনীবাবুর সংগৃহীত ময়নামতীর গানে দেখা যায় যে, ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দ্রের মহিষীগণ নিজেরা হাট বাজারে যাইতে অভ্যস্ত ছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে, ঐ সময়ে স্ত্রী-স্বাধীনতা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল এবং ইহা মুসলমান অধিকার ও পর্দ্দা-প্রথা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ই জ্ঞাপন করিতেছে। এই সময়ে জনসাধারণের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল। ন্যায়নিষ্ঠ রাজার রাজত্ব-সময়ে সাধারণ লোকের ছেলেরাও সোনার ভাঁটা লইয়া খেলা করিত। ধনাঢ্যগণ বাড়ীর উঠানে মণিমুক্তাদি রৌদ্রে শুকাইতে দিত।

এই সময়ে অভিচার অনুষ্ঠান দ্বারা শত্রুকে দমন করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। অগ্নি-পরীক্ষা প্রভৃতির দ্বারা অপরাধীদিগের দোষ-নির্ণয় করা হইত।

ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বদা উপবীত গলায় রাখা সম্বন্ধে বিশেষ বাঁধাবাঁধি ছিল না। অনেক সময়ে উহা খুলিয়া রাখা হইত।

মৃদঙ্গ বা খোলের প্রচলন

অনেকের ধারণা যে খোল বা মৃদঙ্গ চৈতন্য-যুগে বৈষ্ণব-কীর্ত্তনীয়াগণ প্রচলন করিয়াছিলেন। কিন্তু বহু প্রাচীনকাল হইতে মৃদঙ্গের প্রচলন দেখা যায়। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে মৃদঙ্গের উল্লেখ আছে। "গোরক্ষবিজয়ে" দেখা যায়, সাধু গোরক্ষনাথ মৃদঙ্গে খুব সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে"ও খোলের উল্লেখ আছে।

বাঙ্গালীর সমুদ্র-যাত্রা ও নৌ-বাণিজ্য

স্বদেশ-প্রেমিক কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষ গর্ব্বের সহিত গাহিয়াছেন :—“সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ” ও “একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত-সাগরময়” ইহার অনেক গুলিই যে এই যুগের কীর্ত্তি তাহা কথা-সাহিত্যের আলোচনা ও বঙ্গেবৌদ্ধ মতের অভ্যুদয়ের বিবরণ প্রদান-কালে আমরা উল্লেখ করিয়াছি।

বঙ্গসাহিত্যের গৌড়ীয় যুগ

বঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের নবজাগরণ ও বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি

বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মকে পরাভূত ও উদরস্থ করিয়া হিন্দু-ধর্ম্ম পুনরায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। বৌদ্ধ-প্রাধান্যের অবসান ও হিন্দু মতের অভ্যুদয়ের সময়ে সর্ব্বপ্রথমে শৈব-ধর্ম্মই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শৈব-মতাবলম্বী বঙ্গীয় সেন-রাজগণই বৌদ্ধ পালরাজগণকে পরাভূত করিয়া বঙ্গে তাঁহাদের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। সেন-রাজদিগের আমলেই বঙ্গে হিন্দু:ধর্ম্মের এই বিরাট্ অভ্যুদয় সংঘটিত হয়। কিন্তু ইহা ইউরোপীয় ইতিহাস-বর্ণিত ধর্ম্ম-মতের প্রতিষ্ঠার ন্যায় অসির ঝন ঝনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া ও নরশোণিতের স্রোত বহাইয়া সাধিত হয় নাই। আমাদের শিক্ষা ও কর্ষণা (Culture) ইউরোপীয় শিক্ষা ও কর্ষণা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, আমাদের ইতিহাসের ধারাও তাই ভিন্নরূপ। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র যথার্থই লিখিয়াছেন, “ইউরোপে ইতিহাস লিখিতে হইলে, স্বাধীনতার জন্য বড় বড় রকমের যুদ্ধ-বিগ্রহ লেখনীর মূল লক্ষ্য হয়। বক্তৃতামালা উত্তেজিত জনসাধারণের চেষ্টায় শাসনের কঠিন বেলাভূমি ভঙ্গকরা, কিংবা নবদেশ আবিষ্কার-চিন্তায় প্রশান্তসাগরের

শান্তি ভাঙ্গিয়া বর্ব্বরের পত্রাচ্ছন্ন কুটীরে লগুড়াঘাত পূর্ব্বক তাহাকে গুলির শব্দে চমৎকৃত করিয়া টিকি ধরিয়া টানা হেঁচড়া করা প্রভৃতি বিষয় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য হয়। কতকগুলি যষ্ঠি মুষ্টির শব্দ ও গুলি বারুদের ঘনীভূত ধূম্র পটলে গ্রন্থ পত্র যেন বিড়ম্বিত হইয়া পড়ে। ধর্ম্মের ইতিহাস ও রাজনৈতিক ইতিহাসের যেন এক নব সংস্করণ। উহাতেও অকথ্য অত্যাচার ও নরশোণিত লিপ্সার অভিনয়ই দৃষ্ট হয়।" আমাদের আলোচ্য এই হিন্দু অভ্যুদয় উপলক্ষে রক্তস্রোতের পরিবর্ত্তে সাহিত্য-স্রোতের প্রবাহই ছুটিয়াছিল। শিব এবং লৌকিক দেবতা চণ্ডী, শীতলা, মনসা প্রভৃতির ভক্তগণ নিজ নিজ উপাস্য দেবতার মাহাত্ম্য-কথা লিখিয়া, বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি ও নব অভ্যুত্থিত হিন্দু মতের প্রচার করিতেছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, হিন্দু ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে প্রথমে শৈবধর্ম্মই প্রাধান্য লাভ করে। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই এই শৈব মতের দ্বারাই বৌদ্ধমত কবলিত হইয়াছে। সমালোচক শশাঙ্কমোহনের মতে ইহার কারণ এই যে, "শৈবধর্ম্ম নানাদিকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আত্মীয় ও সহোদর বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সমধর্ম্মা বলিয়াই শৈব আদর্শ সহজে বৌদ্ধশ্রমণকে পরাজিত ও কবলিত করিতে পারিয়াছিল। বৈরাগ্যগুরু বুদ্ধ-চরিত্রের পীঠ-স্থলে পরম-সন্ন্যাসী শিব-চরিত্রের প্রতিষ্ঠা করা কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য হয় নাই; মহাশূন্য এবং নিরঞ্জন ধর্ম্মমূর্ত্তির স্থলে লিঙ্গোপাধিক এবং নির্গুণ শিবসংজ্ঞা অনায়াসে জুড়িয়া বসিয়াছে। শ্রমণগণের হরিদ্রাবসন সামান্য প্রলেপেই গৈরিকবর্ণ গ্রহণ করিয়াছে।"

এই নবজাগরণের প্রেরণা শুধু লৌকিক দেব দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াই পরিসমাপ্ত হয় নাই। এই সময়ে দেশময় প্রাচীন শাস্ত্র চর্চ্চা আরম্ভ হইল। এই শাস্ত্র জনসাধারণের উদ্দেশ্যেই লিখিত; কাজেই উহা বঙ্গ-ভাষাতেই লিখিত হইতে লাগিল। ভাষাক্ষেত্রে সংস্কৃতের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা গেল।

গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা

মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তর ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরের পশ্চিমস্থিত বিস্তৃত ভূ-ভাগ পঞ্চগৌড় নামে অভিহিত হইত। গৌড়ের পঞ্চবিভাগের নাম সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল। এই বিভিন্ন বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন রাজার অধীন ছিল। কিন্তু অনেক সময়ে প্রবল প্রতাপশালী রাজগণ এই পঞ্চবিভাগের ভিন্ন ভিন্ন রাজগণকে নিজ প্রভুত্ব স্বীকারে বাধ্য করিয়া "পঞ্চগৌড়েশ্বর" উপাধি গ্রহণ করিতেন। এই গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহই বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

সমালোচক শশাঙ্কমোহন সত্যই বলিয়াছেন, "সমাজের তথাকথিত উপরিস্থগণের বিদ্বেষ-বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হওয়া যেন বঙ্গভাষার চিরজীবনের কোষ্ঠীপত্রেই লিখিত আছে।" আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক উপেক্ষিত ও অনাদৃত গৌড় প্রাকৃতকে বৌদ্ধ মিশনারীগণ সর্ব্বপ্রথমে লিখিত ভাষায় পরিণত করিয়া, বঙ্গসাহিত্যের বনিয়াদ স্থাপন করেন। তারপর মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বঙ্গভাষা তদানীন্তন সুধী-সমাজে এবং রাজসভায় তাদৃশ সমাদর-লাভে সমর্থ হয় নাই। সংস্কৃতজ্ঞগণ,

> "অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
> ভাষায়াং মানবো শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥"

ইত্যাদি শ্লোক রচনা করায় বালিকা বঙ্গভাষার প্রতি পণ্ডিত রসিকগণের তাদৃশ আসক্তি ছিল না। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে মুসলমান-বিজয় বিশেষ একটী ফলিতার্থময় ঘটনা। ইহার ফলেই পল্লী-কুটির-বাসিনী দীনবেশা বঙ্গভাষা প্রথমে রাজসভায় বাহির হইল। বর্ত্তমান যুগেও আমরা দেখিতে পাই যে, বৈষ্ণব কবিগণের অবদান-সম্ভারে ও রবীন্দ্র-সাধনার অভিনব সম্পদে বঙ্গভাষা আজ 'ভুবন-মনোমোহিনী' হইয়াও তথাকথিত

শিক্ষাভিমানিগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত হইয়াই আসিতেছে। মুসলমান-বিজয় বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যে সহায়তা করিয়াছে, বর্ত্তমানে আমরা তৎসম্বন্ধে একটু বিশদভাবে আলোচনা করিব।

বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান-বিজয়ের ফল

মুসলমান-বিজয় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটী নবযুগের সূচনা করিয়াছিল। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে, "মুসলমানগণ, ইরান, তুরান প্রভৃতি যেস্থান হইতেই আসুন না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দু-প্রজা-মণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। * * * রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব্ব প্রভাব মুসলমান সম্রাট্‌গণ লক্ষ্য করিলেন। এদিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাস-নিবন্ধন বাঙ্গালা তাঁহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল।" এই গৌড়ীয় মুসলমান সম্রাট্‌গণের অনুপ্রেরণার ফলেই প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ হইল। ইঁহাদের মধ্যে গৌড়েশ্বর নাসির খাঁ, গৌড়েশ্বর গয়াসউদ্দিন, হুসেন সাহ এবং তাঁহার প্রধান সেনাপতি পরাগল খাঁ প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নসির খাঁর উৎসাহে মহাভারতের একখানি অনুবাদ সঙ্কলিত হয়। এই পুঁথিখানি এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে পরাগলী মহাভারতে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। বিদ্যাপতির ভণিতায় নসির খাঁ ও গয়াসউদ্দিনের যথেষ্ট প্রশংসা আছে। সম্রাট্ হুসেন সাহের প্রশংসা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে যথেষ্ট মিলে। বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান লেখকগণের দান সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

সমালোচক শশাঙ্কমোহন বলেন যে, "বঙ্গদেশে মুসলমানের অধিকার ও মুসলমান-প্রভাবের ফলে সমুন্নত পারস্য-সাহিত্যের ভাবপ্রভাব নানামুখে বঙ্গসাহিত্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ভারতবর্ষের নানক, কবীর প্রভৃতির মধ্যে মুসলমান-প্রভাব সুস্পষ্ট; শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যেও কোরানের উপাসনা

প্রণালীর নিরাবিল সরলতা, সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃভাব এবং অভেদবাদ যে বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।" পারসিক স্থফী-ভাবের কিছু কিছু প্রভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মে আছে ; কিন্তু চৈতন্যদেব-প্রচারিত অভেদবাদ ও সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি উদার বৌদ্ধনীতির দান বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এই স্থফী-ভাবধারা আমাদের বৈষ্ণব-ভাবধারারই সহোদর। জগতের ইতিহাসে কেবলমাত্র দুইটী জাতি ভগবান্‌কে প্রাণেশ্বর বা প্রাণনাথরূপে ধারণা করিয়া, প্রেম সহকারে ভজনা করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটী পারসিক স্থফী-সম্প্রদায় ; অপরটী গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। এই স্থফী কবিগণের মধ্যে হাফেজ, জামী প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ যুগের বাঙ্গালী কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের "সদ্ভাব-শতক" পুস্তকে যথেষ্ট স্থফী-প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

গৌড়ীয় যুগের সাহিত্যকে আমরা বিভিন্ন ৪টী শাখায় বিভক্ত করিতে পারি (১) অনুবাদ-শাখা, (২) লৌকিক ধর্ম্মশাখা, (৩) চৈতন্য-পূর্ব্ব পদাবলী-শাখা, (৪) কাব্যেতিহাসের সূত্রপাত-শাখা।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন,—"পুচ্ছগ্রাহিতা বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের সূত্র।" প্রাচীন কবিগণের মধ্যে স্বাধীন পথে লেখনী পরিচালনা করিবার স্পৃহা খুব কমই পরিদৃষ্ট হয়। বহু কবি মিলিয়া একই বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন। চণ্ডীকাব্য, মনসা-মঙ্গল প্রভৃতির যশো-মাল্য এক একজন প্রতিভাবান্ কবির প্রাপ্য হইলেও বহু কবি মিলিয়া ইহাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছেন।

এ যুগের সাহিত্যের আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, এ যুগের কবি-প্রতিভা কতকগুলি ধর্ম্মমূলক প্রসঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ যুগের সাহিত্য পূরাপূরি ভাবে classic আদর্শেরই অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যের এই ক্লাসিক আদর্শের অবরুদ্ধ নির্ঝরে সর্ব্বপ্রথমে রোমান্টিক ভাবধারার বন্যা আনিল, বৈষ্ণব কবিগণের অমৃতবর্ষী গীতি-কবিতা। পদাবলী-শাখার আলোচনা কালে আমরা ইহা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিব।

অনুবাদ-শাখা

কৃত্তিবাস

"কৃত্তিবাস কীর্ত্তিবাস কবি
এ বঙ্গের অলঙ্কার।"

বঙ্গের অমর কবি কৃত্তিবাস নদীয়া শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ফুলিয়া নামক স্থানে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণদিগের ফুলিয়া মেলের জন্য এই গ্রাম সবিশেষ বিখ্যাত। নিম্নে আমরা কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণী হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব। এই আত্ম-বিবরণীটী প্রথমে স্বর্গীয় হারাধন ভক্তিনিধি মহাশয় একখানি প্রাচীন পুঁথি হইতে নকল করিয়া দীনেশ বাবুকে পাঠাইয়াছিলেন; পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক সংগৃহীত একখানি প্রাচীন পুঁথিতেও উহা পাওয়া যাইতেছে। কবি তাঁহার আত্ম-বিবরণীতে বলিতেছেন,—"পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা। তাহার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা॥ বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির। বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥ সুখ ভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে। বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে॥ * * * গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি। দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥ ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাহার বসতি। ধন ধান্যে পুত্রে পৌত্রে বাড়য়ে সন্ততি॥ * * * মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী। ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী॥ আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস। তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥ * * * এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ। হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তরদেশ॥"

উপর্য্যুক্ত আত্ম-বিবরণীর "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।" ছত্রটী অবলম্বন করিয়া, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় ১৪৩২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মাঘ কৃত্তিবাসের জন্ম-তারিখ নির্ণয় করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন রায় মহাশয়, "এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ। হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তরদেশ॥" ছত্র দুইটী হইতে জ্যোতিষ-গণনার দ্বারা ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার কৃত্তিবাসের বিদ্যারম্ভের দিন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ঘোরতর সন্দেহ পোষণ করেন। তাঁহার মতে ঐ পাঠটী "পূর্ণ মাঘ মাস" না হইয়া "পুণ্য মাঘ মাস" হওয়াই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তিনি বলেন, "পূর্ণ মাঘ মাস" বলিতে যে মাঘ-সংক্রান্তি বুঝায়, তাহা কোথাও দেখা যায় না।

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষিক প্রমাণের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িলে, কৃত্তিবাসের জন্ম-সময় নিরূপণ জন্য আমাদিগকে অপর প্রমাণের অনুসন্ধান করিতে হইবে। কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণীতে বঙ্গদেশব্যাপী যে ঘোর প্রমাদের বর্ণনা আছে, অধ্যাপক দীনেশচন্দ্রের মতে তাহা পূর্ব্ববঙ্গের সোনার গাঁয়ে হিন্দু রাজত্বের ধ্বংস ও মুসলমান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত করিতেছে। সামসুদ্দিন ফিরোজ সা হিন্দু-স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া, ১৩০২ হইতে ১৩২২ অব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করেন। এই সময় গাজী জাফর খাঁ—যিনি হিন্দু-ধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া সংস্কৃতে গঙ্গাস্তোত্র লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন—২৪পরগণা অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন। সুতরাং এই সময়ে নরসিংহ ওঝা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ফুলিয়ায় আসিয়া অনেকটা নিরাপদ হইয়াছিলেন। দীনেশ বাবুর মতে নরসিংহ ওঝা ১৩১০ অব্দে বঙ্গদেশে আগমন করেন। বাচস্পতি মিশ্রের কারিকা হইতে জানা যায়, কৃত্তিবাসের ঊর্দ্ধতন নবম পুরুষ উৎসাহ বল্লালের রাজসভায় পূজিত হইয়াছিলেন।

বল্লাল সেন ১১৬৭ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। অতএব ১২শ শতকের প্রথম পাদে উৎসাহের জন্মকাল ধরিয়া, তিনপুরুষে ১০০শত

বৎসর পরিকল্পনা করিলে, আমরা ১৪শ শতকের শেষভাগে কৃত্তিবাসের জন্ম-সময় পাইতে পারি। ১৪৮৬ অব্দে চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হন। তাহার বহু পূর্ব্বেই অদ্বৈত মহাপ্রভু ও শ্রীবাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সময়ে কৃত্তিবাস জীবিত থাকিলে, তাঁহার উল্লেখ নিশ্চয়ই বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাওয়া যাইত। কিন্তু কেবলমাত্র কবি জয়ানন্দ তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে কবি-বন্দনার মধ্যে কৃত্তিবাসের নামটী উল্লেখ করিয়াছেন; তদ্ভিন্ন সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্যে আর কোথাও কৃত্তিবাসের উল্লেখ নাই। মহাপ্রভু ফুলিয়াতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসম্পর্কীয় কোনও বিবরণে কৃত্তিবাসের নাম মিলে না। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, চৈতন্য মহাপ্রভুর বহু পূর্ব্বেই কৃত্তিবাস স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের উৎসাহে রামায়ণ অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার আত্ম-বিবরণীতে যে রাজসভার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা হিন্দু রাজ-সভারই বর্ণনা। রাজা কৃত্তিবাসের সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়া অর্থ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কবিকে চন্দনের ছড়া দ্বারা অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। মুসলমান-বিজয়ের পরে একমাত্র হিন্দু রাজা রাজাগণেশই গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই সময়ের মধ্যেই কৃত্তিবাস রাজ-দরবারে উপনীত হইয়াছিলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে পরবর্ত্তী লেখক ও লিপিকরগণের সংযোজনা

মহাকবি মধুসূদনের জীবন চরিত প্রণেতা, স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন,—"প্রচলিত রামায়ণে কৃত্তিবাসের রচনা যে কতটুকু তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই, নিঃসন্দিগ্ধরূপে কখনও হইবে কিনা সন্দেহস্থল। বঙ্গভাষার অপর কোনও গ্রন্থেরই পাঠ সম্বন্ধে এত পরিবর্ত্তন ঘটে

নাই; কিন্তু ভগীরথ সমানীত স্রোতের পূর্ব্ব বারি এক্ষণে কণামাত্র না থাকিলেও ভাগীরথী যেমন পূজিত, কৃত্তিবাস প্রণীত রামায়ণের পংক্তি মাত্র অধুনা পূর্ব্ববৎ না থাকিলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণও সেইরূপ সমাদৃত হইয়া রহিয়াছে।" অমর কবি কৃত্তিবাস শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের স্থানে স্থানে বাল্মীকির অবিকল অনুবাদও পরিদৃষ্ট হয়। তথাপি তিনি রামায়ণ অনুবাদ করিতে গিয়া, বাল্মীকি হইতে কেন এত পৃথক্ হইয়া পড়িলেন, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। বাল্মীকি হইতে অবিকল অনুবাদের একটী দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নোক্ত অংশটী আমরা উদ্ধৃত করিতে পারি।

"ইয়ং শয্যা মম ভ্রাতু রিদমাবর্ত্তিতং শুভম্।
স্থণ্ডিলে কঠিনে সর্ব্বং গাত্রৈ র্বিমৃদিতং তৃণম্॥
মন্যে সাভরণা সুপ্তা সীতস্মিচ্ছয়নে শুভা।
তত্র তত্রহি দৃশ্যন্তে সক্তাঃ কনকবিন্দবঃ॥
উত্তরীয়মিহাসক্তং সুরক্তং সীতয়া তদা।
তথা হ্যেতে প্রকাশন্তে সক্তাঃ কৌষেয় তন্তবঃ॥"

এখানে কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে ঃ—

"তৃণশয্যা দেখিলেন এক বৃক্ষতলে।
তদুপরে শুইলেন রাম বনবাসী।
তৃণলগ্ন আছে পট্ট কাপড়ের দশী॥
কাপড়ের দশীতে স্খলিত আভরণ!
ঝিকি মিকি করে যেন সূর্য্যের কিরণ॥

* * *

কেমনে লক্ষ্মণ ছিলা কেমনে জানকী।
চিনিলাম আভরণ করে ঝিকি মিকি॥"

এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক মিলে। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্রের মতে

কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডটী সম্ভবতঃ কৃত্তিবাসের লেখনীপ্রসূত নহে। উহা কৃত্তিবাস ও কবিচন্দ্রের রচনার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। দীনেশ বাবু অতি প্রাচীন পুঁথিতে "অঙ্গদ রায়বার" ও "তরণীসেন-বধ" কবিচন্দ্রের ভণিতায় দেখিতে পাইয়াছেন। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় বিগত ১৩০১ সালের সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকায়—"কৃত্তিবাস" শীর্ষক প্রবন্ধে কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষেপ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"একশত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। মুদ্রাযন্ত্রের পূর্ব্বকালে পাঠক কবির কাব্য লেখক দ্বারা লিখাইয়া পাঠ করিতেন। যত পাঠক, প্রায় ততই পুঁথি, অন্ততঃ প্রতি কাব্যামোদীর গৃহে এক একখানা পুঁথি, * * * নকল, নকলের নকল, তাহার নকলে আসল গ্রন্থের অপপাঠ অবশ্যম্ভাবী। পুঁথি লেখক মহাশয়েরা যদি কদর্য্য ভাবে নকল করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, তবে অনেকটা রক্ষা হইত। কিন্তু মসীপাত্রে লেখনী ডুবাইলে কবি-ভাব আসিয়া পড়ে। কোথাও মূল গ্রন্থের অর্থ না বুঝিয়া—একবাক্য বাক্যাংশ বা পদের পরিবর্ত্তে অন্য বাক্য, বাক্যাংশ বা পদ লিখিয়া গ্রন্থের অশুদ্ধি সংশোধন করেন। কোথায়ও বা কবি-ভাবের উৎকটতার বশবর্ত্তী হইয়া, রচিয়া দুই ছত্র বসাইয়া দেন। * * * কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাঠান্তর ও প্রক্ষিপ্ত অংশের সমাবেশের আর এক সুবিধা ছিল। অনেকেই জানেন, এদেশে রামায়ণ গানের প্রথা কিছুদিন পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল। গায়নের রামায়ণ অনেক স্থলে পুঁথিতে লিখিত থাকিত না, স্মৃতিতে অঙ্কিত থাকিত। এইরূপে পাঠান্তর ও প্রক্ষিপ্তাংশ সমাবেশের সুবিধা হয়। * * * অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এই কলিকাতা মহানগরীতে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নামে এক মহাত্মার আবির্ভাব হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কিছু কবিত্ব শক্তিও ছিল। এই শক্তিই কৃত্তিবাসের কীর্ত্তিহরণের সহায় হইয়াছে। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ধারণা হইয়াছিল—কৃত্তিবাসের রচনা বড় গ্রাম্য-শব্দে দুষ্ট, বড়ই অশুদ্ধ, ভাবের অনেক স্থানে অসংলগ্নতা

রহিয়াছে। এই ধারণার বশে আর বটতলা-নিবাসিনী দুষ্টা সরস্বতীর প্ররোচনায় জয়গোপাল সংস্কৃত অভিধানের সাহায্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অপ্রচলিত ও প্রচলিত গ্রাম্য শব্দের সংস্কার করেন। সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তিবাসী পয়ারের অক্ষরের ন্যূনাধিক্য, অযথা মাত্রা এবং অন্ত্যস্বরের অমিল সংশোধিত হয়। এই সংস্কার ও সংশোধনের ফলে কোথাও দুই পংক্তি, কোথাও দশ পংক্তি, কোথাও পৃষ্ঠাকে পৃষ্ঠা, কোথাও দুই দশ পৃষ্ঠা এবং কোন কোন স্থানে পুস্তকের বিষয়কে বিষয় পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। সংস্কৃতের প্রলেপময় আধুনিকতার আবরণাচ্ছন্ন রামায়ণের এইরূপ প্রচার হইতে থাকে। বটতলার কৃপায় এখন এই রামায়ণই কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া পরিচিত হইতেছে।”

কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড প্রভৃতি প্রক্ষিপ্ত এবং মূল-সংস্কৃত রামায়ণ হইতে অনেকাংশে পৃথক্ হইলেও একদিক দিয়া এই সংযোজনাগুলি সার্থক হইয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আমরা তরণীসেনের যুদ্ধ যাত্রার আয়োজনে দেখিতে পাইব যে, তিনি রথের চারিপার্শ্বে ও সর্ব্বগাত্রে রাম নাম লিখিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতেছেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া রামের শরীরে বিশ্বরূপ দর্শন করিতেছেন। রামচন্দ্রও ভক্তের নয়নাশ্রু দেখিয়া কাঁদিয়া বিভোর হইয়া বলিতেছেন,—“আশীর্ব্বাদ করি যেন বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।” এখানে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্রের ভাষায় বলা যায়,—“এইসব পড়িয়া রাম ও রাবণের যুদ্ধক্ষেত্রকে গৈরিক রেণু-রঞ্জিত সংকীর্ত্তন ভূমি বলিয়া ভুল হয় এবং তথাকার দামামা রোল খোলবাদ্যের মৃদুতা গ্রহণ করে।” যাহা হউক রামায়ণ এই-রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া, বাঙ্গালার আবহাওয়া এবং বাঙ্গালী জীবনের বৈশিষ্ট্য ও ভাবধারার সম্পূর্ণ উপযোগীই হইয়াছে। বাঙ্গালী প্রকৃত প্রস্তাবে রামায়ণের অনুবাদ করে নাই, নূতন রামায়ণের সৃষ্টি করিয়াছে। “বৈষ্ণবী-নীতি বঙ্গের সমাজের অভ্যন্তরে কার্য্যকরী হইয়াছিল, এই বৈষ্ণবী-নীতি দ্বারায় রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ সম্পূর্ণরূপে

শাসিত।" আর একটী কথা এই যে, এইরূপে অস্ত্রময় রণক্ষেত্রকে প্রেমাশ্রুময় করিয়া তুলিতে এবং সেনানিবাসকে সংকীর্ত্তন ভূমিতে পরিণত করিতে বিশেষরূপ প্রতিভারই প্রয়োজন হইয়াছিল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাব

বাঙ্গালা রামায়ণে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাব সম্বন্ধে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ—"শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি সাধনে নানারূপে সাহায্য করিয়াছে। বৈষ্ণবগণ রাক্ষসদিগের দ্বারা শ্রীরামের স্তবগান করাইয়াছেন, খেদ মিটাইতে শাক্তগণ শ্রীরামকে দিয়া চণ্ডীপূজা করাইয়াছেন ; এই দুই দলের চেষ্টায় মূল অনুবাদ বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। ইহাকে ঠিক বিকৃতি বলা যায় না। বীরবাহুর সম্বন্ধে,—

"ধরণী লুটায়ে রহে জুড়ি দুই কর।
অকিঞ্চনে দয়া কর রাম রঘুবর॥"

এইরূপ উক্তি পড়িয়া ভূপতিত কৌপীনসার শিখাযুক্ত বৈষ্ণবের কথাই মনে পড়ে ; নতুবা রাক্ষসের পক্ষে এরূপ দৈন্য কল্পনা করিবার কোন সুযোগ কবিগুরু বাল্মীকি দেন নাই। শুধু রামলক্ষ্মণের প্রতি এই ভক্তি নহে, বীর-বাহু,—"প্রণমিল ভক্তিভাবে যত কপিগণে। এই কপিগণ যে চৈতন্য প্রভুর পারিষদবর্গের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে গুণচূড়া, ললিতাও রূপমঞ্জরী প্রভৃতির অবতার বলিয়া অঙ্গীকৃত হন নাই, ইহাই যথেষ্ট। তৎপর রামের নিকট

"জন্মিয়া ভারতভূমে আমি দুরাচার।
করেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি তার॥
অপরাধ মার্জ্জনা করহ দয়াময়।
কুড়ি হস্ত যুড়ি রাবণ একদৃষ্টে রয়॥"

রাবণের এই মিনতি পড়িলে, অনুতপ্ত জগাই মাধাই এবং নরোত্তমী চৈতন্য প্রভুর নিকট যে স্তুতি পাঠ করিয়াছিল, তাহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। লেখক

সেই অত্যন্ত বৈষ্ণবোচিত বিনয় রাবণের মুখে প্রচার করিতে যাইয়া এতদুর আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন যে, রাবণের লঙ্কা ভুলিয়া তাঁহাকে ভারতভূমে জন্মগ্রহণ করাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন।" তরণীসেনের যুদ্ধ উপাখ্যানে বৈষ্ণব-প্রভাবের আধিক্য সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করিয়াছি।

বাল্মীকি রামায়ণ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ

বাল্মীকি-রামায়ণে রামচন্দ্র দেবতা বা সাক্ষাৎ বিষ্ণু অবতার নহেন। তাঁহার অতুল বীর্য্যবত্তা ও অপার্থিব চরিত্র-মাহাত্ম্যে তাঁহাকে অতিমানব বা দেবতা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণের রামচন্দ্র স্বয়ং বিষ্ণু অবতার। বাল্মীকি রামায়ণ রামচন্দ্রের অপরিসীম বিক্রম ও ক্ষাত্রতেজের প্রভায় সমুদ্ভাসিত ; কৃত্তিবাসী রামায়ণে এ সকলের পরিবর্ত্তে রামের মাধুর্য্য ও কোমলতার চিত্রই সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছে।

বাঙ্গালা তাহার জাতীয় রামায়ণে রামচন্দ্রকে চৈতন্য মহাপ্রভুর ছায়াতে চিত্রিত করিয়াছে। বাল্মীকি-রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড প্রতিনিয়ত অসির ঝন ঝনিতে ও ধনুকের টঙ্কারে মুখরিত এবং বারুদের ধূম্রপটলে রণক্ষেত্র সতত ধূমায়মান। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই ভীষণ সমরাঙ্গণ ভক্তের প্রেমাশ্রুতে অশ্রুময় সংকীর্ত্তন ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাম ও লক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র, কৌশল্যার বাৎসল্য, সীতার বাঙ্গালিনী-সুলভ লজ্জাবনত মাধুরীই বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে ; এতদ্ব্যতীত ভস্মলোচন ও মহীরাবণের আখ্যায়িকা সংস্কৃত রামায়ণে নাই। মহীরাবণের নরবলি দ্বারা দেবীপূজা প্রভৃতি তদানীন্তন বঙ্গীয় সমাজে তান্ত্রিক প্রাধান্য সূচিত করিতেছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন,—"রাম না জন্মিতে ষাটি হাজার বৎসর। অনাগত পুরাণ রচিল কবিবর॥" এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন,—"বোধ হয় এইরূপ লেখা হইতেই 'রাম না হইতেই রামায়ণ' এই কথার উৎপত্তি হইয়া

থাকিবে।” বাল্মীকি রামায়ণে কোথাও এরূপ উল্লেখ নাই। রামের রাজ্য প্রাপ্তির পরই যে রামায়ণ রচিত হয়, তাহা স্বর্গীয় ন্যায়রত্ন মহাশয় আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। পরন্তু হনুমান্ কর্ত্তৃক গন্ধমাদন পর্ব্বত আনয়ন-সময়ে সূর্য্য আনয়ন, হনুমান কর্ত্তৃক মন্দোদরীর নিকট হইতে রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন এবং মৃত্যু-শয্যাশায়ী রাবণের নিকট রামের রাজনীতি শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় মূল রামায়ণ-বর্হিভূত।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় আখ্যায়িকার সহিত বাঙ্গালা রামায়ণের সাদৃশ্য

“**Celtic myth and legend**” নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে, গ্যালিক দেবতা **Balar** বাঙ্গালা রামায়ণ-বর্ণিত ভস্মলোচনের ন্যায় যাহার দিকে চাহিতেন, সেই ভস্ম হইয়া যাইত। তাই তিনি সর্ব্বদা চোখে চশমা পরিয়া থাকিতেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সেই চশমা খুলিয়া বিপক্ষগণকে ভস্মীভূত করিতেন। গ্যালিক উপাখ্যানে বর্ণিত **King Ludd**এর রাজ্যে একটী চোর ছিল, সে মহীরাবণের ন্যায় মন্ত্রবলে সকলকে নিদ্রাভিভূত করিতে পারিত। ইউরোপ এবং ভারতবর্ষের মধ্যে কোন্ সময়ে এই সকল আখ্যায়িকার আদান-প্রদান চলিয়াছিল, তাহা অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র “**folk literature of Bengal**” নামধেয় তাঁহার মৌলিক গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

রামায়ণের অন্যান্য অনুবাদকগণ

অনন্ত রামায়ণ

কৃত্তিবাসের পর যতগুলি রামায়ণ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনন্ত রামায়ণই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহার ভাষা প্রাচীন, রচনা জটিল, স্থানে স্থানে অনেক দুরূহ শব্দও পাওয়া যায়। শব্দ-বিন্যাস দৃষ্টে অনেকে ইহার রচয়িতাকে

শ্রীহট্ট অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। নিম্নে আমরা ইহার একটু নমুনা দিব,—"কাহার ঝিয়ারী তুহ্মি, কাহার ঘরণী। কিবা নাম তোহ্মার কহিব সুলক্ষণি॥ জনক নন্দিনী মঁঞি নাম মোর সীতা। দসরথ পুত্র ছীরাম বিবাহিতা॥ পিতৃবাক্য পালিবারে বনে আসিলেন্ত। লক্ষ্মণের সহিত মৃগ মারিব গৈছন্ত॥"

অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ

ইঁহার প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ। ইনি ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কবি নিজে লেখাপড়া জানিতেন না। এবংবিধ অবস্থায় সপ্তকাণ্ড রামায়ণ প্রকাশ করায় ইনি অদ্ভুতাচার্য্য নামে অভিহিত হন। এই রামায়ণের বিশেষ একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে সীতাদেবীকে কালীর অবতার রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

কবিচন্দ্রের রামায়ণ

কৃত্তিবাসের প্রায় একশত বর্ষ পরে পশ্চিম বঙ্গের কবি শঙ্কর চক্রবর্ত্তী রামায়ণের রচনা অনুবাদ করেন। ইঁহার পিতার নাম মুনিরাম চক্রবর্ত্তী। ইনি বন-বিষ্ণু পুরাধিপতি গোপাল সিংহের নিকট হইতে "কবিচন্দ্র" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। অধুনা প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে ইঁহার অনেক রচনা কৃত্তিবাসের নামে চলিয়া যাইতেছে।

ইহার পর ফকিররাম কবিভূষণ, ভিষক শুক্লদাস, ভবানী শঙ্কর বন্দ্য প্রভৃতি রামায়ণের অনুবাদ লিখিয়াছেন।

মহাভারতের অনুবাদকগণ

সঞ্জয়ের মহাভারত

এ পর্য্যন্ত যতগুলি মহাভারতের অনুবাদ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে

সঞ্জয়ের মহাভারতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহার ভাষা অনেক স্থলেই গ্রাম্য শব্দে পরিপূর্ণ। প্রাচীনকালের বিভক্তির আকার ইহাতে যথেষ্ট পরিদৃষ্ট হয়।

এই সঞ্জয়ের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক সংগৃহীত পুঁথির "ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম। সঞ্জয়ে ভারতকথা কহিলেক মর্ম্ম॥" এই ছত্র হইতে জানা যায় যে, ইনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় ছিলেন। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র অনুমান করেন যে, ইনি বৈদ্যবংশ সমুদ্ভূত এবং ইঁহার নিবাস ছিল বিক্রমপুরে। অনেকে ইঁহাকে ব্রাহ্মণ-বংশজাত এবং শ্রীহট্টের অধিবাসী বলিয়া মনে করেন।

পরাগলী ভারত অথবা কবীন্দ্র পরমেশ্বরের অনূদিত মহাভারত

সম্রাট্ হুসেন সাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। এই পরাগলী ভারত প্রায় ১৭০০০ শ্লোকে পরিপূর্ণ। কবীন্দ্র গ্রন্থের প্রতি পত্রেই তাঁহার পৃষ্ঠপোষক খাঁ সাহেবের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীকর নন্দীর মহাভারত

পরাগল খাঁর মৃত্যুর পর তৎপুত্র ছুটী খাঁ সম্রাট্ হুসেন সাহের সেনাপতি-পদে নিযুক্ত হন। বিদ্যোৎসাহী পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ইনি শ্রীকর নন্দীকে মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্ব্বের অনুবাদে নিয়োজিত করেন।

জৈমিনি-ভারত

সঞ্জয়, কবীন্দ্র, শ্রীকর নন্দী এবং পরবর্ত্তী অনুবাদ রচয়িতৃগণের প্রায় সকলেই জৈমিনি-সংহিতা অবলম্বনে অনুবাদ করিয়াছেন। ব্যাসের সঙ্গে ইঁহাদের সম্পর্ক অতি সামান্য। মাঝে মাঝে কেবল ব্যাসের দোহাই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

মালাধর বসুর "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়"

মালাধর বসু কুলীন গ্রামে বসু বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ভগীরথ বসু ও মাতার নাম ইন্দুমতী দাসী। ইনি একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন; ইঁহার পৌত্র বসু রামানন্দের নাম বৈষ্ণব-সমাজে সবিশেষ পরিচিত। ইঁহারা আদিশূর-আনীত দশরথ বসু বংশীয়। ইনি গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের সমসাময়িক। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" বিবরণ অনুসারে ইনি গৌড়েশ্বর সামসুদ্দিন ইউসফ সাহের নিকট হইতে "গুণরাজ খাঁ" উপাধি লাভ করেন। আবার দীনেশ বাবুরই **History of Bengali language and literature** গ্রন্থের বিবরণে দেখা যায়, ইনি সম্রাট্ হুসেন সাহের সভাসদ ছিলেন; তাঁহারই নিকট হইতে উক্ত উপাধি প্রাপ্ত এবং তাঁহারই আদেশে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন (**History of Bengali language and literature** গ্রন্থের ২২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

ইঁহার লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্দের বঙ্গানুবাদ "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" নামে অভিহিত। ১৩৯৫ শকে অর্থাৎ ১৪৭৩ অব্দে এই অনুবাদ আরম্ভ ও ১৪৮০ অব্দে সমাপ্ত হয়। এ. সম্বন্ধে স্বয়ং গ্রন্থকারই বিবরণ দিয়াছেন :—

> "তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
> চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।"

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্রের মতে আলোচ্য গ্রন্থের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণের দেহ-ত্যাগ প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহা "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" নামে অভিহিত। প্রাচীনকালে মৃত্যু ও যাত্রা এই দুই অর্থেই "বিজয়" শব্দ ব্যবহৃত হইত। দুর্গাদেবীর ধরাধাম হইতে কৈলাস-যাত্রার দিনের "বিজয়া" নামকরণ হইতেও ইহার নিদর্শন মিলে।

মালাধরের সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য

মালাধর শুধু কথকদিগের মুখে শুনিয়াই এই অনুবাদ লিখেন নাই। তিনি সংস্কৃত ভাষায় ও বেশ সুপণ্ডিত ছিলেন। অবশ্য আক্ষরিক অনুবাদ (literal translation) করিবার রীতি প্রাচীনকালে ছিল না। তবে মূলের সহিত ইহার ভাষাগত সাদৃশ্য যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের বৈশিষ্ট্য

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের রাধা মালাধরের অনেকখানি নিজস্ব। সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবতে রাধিকার প্রসঙ্গ নাই। ভাগবতে রাধিকা না থাকিলেও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে রাধার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তবে এই রাধা গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বা পদাবলী সাহিত্যের রাধা হইতে বিশেষরূপ পৃথক্। মোটের উপর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের রাধিকা বাঙ্গালী মহাজনগণের এক অভিনব সৃষ্টি। এ বিষয়ে আমরা যথাস্থানে বিশদভাবে আলোচনা করিব।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে মাধুর্য্যভাবের যে অনবদ্য চিত্রটী ফুটিয়াছে, সংস্কৃত ভাগবতে তাহা নাই। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ভাবটীই সমধিক পরিস্ফুট। ভাগবতের গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেবতা জ্ঞান করিয়া এবং তাঁহার দেবসুলভ শক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়াই তাঁহাকে পূজা করিয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে সমান ভাবিয়া,—তাহারা যেমন তাঁহার প্রেম-সুধালাভে কৃতার্থ, তিনিও তেমনি তাহাদের প্রীতিলাভে উন্মুখ মনে করিয়া আবেশ বিহ্বলচিত্তে কম্পিত বাহুলতাপাশে বাঁধিয়া, তাঁহাকেও পরিতৃপ্ত করিলাম জ্ঞান করিতে সাহসী হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে আমরা মাধুর্য্য-ভাবের প্রকৃষ্ট বিকাশ দেখিতে পাই। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে,—"দানলীলা ও পারখণ্ডে রাধিকা ও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কৌতুক করিতে ও তাঁহাকে মানভরে গালি দিতে শিখিয়াছে। এখানে

শ্রীকৃষ্ণ পীত-ধড়া-পরিহিত বংশীধারী প্রস্তর-মূর্ত্তি নহেন; তিনি প্রেমিক-শিরোমণি ও চতুর-চূড়ামণি। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে প্রেমদান করিয়া অনুগৃহীত করেন; শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের নায়ক প্রেম দিয়া যেরূপ অনুগৃহীত করেন, প্রেম পাইয়াও সেইরূপ অনুগৃহীত হন।"

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের গোপীগণ নৌকায় যমুনা পার হইতেছেন। এই নৌকার মাঝি হইয়াছেন শঠ-শিরোমণি রসিক কানাই। নৌকাখানি মাঝ যমুনায় আসিয়া দক্ষিণ পবন ভরে টলমল করিতেছে। ইহাতে সন্তরণে অপটু গোপীগণ নিতান্ত নিরুপায় ও প্রাণ-ভয়ে ভীত হইয়া, "কি হৈল, কি হৈল বলি" কাঁদিতে লাগিলেন, আর তাহা দেখিয়া,—"কাঁধে কেরয়াল করি হাসয়ে মুরারি।" তখন গোপাঙ্গনাগণ রসরাজকে নিম্নোক্ত পারিতোষিক গুলির প্রলোভন দেখাইয়া, এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিতে বলিতেছেন,—

"কেহ বলে পরাইমু পীতবসন।
চরণে নূপুর দিমু বলে কোহ্ন জন॥
কেহ বলে বনমালা গাঁথি দিমু গলে।
মণিময় হার দিমু কোহ্ন সখীবলে॥
*　　*　　*　　*
কেহ বলে রসিক সুজন বড় কান।
কর্পূর তাম্বুল সমে জোগাইব পাণ॥"

কিন্তু সুযোগ পাইয়া চতুর নাগর একেবারে বলিয়া বসিলেন,—

"প্রথম মাগিএ আমি যৌবনের দান।"

বৈষ্ণব-কীর্ত্তনীয়াগণের "নৌকা-বিলাস" পালা এই অংশের পরিপূর্ণতা সাধন করিয়াছে। আমাদের তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় আজ বিধি-বিড়ম্বনায় এই অপূর্ব্ব রসে বঞ্চিত হইলেও এখনও পল্লীবাসী কৃষক, ভাবুক ও ভক্তগণ প্রতিদিন সন্ধ্যায় গৃহাঙ্গনে প্রতিবেশীদিগের সহিত একত্রিত হইয়া ইহার অনুপম রসামৃত আস্বাদন করিয়া থাকে। কীর্ত্তনীয়াদিগের নৌকা-

বিলাস পালার সারমর্ম্ম এইরূপ :—যমুনার কূলে শ্যামের বাঁশী বাজিয়াছে। বাঁশীর সুর শ্রীমতীর কানে যাইবা মাত্র তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীমতীর কানু-কলঙ্কিনী নাম শতমুখে রটিয়া গিয়াছে। তাই এখন প্রত্যক্ষ ভাবে কানুর নিকট যাওয়া ত' দূরের কথা, লোকের অনবরত টিটকারীতে রাধার এমনই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, তিনি বলিতেছেন,—

"আমি কালার ভয়মে জলদ না হেরি
না যাই যমুনা-জলে।
তবু পাড়ায় পাড়ায় করে কানাকানি
কানু-কলঙ্কিনী বলে॥"

কিন্তু না যাইয়াও ত' আর থাকা যায় না, ঐ কুলনাশা বা ঘরছাড়া-করা বাঁশী যাহার কানে পৌছিয়াছে, সে কি সাধনার দুর্গম বনে না ছুটিয়া আর ঘরে তিষ্ঠিতে পারে? কিন্তু এদিকেও বাহিরের সমগ্র পাড়াপড়শী—আর ঘরে শ্বাশুড়ী ননদী বাদী। পরিশেষে শ্রীমতী এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। রাই অন্যান্য গোপিনীদিগের সহিত মথুরার বাজারে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, নবনীত প্রভৃতি বিক্রয় করিতে যাইবেন বলিয়া বাজারের বেশাতি লইয়া যমুনার খেয়া-ঘাটের দিকে রওনা হইলেন। ইত্যবসরে,—

"সখাগণ সঙ্গ, ছোড়ি যদুনন্দন, চলতহি নাগররাজ।
ভাবিনী মনোরথে, চলত বিপিন-পথে, সাধিতে মনোরথ কাজ॥
চতুর-শিরোমণি কান।
হেরি যমুনার জল, মনমথ উথলল, পূরল মূরলী নিশান॥
সিরজিল তরীখানি, প্রবাল মুকুতা আনি, মাঝে মাঝে হীরার গাঁথুনি।
শিখিপুচ্ছ গুঞ্জাছড়া, রজত কাঞ্চনে ঘেরা, কেরয়ালে রজত কিঙ্কিনী॥
তপন-তনয়া-নীরে, তরণী লইয়া ফিরে, বিদগধ নাগররাজ।
গোবিন্দ দাস ভণে, কি আনন্দ হৈল মনে, ঝুনু ঝুনু নূপুর বাজ॥"

বিবিধ সাজে এই তরীখানি সুসজ্জিত; কেরয়াল হইতে প্রতিনিয়ত

কিঙ্কিনী বাজিতেছে। কিঙ্কিনী বলিতেছে, কিং কিনি, শ্যাম কিনি না রাই কিনি? মাঝি শ্যাম ভাবিতেছেন, আমি আর কিছু চাইনা আমি রাই কিনিব। তীর হইতে রাধা ভাবিতেছেন, আমি শ্যাম কিনিতে পারিলেই কৃতার্থ হইতাম। কিন্তু অধিকারী বা কীর্ত্তনীয়া বলিতেছে, আমি রাই চাহিনা ; যদি পারি তবে রাইএর মনটি কিনিতে চাই ; কেননা,—"রায়ের মন কিনিলেই শ্যাম কিনিব তাই মন কিনি।" ইহার পর ভীতি-বিহ্বলা গোপাঙ্গনাগণ ও শ্রীরাধিকা কর্ত্তৃক নানারূপ পুরস্কারের প্রলোভন ও রসিক নটবর কর্ত্তৃক শ্রীমতীর রূপ ও যৌবন গ্রহণের প্রস্তাব প্রভৃতিই "নৌকা-বিলাস পালা"র প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু এই রূপ ও যৌবনদান আমাদের আজ কাল কার হাট বাজারের মৌখিক আত্মদান নহে। জগতের সাহিত্যে এই অপূর্ব্ব আত্মদানের তুলনা বিরল। ইহার প্রত্যেকটীই অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ। সমালোচক শশাঙ্কমোহন সত্যই বলিয়াছেন,—"একালে কেহ কেহ বৈষ্ণব কবির রচনাকে উহার তত্ত্বাংশ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্নভাবে, কেবল মানুষ-মানুষীর 'পীরিত-কথা' রূপেই বুঝিতে চাহিতেছেন। নব্যবঙ্গের খৃষ্টান কবি মধুসূদন সর্ব্বপ্রথম উহার পথ-প্রদর্শক। এখন অশিক্ষার গতিকে বিশেষতঃ বিরুদ্ধপন্থী শিক্ষা-পদ্ধতি ও অপরিচয়ের গতিকে, বৃন্দাবন-রাজার তত্ত্ব এদেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের নিকটেই বরঞ্চ দূরগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু রাজপথের প্রত্যেক 'ঝুটি বাঁধা কাছা খোলা' ভিখারী বৈষ্ণব এখনও জিজ্ঞাসু ব্যক্তির কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারে।"

ভাগবতের অন্যান্য অনুবাদ ও অনুবাদকগণ

মালাধর বসুর পরে আরও অনেক লেখক ভাগবতের অংশ-বিশেষের অনুবাদ করিয়াছেন। তন্মধ্যে মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, নন্দরাম দাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, কাশীরাম দাসের ভ্রাতা কৃষ্ণ কিঙ্করের শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস, কবি-বল্লভের গোপাল-বিজয় প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লৌকিক ধর্ম্মশাখা

মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠী, সত্যনারায়ণ প্রভৃতি দেবতা বাঙ্গালীর নিজস্ব। ইঁহাদের মাহাত্ম্য-কথাও বঙ্গভাষাতেই লিখিত। এই সকল দেবদেবীর ছড়া ও পাঁচালী প্রথমে ক্ষুদ্রাকারই ছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কুশলী কবির হাতে পড়িয়া উহা বৃহৎ কাব্যাকারে পরিণত হইয়াছে। এগুলি বহু প্রাচীন; বহু প্রাচীন বলিতে আমরা ইহাই বুঝিব যে, এই গুলির বীজ বহু পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল, তাহার পর হিন্দু-অভ্যুদয়ের যুগে পূর্ণভাবে বিকসিত হইয়া বিশেষ রূপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। চণ্ডী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি বিজয়ী আর্য্যগণের ধর্ম্মমতের উপর বিজিত দ্রাবিড়গণের প্রভাবের সাক্ষ্য দিতেছে। শশাঙ্ক মোহনের ভাষায় বলিতে গেলে, "এই স্থলে আর্য্য-দ্রাবিড়ের সম্মেলন; দেশস্থ জনসাধারণের প্রচলিত বিশ্বাসের সহিত বিজয়ী আর্য্যগণের অকপট সন্ধি।" এখানে আমাদিগকে এই কথাটী মনে রাখিতে হইবে যে, ভগবান্‌কে মাতৃরূপে কল্পনা করা ও মাতৃ-ভাবে উপাসনা করা দ্রাবিড় ধর্ম্মমত ও উপাসনা-প্রণালীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। দ্রাবিড়-প্রভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবার পূর্ব্বে আর্য্যগণের মধ্যে এই মাতৃ-ভাব-মূলক উপাসনা পদ্ধতি ছিল না। পরবর্ত্তী যুগে অনার্য্যগণ আর্য্য-সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হইবার পর আর্য্যগণ এগুলিকে আর্য্যামীর আবরণ দ্বারা ঢাকিয়া লইয়াছিলেন। আমাদের দুর্গা, কালী, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতির মধ্যে সেই অতীত যুগের নিদর্শনই বিজড়িত রহিয়াছে। কালী, দুর্গা প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতা; ইঁহাদের সংস্কৃত শাস্ত্র যথেষ্ট আছে। কিন্তু মনসা, শীতলা, সুবচনী, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গালার নিজস্ব সৃষ্টি। বিশেষতঃ মনসা-দেবী প্রাচীন কালের বঙ্গীয় দ্রাবিড়গণের প্রতিষ্ঠিত কাঠামের উপরই মাটী লেপিয়া রং করা বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। নাগপূজা বা নাগাধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা দ্রাবিড়-গণের মধ্যেই বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। এখনও বঙ্গদেশের অনার্য্য শ্রেণীর মধ্যেই মনসা-পূজার প্রচলন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

মঙ্গল-কাব্য ও মঙ্গল-গান

বর্ত্তমানে আমরা মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ও ষষ্ঠীমঙ্গল প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিব। এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই এগুলিকে মঙ্গল-কাব্য কেন বলে, তাহা আমাদিগকে বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রাচীনকালে এই সকল দেবদেবীর মাহাত্ম্য-সূচক গাথা ও কাব্য পালা-গানের আকারে গৃহস্থের বাড়ীতে গীত হইত। লোকের বিশ্বাস ছিল যে, এই সকল গান শুনিলে রোগ, শোক, দারিদ্র্য ও সর্ব্ব প্রকার আপদ বিপদ দূরীভূত ও গৃহস্থের অশেষবিধ কল্যাণ সাধিত হয়। এই গানের দলে ৫।৭ জন লোক থাকিত। দলের অধিকারী "মঙ্গল-গায়ন" নামে অভিহিত হইতেন। উক্ত "মঙ্গল-গায়ন" মাথায় টোপর ও পায়ে নূপুর পরিয়া চামর দোলাইয়া গান গাহিতেন।

মনসা-মঙ্গল

প্রায় শতাধিক বাঙ্গালী কবি মনসা দেবীর মাহাত্ম্য-গান গাহিয়াছেন। ইহার মধ্যে কাণা হরি দত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণদেব, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি কবিগণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের প্রথমোক্ত তিন জন গৌড়ীয় যুগের অন্তর্ভুক্ত। "চৈতন্যোত্তরীয় যুগ" বা "সংস্কার যুগ" এর সাহিত্য আলোচনা-কালে কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি মনসা-মঙ্গল রচয়িতৃগণের বিষয় আমরা যথাস্থানে সন্নিবেশ করিব।

কাণাহরি দত্ত

এই কাণাহরি দত্তই মনসা-মঙ্গলের আদি কবি। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্রের মতে কাণাহরি দত্তের মনসা-মঙ্গল মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। দীনেশ বাবুর বিশ্বাস, ইনি পূর্ব্ব বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।

বিজয় গুপ্ত

বিজয় গুপ্ত বরিশাল জেলার অন্তর্গত ফুল্লশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দেবীর আদেশে পদ্মা-পুরাণ রচনায় ব্রতী হন। রচনার সময় সম্বন্ধে বিজয় গুপ্ত তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন,—"ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক। সনাতন হুসেনসাহ নৃপতি তিলক॥" ইহা হইতে অধ্যাপক দীনেশ-চন্দ্র ১৪১৬ শক অর্থাৎ ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দকে বিজয় গুপ্তের "মনসা-মঙ্গল" বা "পদ্মা-পুরাণ" রচনার কাল বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

বিজয় গুপ্তের পদ্মা-পুরাণ সম্বন্ধে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"বিজয় গুপ্তের পদ্মা-পুরাণ বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্ম্ম-তথ্যের খনি। ইহার ভাষা প্রাচীন ও কতকটা অমার্জ্জিত হইলেও, এই কাব্যের পত্রে পত্রে পল্লী-প্রাণের করুণ সাড়া পাওয়া যায়।"

নারায়ণদেব

নারায়ণদেব ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের সংযোগ-স্থলে জোয়ানসাহী পরগণায় কায়স্থ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণদেবের "পদ্মা-পুরাণ" সম্বন্ধে দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন,—"এই পুস্তকের হস্তলিপিতে সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় নাই, লেখক যে ভাবে কথা কহিতেন, সেই ভাবেই শব্দগুলি লিখিয়া গিয়াছেন,—ইহাতে রচনার পারিপাট্য না থাকিলেও স্বাভাবিকত্ব আছে।"

বঙ্গে মনসা-পূজা

বর্ত্তমানে মনসা-পূজা বঙ্গীয় বুনা, তিয়র প্রভৃতি অনার্য্য সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষভাবে প্রচলিত। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে দশহরা, শ্রাবণ-সংক্রান্তি প্রভৃতিতে মনসা-পূজার প্রচলন থাকিলেও পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়গুলির মধ্যেই ইহার জাঁকজমক সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সাপধরা বুনা, তিয়র প্রভৃতি সম্প্রদায়ের একটী পেশা মধ্যে পরিগণিত। মনসা-পূজা উপলক্ষে সাপ খেলার একপ্রকার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, ইহাকে "ঝাঁপান" বলে। ইহাতে

সাপ খেলাইবার জন্য মনসা দেবীর মাহাত্ম্য-সূচক এক প্রকার গানের প্রচলন আছে। ইহা "ঝাঁপান গান" নামে অভিহিত।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আঢ্য মহাশয় মেদিনীপুরে প্রচলিত "ঝাঁপান গানের" কতকাংশ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। আঢ্য মহাশয় লিখিয়াছেন,—"ঝাঁপান মেদিনীপুরের একটী পর্ব্বের নাম।" তাঁহার এই ধারণা ভ্রমাত্মক। এই ঝাঁপান পর্ব্ব বা ঝাঁপান উৎসব মেদিনীপুরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে; বঙ্গের নানা স্থানেই উহার প্রচলন আছে। তবে স্থান-বিশেষে অনুষ্ঠান-পদ্ধতির মধ্যে একটু ইতর বিশেষ আছে এই মাত্র প্রভেদ।

নানা কারণে আমাদিগের বিশ্বাস যে, এই মনসাতত্ত্বের উদ্ভব প্রাচীন বঙ্গের অনার্য্যদিগের মধ্য হইতেই হইয়াছিল। তৎপর উহাকে হিন্দুয়ানীর আবরণ দিয়া ঢাকিয়া লওয়া হইয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বহু পূর্ব্ব হইতে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতি দেবতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। এই মনসাতত্ত্ব বিষয়েও আমরা তাঁহারই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তিনি এ বিষয়ে অবহিত হইলে, আমাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে।

চাঁদসদাগর ও বেহুলা

চাঁদসদাগর ও বেহুলা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের গৌরবের কোহিনুর। চাঁদসদাগর পুরুষকারের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। মনসাদেবীর ক্রোধানলে চাঁদের ছয় ছয়টী পুত্র ভস্মীভূত হইল। মধুকর মহামূল্য সম্পৎ-সম্ভারসহ অতল তলে নিমজ্জিত হইল। এত আঘাতের পর আঘাত, বিপর্য্যয়ের পর বিপর্য্যয়ও চাঁদকে অবনত করিতে পারিল না। চাঁদের সকল শোকের সান্ত্বনাস্থল এক-মাত্র পুত্র লখীন্দরকেও মনসাদেবী নিষ্কৃতি দিলেন না,—লৌহের বাসরে মনসাদেবীর সর্পদংশনে তাহার বাসর-শয্যা মৃত্যু-শয্যায় পরিণত হইল। তবুও চাঁদের প্রতিজ্ঞা টলিল না।

এখানে চাঁদসদাগরের এই চিত্র আমাদিগকে হোমারিক কাব্যের দারুণ অদৃষ্ট-যন্ত্রের পেষণে নিষ্পেষিত বীরগণকে এবং "মেঘনাদ-বধ" কাব্যের রাবণকে স্মরণ করাইয়া দেয়। শূলী-শম্ভু-সম কুম্ভকর্ণ, ভুবনে অজেয় বীরবাহু প্রভৃতি একে একে রামের শরে রণশয্যায় শায়িত হইয়াছে,—সোনার লঙ্কা শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে, তথাপি আত্মসমর্পণের চিন্তা রাবণের মনে স্বপ্নেও উদিত হয় নাই। মনসা-মঙ্গলের শেষভাগ এই অপরাজেয় মহাবীরের পরাজয়ের চিত্র। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে, "সে পরাভবও চাঁদের ন্যায় বীরের উপযুক্ত। মনসা দেবী ইতিপূর্ব্বে কতবার ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন, একবার এক মুষ্টি ফুল তাঁহার পদে ফেলিয়া দিলেই তিনি পুত্রগুলি বাচাইয়া দিবেন, সপ্তডিঙ্গা মধুকর জল হইতে তুলিয়া দিবেন। কিন্তু চাঁদবীর লুব্ধ হইয়া অবনতি স্বীকার করে নাই। এই শাল্মলী তরু কিসে নত হইল? বেহুলার স্নেহ চাঁদ বেগে রোধ করিতে পারিল না"।

বেহুলা

বেহুলা বঙ্গীয় গ্রাম্যকবির অনুপম ও অনবদ্য সৃষ্টি। বেহুলা রূপে গুণে অতুলনীয়া এবং নৃত্যগীতে সুনিপুণা। পদ্মিনী নারীর যাবতীয় বৈশিষ্ট্যই বেহুলাতে বিদ্যমান। দারুণ দুরদৃষ্টবশে মনসার কোপে বিবাহের রাত্রিতেই বেহুলা স্বামিহীনা হইল, তাহার সাধের বাসর-শয্যা মৃত্যু-শয্যায় পরিণত হইল। "বেহুলা লাল চেলী পরিয়াছিল; স্বামীর মৃত্যুর পর সে থান কাপড় পরিল না,—সে তাহার কপালের সিন্দূর মুছিয়া ফেলিল না এবং গলার হীরার হার, হাতের অনন্ত ও কঙ্কণ এবং পায়ের নূপুর খুলিয়া সে বিধবা সাজিল না।" বেহুলা মৃত স্বামীর শব বক্ষে লইয়া কলার মান্দাসে করিয়া গাঙ্গুড় নদীর জলে ভাসিল। শব ক্রমে পচিতে লাগিল,—

"ধরিয়া মরার গায়ে হানে এক জোঁক॥
ছাড়াইতে নাহি ছাড়ে মাংসেলে লুকোয়।
মরি হরি বেহুলার কি হবে উপায়॥"

একদিকে জল জন্তুদল শব কাড়িয়া খাইতে উদ্যত, অপর দিকে বহু দুর্বৃত্ত তাঁহাকে নানা উপায়ে প্রলুব্ধ করিতে প্রবৃত্ত ; কিন্তু সতীত্বের বলে বলীয়সী পতিগতপ্রাণা বেহুলা এ সকলই অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া চলিল। এইরূপ বিপর্য্যয়ের পর বিপর্য্যয় অতিবাহিত করিতে করিতে বেহুলা দেব-সভায় উপনীত হইয়া, নৃত্যগীতে দেবগণকে মুগ্ধ করিয়া স্বামী ও স্বজনগণের জীবন ফিরিয়া পাইল।

বেহুলা-চরিত্র প্রসঙ্গে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"কবি স্বচক্ষে সতী দেখিয়া সতী আঁকিয়াছেন। * * * আমাদের দেশে রমণীগণের কষ্টের সীমা নাই। দৈনন্দিন গার্হস্থ্য জীবনে পরার্থে আত্মোৎসর্গ, উপবাস, ব্রতাদির কঠোরতা ও স্বামীর জন্য প্রাণত্যাগ—এই নানাবিধ সদ্‌গুণের প্রতিভা যেন আপনা আপনি সমাজ হইতে সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া বেহুলার ন্যায় আদর্শ-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাতে কবিগণের "সাহিত্য-দর্পণ" পড়িতে হয় নাই। "সাহিত্য-দর্পণে"র সূত্র এরূপ উচ্চ রমণী-চরিত্র আয়ত্ত করিতে পারে না।"

চণ্ডীমঙ্গল

মনসা-মঙ্গলের পর চণ্ডীমঙ্গলের কথা। দ্বিজ জনার্দ্দন, বলরাম, ভবানীশঙ্কর, মাধবাচার্য্য, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, প্রভৃতি কবিগণ চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছেন। "সংস্কার যুগ"এর সাহিত্য আলোচনা সময়ে আমরা চণ্ডী-কাব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

কালিকামঙ্গল

চণ্ডীমঙ্গলের পরই "কালিকামঙ্গল" বা বিদ্যাসুন্দর কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণরাম দাস দ্বিজরাম নারায়ণ, বলরাম চক্রবর্ত্তী কবিশেখর প্রভৃতি বহু কবি "কালিকামঙ্গল" বা বিদ্যাসুন্দর কথা রচনা করিলেও চণ্ডী-

কাব্যে যেমন মুকুন্দরাম বিদ্যাসুন্দর, উপখ্যানে তেমনি ভারতচন্দ্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত বলরাম চক্রবর্ত্তী কবিশেখর-কৃত কালিকামঙ্গল বর্ত্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ, এম, এ, মহাশয়।

শীতলামঙ্গল

অথর্ব্ববেদের "তক্মন" শব্দের অর্থ শীতলা। ইহাতে কেহ কেহ বর্ত্তমান শীতলা দেবী বৈদিক যুগ হইতে সমুদ্ভূতা বলিয়া মনে করেন। "স্কন্দ-পুরাণ" ও "পিচ্ছিলা তন্ত্রে" শীতলা দেবীর উল্লেখ আছে। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে শীতলা দেবীর একটী প্রাচীন মন্দির অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ মতে "হারিতী" নামধেয়া এক দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। এই হারিতী দেবীও শীতলা দেবীর ন্যায়ই গুটিকা ও ব্রণ বিনাশিনী। এজন্য অনেকে শীতলাকে উক্ত হারিতী দেবীরই রূপান্তর মনে করেন।

বঙ্গভাষায় এই শীতলা দেবীর মহাত্ম্য-সূচক অনেক গাথা রচিত হইয়াছিল। শীতলা মঙ্গলের প্রাচীনতম পালাগুলি এখনও সংগৃহীত হয় নাই। দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণনাথ, দৈবকীনন্দন কবিবল্লভ প্রভৃতির রচিত শীতলামঙ্গলের পালাগুলির সন্ধান মিলিয়াছে।

ষষ্ঠীমঙ্গল

পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক অমূল্যচরণের মতে "বহু শক্তি রূপিণী আদ্যা শক্তি মহামায়ার ধাত্রীরূপকে ষষ্ঠী দেবীরূপে কল্পনা" করা হইয়াছে। (৺রাম গতি ন্যায়-রত্নের "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থের অমূল্য বাবুর লিখিত ৩য় সংস্করণের ভূমিকা।) তাঁহার মতে কৃষ্ণচন্দ্র, কবিচন্দ্র ও গুণরাজ প্রভৃতি কবিগণ ষষ্ঠীদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার ও ঘরে ঘরে ষষ্ঠী-পূজার প্রচলন করেন।

চৈতন্য-পূর্ব্ব পদাবলী-শাখা

পদাবলী-পরিচয়

"প্রচারিত হেথা প্রেমের ধর্ম্ম মুক্তির পথ পরমাপ্রীতি।
অযুতকণ্ঠে অগণিত কবি গাহিয়াছে হেথা প্রেমের গীতি॥
মঙ্গলময়ী বঙ্গ-জননী স্নেহ উচ্ছলা বরদা বেশ।
এ যে ভারতীর কমল-কুঞ্জ এ যে গো শান্তি প্রীতির দেশ॥"

পদাবলী-সাহিত্য বাঙ্গালী বৈষ্ণব-কবিগণের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি এবং জগতের গীতি-সাহিত্যে ইহা বাঙ্গালী প্রতিভার এক অভিনব দান। "পদাবলী-সাহিত্য প্রেমের রাজ্য, নয়ন-জলের রাজ্য। পূর্ব্বরাগ, উক্তি, প্রত্যুক্তি, প্রথম মিলন, সম্ভোগ, অভিসার, কারণমান, নির্হেতুমান, প্রেম-বৈচিত্ত্য, দানলীলা, নৌকাবিলাস, বাসন্তীলীলা, বিরহ, পুনর্ম্মিলন—প্রেমের এই বহু বিভাগের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে কেবল কোমল অশ্রুর উৎস; ইহাতে স্বার্থের আহুতি,—অধিকারের বিলোপ; বাঞ্ছিতের দেহ স্পর্শ করিতে,—দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতে,—তজ্জাত অপূর্ব্ব পরিমল আঘ্রাণ করিতে, মধুগন্ধে অন্ধ অলির ন্যায়—স্বর্গীয় প্রেমিক কবিগণ কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন, পদাবলী-সাহিত্য তাঁহাদের অশ্রুর ইতিহাস।"

বৈষ্ণব-পদাবলীর বিষয়-বস্তু

প্রেমই জগতের শ্রেষ্ঠ কবিতা ও কাব্য-সমূহের প্রধান আলোচ্য বিষয়। পদাবলী-সাহিত্যের বিষয়-বস্তুও (Theme) এই প্রেম। জাগতিক নায়ক-নায়িকার প্রেমাসক্তির আদর্শকে অবলম্বন করিয়াই বৈষ্ণব মহাজনগণ বিশ্বের চরম সচ্চিদানন্দ তত্ত্বকে শ্যামসুন্দররূপে পরিকল্পনা করিয়া, তাঁহাকে লাভ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের "বৈষ্ণব-

কবিতা"র একস্থলে পদাবলী-সাহিত্যের এই মর্ম্ম-কথাটী অতি সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

"আমাদেরি কুটীর কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেম গীতিহার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলন মেলায়
কেহ দেয় তাঁরে—কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়রে দেবতা।"

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ ও দীনেশচন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে,—"এই গীতি-কাব্যের প্রধান উপজীব্য শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেম। দাম্পত্য প্রেম জগতের সমস্ত কাব্যকলার জীবন্ত প্রেরণা যোগাইয়া আসিতেছে। তাহার কারণ রসই কাব্যের প্রাণ বা আত্মা। যেখানে রস বা আনন্দ নাই, সেখানে কাব্য নাই। দুঃখের অভিব্যক্তিতেও আনন্দ থাকিতে পারে; সুতরাং তাহাও রসশব্দের অন্তর্ভুক্ত। সুখ দুঃখ লইয়াই জীবন; সুখ দুঃখ লইয়াই কবিতা। সমালোচক সত্যই বলিয়াছেন, "Poetry is the criticism of life." জীবনের মধ্যে যত প্রকার রসানুভূতি আছে, ভালবাসা তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই জন্যই অনুরাগ, মিলন, বিরহ-বেদনা লইয়াই জগতের শ্রেষ্ঠ কবিতা রচিত হইয়াছে। পুত্রের জন্য মাতার সকরুণ স্নেহ, পুত্রের বিরহে মাতার কাতর ক্রন্দন, সখার জন্য সখার ব্যাকুলতা, সখার সঙ্গে সখার নিবিড় সম্মেলন, নায়িকার প্রতি নায়কের প্রীতি, নায়কের

জন্য নায়িকার উৎকণ্ঠা, প্রেমাস্পদের বিরহে বেদনাতুর হৃদয়ের মর্ম্মভেদী হাহাকার এই লইয়াই যাবতীয় কবিতা। বৈষ্ণব-কবিতায়ও এই সকল রসের অনুবৃত্তি ও বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভেদ এই সাধারণ কবিতায় সখ্য, বাৎসল্য, দাম্পত্যপ্রেম মানুষের মধ্যে নিবদ্ধ; বৈষ্ণব-কবিতায় উহা শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বৈচিত্র্যে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে।" বৈষ্ণব-পদাবলী বাস্তব প্রেমের আদর্শ ধরিয়াই আমাদিগকে স্বর্গের দ্বারে লইয়া গিয়াছে। সুধী সমালোচক যথার্থই লিখিয়াছেন,—"উহা মানবীর প্রেম-গীতি গাহিতে গাহিতে যেন সহসা সুর চড়াইয়া কি এক অজ্ঞাত সুন্দর রাগিণী ধরিয়াছে, তাহা ভক্ত ও সাধকের কর্ণে পৌছিতে সমর্থ হইয়াছে। বৈষ্ণব-কবিতা নদীর মোহনার সহিত তুলিত হইতে পারে। এই গীতি কুলু কুলু স্বরে মানব-জগতের সুখ দুঃখের কথা গাহিতে গাহিতে এমন একটা জায়গায় আসিয়া পৌছায়, যেখানে সমস্ত সীমার বাঁধ চলিয়া যায়।"

বৈষ্ণব-পদাবলীর উদ্ভব ও পরিপুষ্টি

অনেকের মতে জয়দেবই পদাবলী-সাহিত্যের আদি কবি। জয়দেব গৌড়ের শেষ হিন্দু-নরপতি লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। লক্ষ্মণসেন ১১৬৮ হইতে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির আবির্ভাবের পূর্ব্বেই পদাবলী-সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল। জয়দেব তাঁহার মধুময় গীতিকাব্য "গীতগোবিন্দ" সংস্কৃত ভাষাতেই রচনা করেন। দীনেশবাবুর মতে বাঙ্গালা ভাষায় পদরচয়িতা-দিগের মধ্যে কবি উমাপতিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইঁহার রচিত অনেক পদ বঙ্গদেশ ও মিথিলার নানাস্থানে প্রচলিত আছে। মিথিলাবাসিগণ ইঁহাকে তাঁহাদের স্বদেশবাসী এবং বিদ্যাপতির সমসাময়িক বলিয়া মনে করেন। Keay এবং গ্রীয়ার্সন সাহেব এই মতের অনুমোদন করেন। দীনেশবাবুর মতে "চন্দ্রচূড়-চরিত"-প্রণেতা উমাপতি ধর এবং পদরচয়িতা

উমাপতি একই ব্যক্তি। উমাপতি ধর গৌড়াধিপতি বিজয় সেনের সভাকবি ছিলেন। বিজয়সেন খৃষ্টীয় একাদশ শতকে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। অত্যাপি কলিকাতা মিউজিয়ামে তাঁহার রাজ অট্টালিকার সিংহদ্বারের প্রস্তর খণ্ড উমাপতি ধরের রচিত সংস্কৃত-শ্লোক সহ সংরক্ষিত আছে। কবি উমাপতি সম্বন্ধে দীনেশবাবুর এই সিদ্ধান্ত সত্য হইলে, স্বীকার করিতে হইবে যে, জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" রচনার বহু পূর্ব্বে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-গীতি সর্ব্ব প্রথমে বঙ্গভাষাতেই রচিত হইয়াছিল এবং খৃষ্টীয় ১০ম ও ১১শ শতকে বঙ্গদেশে রাইকানুর প্রেম-গীতি প্রচলিত ছিল। যাহা হউক এই সময় হইতে প্রচলিত এক প্রকার গান আমরা রংপুর, দিনাজপুর ও কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চল হইতে পাইতেছি। ইহার নাম "কৃষ্ণধামালী"। অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই কৃষ্ণ-ধামালীই একদিন বঙ্গীয় জনসাধারণের রাইকানুর প্রেম-গীতি শুনিবার পিপাসা মিটাইত। ধামালী গান "আসল" ও "শুকুল" এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। "আসল ধামালী" এত অশ্লীল ছিল যে, উহা গ্রামের বাহিরে গীত হইত। শুক্ল ধামালী তত কুরুচিপূর্ণ ছিল না। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র অনুমান করেন যে, ইহাকেই কবিত্ব-মণ্ডিত ও সাধুভাষায় প্রবর্ত্তিত করিয়া চণ্ডীদাস "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" ও জয়দেব "গীতগোবিন্দ" রচনা করেন। এই কৃষ্ণ-ধামালী খৃষ্টীয় ১০ম শতক হইতে আধুনিক কালের কবিগান ও ঝুমুর গানের মধ্য দিয়া একটী অবিভক্ত ধারা রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মমতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম এবং বৈষ্ণব-সাধনার মর্ম্মকথা লইয়াই বৈষ্ণব-সাহিত্য। তাই বৈষ্ণব-সাধনার মর্ম্মকথাটীর সহিত একটু পরিচিত না হইলে, বৈষ্ণব-সাহিত্যের পঠন-পাঠন চলিতে পারে না। বৈষ্ণবীয় সাধনার বৈশিষ্ট্য এবং বৈষ্ণবের রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমানে আমরা এই ভক্তি

ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিব। ভক্তিতত্ত্বের উৎপত্তি ও প্রাচীনতা সম্বন্ধে স্বনামধন্য সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় তাঁহার "বঙ্গ-সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"ভক্তিমার্গ ও সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার বীজ বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হয়। হিন্দুর আধ্যাত্মিকতার ইতিহাসে অদ্বৈতবাদ ও জ্ঞানমার্গ, বৌদ্ধধর্ম্ম ও কর্ম্মবাদ যে সময়ে বিপুল তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছিল, সে সময়ে 'ভাগবত', 'সাত্বত', 'বৈখানস' ও 'পঞ্চরাত্র' মতাবলম্বী ভক্তগণ নিভৃতে আপনাদিগের গুরুগত পারম্পর্য্য ও অধ্যাত্ম-সাধনার অমূল্য দীপ সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, ইহারও যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। * * * এই সমস্ত বিরুদ্ধ মতের সহিত সংঘর্ষে দুর্ব্বল বা নিষ্প্রভ হওয়া দূরের কথা, ভক্তিতত্ত্বের দার্শনিক গভীরতা যে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রকারে বহু যুগ যুগান্তের মধ্য দিয়া ভক্তিলতার অমৃত-বীজ রস সঞ্চয় করিতে করিতে, স্তবকে স্তবকে সুরম্য কুসুমে সুশোভিত হইয়া, জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবির গীতি কবিতার মধ্য দিয়া লোক লোচনের গোচরীভূত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় সেই ভক্তিলতাই তাহার পূর্ণ পরিণত সুস্নিগ্ধ ছায়ায় সমস্ত ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।" (বঙ্গলক্ষ্মী—ফাল্গুন, ১৩৩৭) ভক্তি-ধর্ম্মের ধারাবাহিক বিকাশ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তীর "বৈষ্ণব-সাহিত্য" পুস্তকের ভূমিকায় পণ্ডিতপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন,—"আরণ্যক ও উপনিষদের উপাসনা-কাণ্ডের উপর ভক্তিমার্গ সংস্থাপিত। * * * কঠোপনিষদ ও চতুর্ব্বেদ শিক্ষায় ভক্তিবাদ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা আছে। নীলকণ্ঠ মহাভারত-ভাষ্যে ভক্তির বৈদিক উৎপত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে ভক্তি শব্দ যে খুব প্রাচীন তা নয়। বেদ বা প্রাচীনতম উপনিষদে ভক্তি শব্দের উল্লেখ নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে ভক্তি শব্দের প্রথম উল্লেখ

দেখিতে পাওয়া যায়। * * * শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শেষে ভক্তি শব্দ উৎপন্ন হইয়া পরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পারিভাষিক শব্দরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। * * * প্রকৃত পক্ষে গীতাই ভক্তি ধর্ম্মের বেদ, আর গীতার ভক্তিই ভক্তির প্রথম তরঙ্গ। ইহার পর সহস্র বৎসরের মধ্যে ভক্তির অভিব্যক্তির আর কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। গীতা রচনার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যে কৃষ্ণ অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গোপাল কৃষ্ণের পূজা অবলম্বন করিয়াই ভক্তির দ্বিতীয় তরঙ্গের অভিব্যক্তি হইয়াছে। এখন হইতে ১৫০০ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে ২য় তরঙ্গের বিকাশ হয়। কিন্তু ১৫০০ বৎসর পরে সেই অভিব্যক্তির লক্ষণ সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে ভক্তিবাদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছিল। মধ্য যুগের বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভারতের দক্ষিণে উৎপন্ন হইয়া রামানুজ ও মধ্যাচার্য্য কর্ত্তৃক পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল।" প্রাচীন বৈষ্ণব-মতানুসারে কোথাও সীতারামের পূজা, কোথাও বা লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা ইত্যাদি চলিতেছিল। তারপর বঙ্গদেশে নবজাগরণের যুগে শশাঙ্কমোহনের ভাষায় বলিতে গেলে,—"বাঙ্গালী নিজের হৃদয় তন্ত্রতার গতিকেই সংস্কৃত কিংবা আর্য্য প্রভাব হইতে নিজেকে ন্যূনাধিক স্বাধীন করিয়া বঙ্গদেশে এক স্বতন্ত্র ভাব-সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে।" গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং পদাবলী-সাহিত্যের রাইকানু বাঙ্গালী প্রতিভার মৌলিক সৃষ্টি এবং মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ইহা বাঙ্গালী জাতির এক অমূল্য দান। এই বৈষ্ণব-সাধনার বীজ উপনিষদে উপ্ত হইয়াছিল, ভাগবত ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে অঙ্কুরিত এবং বৈষ্ণব যুগে বাঙ্গালীর প্রেমাশ্রু সেচনে সেই অঙ্কুর পল্লবিত হইয়া সুশীতল ছায়া সমন্বিত মহামহীরূহে পরিণত হইয়াছে।

ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যভাব

শ্রীভগবান্ অনন্ত শক্তি-সম্পন্ন। তিনি ইচ্ছা করিলে নিমিষে সৃষ্টি স্থিতি

লয় করিতে পারেন। তাঁহার তুলনায় আমরা অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য। এইরূপে তাঁহার অলৌকিক দৈবী শক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া ভীতি-বিহ্বলচিত্তে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া ঐশ্বর্য্যভাব-মূলক সাধনার মর্ম্মকথা। স্বনামধন্য শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ঐশ্বর্য্যভাব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"যে ভাবে তিনি অদৃষ্টের বিধাতা, পাপের শাস্তা, জগতের নিয়ন্তা, সাধুর পরিত্রাতা, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা—যে ভাবে তিনি সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব শক্তিমান্, সেই তাঁহার ঈশভাব, ঐশ্বর্য্য। * * * শশী সূর্য্য যাঁহার নেত্রে, দীপ্তানল যাঁহার আননে, ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার রোম-কূপে, যাঁহার অনন্ত বদন, অনন্ত নয়ন, অনন্ত চরণ, যিনি বিশ্বরূপে জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন, সেই আদি-অন্ত-মধ্যহীন—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ" মহামূর্ত্তি ভগবানের ঐশ্বর্য্যের চরম দৃষ্টান্ত।"

মাধুর্য্যভাব

পূর্ব্বোক্ত ঐশ্বর্য্য ভাব ছাড়া শ্রীভগবানের আর একটী ভাব আছে, সে ভাবটী তাঁহার মাধুর্য্য বা মধুর ভাব। এই ভাবে তিনি স্নেহময়, প্রেমময়, করুণাময়, রসময় ও রসিকেন্দ্রশেখর। এইভাবে তিনি নন্দ-যশোদার পুত্র, শ্রীদাম, সুদাম ও বসুদাম প্রভৃতির সখা এবং ব্রজ আহিরিণীগণের নাগর। যতক্ষণ ভগবান্ বিরাট্, অসীম ও বোধাতীত এবং তাঁহার তুলনায় আমি অতি হীন ও নগণ্য এইরূপ ভাবিয়া তাঁহাকে দূর হইতে নমস্কার করি, ততক্ষণ আমরা তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া ভাল বাসিতে এবং অন্তরের অন্তরতম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। আর যখন আমরা তাঁহাকে পুত্রের মত, সখার মত ও স্বামীর মত করিয়া ভাবিতে পারি, তখনই তাঁহাকে নিবিড় ভাবে ভালবাসিতে সমর্থ হই। এইরূপে বিশ্বসুন্দরকে বা বৈষ্ণব রসিকগণ-কথিত নিখিল-রসামৃতমূর্ত্তি বা শ্যামসুন্দরকে প্রেম সহকারে ভজনা করাই মাধুর্য্য ভাবের আরাধনা। এই মাধুর্য্য ভাবমূলক ভজনাই ব্রজলীলার

প্রাপ্য। ইহার পরিপূর্ণতা সাধনই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিশেষত্ব। বৈষ্ণব-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

"ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে, আমাকে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালনপালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড়লোক—তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥
এই শুদ্ধা ভক্তি লইয়া—করিমু অবতার।
করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার॥
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে॥"

জগতের ইতিহাসে কেবলমাত্র দুইটী সাধক-সম্প্রদায় ভগবান্‌কে মধুর ভাবে ভজনা করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটী পারসিক সুফী মরমী সম্প্রদায়; অপরটী গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। বস্তুতঃ বঙ্গীয় বৈষ্ণব-মহাজনগণই এই মাধুর্য্যভাবমূলক সাধনার চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। মাধুর্য্যভাবে বিভোর হইয়া শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম প্রভৃতি ব্রজবালকগণ নন্দের ননীচোরা

গোপালের কাঁধে চড়িয়া খেলা করিয়াছে; তাহাদের উচ্ছিষ্ট বনফল গোপালের মুখে তুলিয়া দিয়াছে। যশোদা ননীভাণ্ড ভাঙ্গিবার অপরাধে গোপালকে ঘরের ছেলের মতই দড়ি দিয়া বাঁধিয়া শাস্তি দিতে গিয়াছেন। বঙ্গ-পল্লীতে ভিখারীরা পল্লীগৃহস্থের বাড়ীতে এই মধুময় বাৎসল্য রস-ধারা পরিবেষণ করিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া থাকে।

"নন্দ গেছে বাথানেতে যশোদা গেছে ঘাটে।
শূন্য ঘর পেয়ে গোপাল সর্ব্ব ননী লোটে॥
*   *   *   *
হাতে দড়ি লয়ে রাণী যান পিছে পিছে।
লাফ দিয়ে উঠেন কৃষ্ণ কদম্বের গাছে॥
পাতায় পাতায় ফেরেন গোপাল ডালে না দেন পা।
নীচ হতে নন্দরাণী কপালে মারেন ঘা॥
নামরে নামরে গোপাল পেড়ে দিব ফুল।
ডাল ভেঙ্গে পড়ে যাবি মজাবি গোকুল॥
আলাভুলা দিয়ে রাণী গোপালে নামাল।
গাভী ছাঁদা দড়ি দিয়ে বাঁধিতে চলিল॥
বেঁধনা বেঁধনা মাগো বন্ধন জ্বালায় মরি।
হাতের মূরলী বেচে দিব ননীর কড়ি॥
একটী সত্য কর মাগো একটী সত্য কর।
নন্দ ঘোষ তোমার পিতা মোরে যদি মার॥"

ডেভিডের গীতিতে (Songs of David) এই মাধুর্য্যভাবের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। Dr. Inge এর সেণ্টজুয়ানের উক্তিতে আছে, "Make myself thy bride, I will rejoice in nothing till I am in thy arms." পাশ্চাত্য মনস্বী, মহামতি নিউম্যান বলিয়াছেন, "If thy soul is to go on into higher spiritual blessedness

it must become a woman; yes, however manly thou may be among men."

বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব

পদাবলী-সাহিত্যের "রাই-কানু" বাঙ্গালী বৈষ্ণব-মহাজনগণের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। বিশ্বের চরম সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বকে শ্যামসুন্দর রূপে পরিকল্পনা করিয়া, তাঁহার সহিত জীবাত্মার নিত্য লীলা বর্ণনা করাই বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের মর্ম্মকথা। গীতার বা মহাভারতের কৃষ্ণ বৈষ্ণবের কৃষ্ণ নহেন। কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণের সহিত ব্রজলীলার শ্রীকৃষ্ণের কোনই সম্পর্ক নাই; বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ সম্পূর্ণ ভাবে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-বস্তু। সমালোচক সুশীলকুমার যথার্থ ই লিখিয়াছেন,—"বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ পৌরাণিক উপকথাও নহেন, কবি-কল্পনাও নহেন, দেবতাও নহেন, রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্ব-বস্তু। পৌরাণিক রাধা-কৃষ্ণের লীলা-কথার সঙ্গে যে সকল কল্পনা, কিংবদন্তী ও কাহিনী জড়িত হইয়া রহিয়াছে সেগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব বুঝিতে হইবে, তবেই রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব বোধগম্য হইবে।" উপনিষদ ব্রহ্মের দুইটী বিভাবের (aspect) উল্লেখ করিয়াছেন। একটী তাঁহার সবিশেষ ভাব; অপরটী নির্ব্বিশেষ ভাব। যে ভাব কোনও বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করা যায় না, তাহাই নির্ব্বিশেষ ভাব। আর যে ভাবকে লক্ষণে লক্ষিত, চিহ্নে চিহ্নিত ও বিশেষণে বিশেষিত করা যায়, তাহাই সবিশেষ ভাব। নির্ব্বিশেষ ভাবে ব্রহ্ম নির্গুণ; এই নির্গুণ ব্রহ্মই লীলাবশে গুণ ও ক্রিয়াযুক্ত হইয়া সগুণ হন। শ্রুতি বলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা ব্যতীত অপর কিছুই ছিল না। এই পরব্রহ্ম বা পরমাত্মাই আনন্দ রস আস্বাদন করিবার জন্য নিজেকে বহুতে পরিণত করিলেন। তিনি এক হইয়াও বহু হইতে পারেন। তিনি যুগপৎ এক ও বহু। একদিকে তিনি

যেমন অসীম, অন্যদিকে তিনি আবার তেমনি সসীম। তাই ভক্ত কবি রবীন্দ্র নাথ গাহিয়াছেন,—

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।"

পূর্ণ ও অখণ্ড আত্মার আনন্দ উপভোগ বা রসাস্বাদ করিতে হইলে, তাহার সদৃশ আরও অনেক আত্মার প্রয়োজন। তাই পরম পুরুষ আপনাকে বহুতে পরিণত করিয়া, এই জীবজগৎ লইয়া আপনার রসাস্বাদ করিতেছেন। বৈষ্ণব দার্শনিকও বলিতেছেন,—

"পরমঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্ব কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইঁহা সবার আধার॥
পুরুষ যোষিৎ কিংবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক সাক্ষাত মন্মথ মদন॥
* * * *
আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥"

এইরূপে শ্রীভগবান্ নিজ মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য আপনাকে রাধিকা বা জীবাত্মাতে পরিণত করিয়াছেন। সুতরাং রাধা শ্রীভগবানেরই রসমূর্ত্তি, তাঁহারই শক্তি। তাই বৈষ্ণব দার্শনিক বলেন,—

"রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥
রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥"

রাধাতত্ত্ব-প্রসঙ্গে আরও বলিতেছেন,—

"সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ॥

আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি॥

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥

হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রূপ রসের আখ্যান॥

প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব রূপা রাধাঠাকুরাণী॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বৈষ্ণবের রাধা জীবাত্মার এবং কৃষ্ণ পরমাত্মার নিত্যস্বরূপ। জীবাত্মা এই পরমাত্মারই একটী বিশিষ্ট প্রকাশ। তাই পরমাত্মা ভিন্ন অপর কিছুই জীবাত্মাকে শাশ্বত সুখ ও চরম আনন্দ দিতে পারে না; আবার জীবাত্মা ভিন্ন পরমাত্মাও রসানন্দ আস্বাদ করিতে পারেন না। জীবাত্মা ও পরমাত্মার এই নিত্য লীলা আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাই ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন,—

(১) "আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য্য তোমায় রাখবে কোথায় থেকে॥

কতকালের সকাল সাঁঝে তোমার চরণ ধ্বনি বাজে।
গোপনে দূত হৃদয় মাঝে গেছে আমায় ডেকে॥"

(২) "আজ মনে হয় সকলের মাঝে
তোমারেই ভাল বেসেছি।
জনতা বাহিয়া চিরদিন শুধু
তুমি আর আমি এসেছি।"

আদর্শের হিসাবে বৈষ্ণব ভক্তগণ স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলেই রাধা-ভাবাপন্ন। রাধা যেমন জটিলা কুটিলার সহিত স্বামী আয়ান ঘোষের গৃহে বাস করিতেছেন, আমরাও তেমনি লোকাচার রূপ জটিলা আর সংসার বুদ্ধিরূপ কুটিলাকর্ত্তৃক শাসিত হইয়া, এই সংসাররূপ স্বামীর গৃহে বাস করিতেছি। এই সংসারই স্বামীর মত আমাদের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া রহিয়াছে। নপুংসক বা জড় আয়ান ঘোষ রাধাকে চরম সুখ দিতে পারেন না, তাই রাধা শ্যাম বঁধুর সঙ্গসুখের জন্য লালায়িত। তেমনি আমাদের স্বামী এই জড় সংসার আমাদিগকে চরম পরিতৃপ্তি দিতে পারে না, তাই আমাদের অন্তরাত্মা সেই বিশ্ব সুন্দরকে লাভ করিতে উন্মুখ। কিন্তু সংসার বুদ্ধিরূপ জটিলা আর লোকাচার রূপ কুটিলাই এ পথের বাদী। তাহারা আমাদিগকে সংসারের মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়। ইংরাজ মহিলা কবি **Emily Bronte**এর **"Speak, God of visions"** কবিতায় এই ভাবটী অতিসুন্দর রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবির শ্রীরাধিকা যেমন যমুনার তীরে

শ্যামের বাঁশী

শুনিলেই কুল-মানে জলাঞ্জলি দিয়া,—"নিন্দুকের মুখে অনল ভেজায়ে যাইব বঁধুয়া পাশে" বলিয়া ছুটিতে উদ্যত হন, তেমনি বিবেক ও বৈরাগ্যের বাঁশী যখন আমাদের হৃদয়-যমুনার কূলে বাজিয়া উঠে, তখন আমরাও তুচ্ছ পার্থিব সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সাধনার গহন বনে ছুটিতে উদ্যত হই। এই বাঁশী যেমন বৈষ্ণব কবির রাধাকে কুল ছাড়া করিয়াছে, তেমনি খৃষ্ট, বুদ্ধ,

শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ ও লালা বাবু প্রভৃতিকে ঘর ছাড়া করিয়া ছাড়িয়াছে। চণ্ডীদাসের রাধা বড় দুঃখেই বলিয়াছেন—

"কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী॥"

শ্রীকৃষ্ণের জলদ-সুন্দর কান্তি ও শিখিপুচ্ছচূড়ার রূপক ব্যাখ্যা

শ্যামসুন্দরের নবজলধর তনু ও শিখিপুচ্ছ চূড়ার রূপক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছেন--"He is represented as having a dark blue complexion. Dark blue suggests the predominating colour of the universe. We find it in the azure, in sky and ocean, in distant landscapes and in the immense verdure of pastoral meadows. On the head of Krishna is a crown of flowers and a plume of peacock feathers reminding us of the rainbow. This symbolises the various colours which adorn the main dark blue pervading the earth and sky."

পদাবলী-সাহিত্যের রাধা ও চৈতন্যদেব

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আদর্শের হিসাবে বৈষ্ণব-সাধক মাত্রেই রাধা। এই রাধাভাবের অনুশীলন ও অবলম্বনই চৈতন্য-লীলা। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী তাহার প্রেম-ধর্ম্মের ও প্রিয়তম-তত্ত্বের নব উপনিষদ রচনা করিয়াছিল। চৈতন্যদেব পদাবলী-বর্ণিত শ্রীরাধিকার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। তিনি রাধার মতই কৃষ্ণ-অঙ্গভ্রমে তমাল তরু আলিঙ্গন করিয়াছেন, মেঘ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। সখীগণ শ্যাম নাম

কানে দিয়া যেরূপ মূর্চ্ছিতা শ্রীমতীর চৈতন্য সম্পাদন করিতেন, তেমনি নাম-কীর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভুর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিতে হইয়াছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বৈষ্ণবীয় সাধন-রীতি

এই বৈষ্ণবীয় সাধন-রীতিই রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রাণ। রবীন্দ্রনাথ আদর্শের হিসাবে রমণী সাজিয়াই বিশ্বের চরম তত্ত্বকে তাঁহার চিরজনমের "জীবন-দেবতা" কল্পনা করিয়া, তাঁহারই অভিসারে বাহির হইয়াছেন। এই রাধা-ভাবই গীতাঞ্জলির অঞ্জলিত্ব সিদ্ধি করিয়াছে। গীতাঞ্জলির কবিতা-গুলিও বৈষ্ণব-পদাবলীর ন্যায়—সম্ভোগ, আত্ম-নিবেদন প্রভৃতি পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়া দেখান যাইতে পারে।

বৈষ্ণব-সাহিত্য ও Celtic Revival এর সাহিত্য

সম্প্রতি আয়ারল্যাণ্ডে প্রাচীন 'কেলটিক' ভাবধারার ভিত্তিতে এক নব সাহিত্যের গঠন চেষ্টা দেখা দিয়াছে। এই 'কেলটিক' ভাবধারা ও সাহিত্য-রীতি পারসিক সুফী ও বঙ্গীয় বৈষ্ণব-ভাবধারা ও সাহিত্য-রীতির অনুরূপ। বর্ত্তমানে ঈয়েট্‌স এই নব সাহিত্য সম্প্রদায়ের নেতা। এই সম্প্রদায়ের কবিগণই রবীন্দ্রনাথকে সর্ব্ব প্রথমে ইউরোপ খণ্ডে পরিচিত করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল ঈয়েটস "নোবেল" পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

বাঙ্গালার ভাবরাজ্যে নব-জাগরণ ও বৈষ্ণব-গীতির স্বাধীন ভাব

চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতকে বঙ্গদেশে এক নব জাগরণের সঞ্চার দেখা দিয়াছিল এবং এই নব ভাবের বন্যায় বাঙ্গালা ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির গীতি কবিতায় ও মালাধরের শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় প্রভৃতিতে যাহা কেবল আদর্শ ও তত্ত্বমাত্র ছিল, চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে তাহা

প্রাণের আবেগ ও প্রেমাশ্রু-ধারার সহিত মিশিয়া গেল। তারপর একই সঙ্গে, একই ভাবে, এক সুরে শত শত কবি কণ্ঠ ঢালিয়া দিল,—বাঙ্গালার বাণীকুঞ্জে একটী সুরেরই মূর্চ্ছনা সব সুরগুলিকে নীরব করিয়া ফেলিল, বাঙ্গালী সব ভুলিয়া তাহাতেই প্রাণ মন ডুবাইয়া দিল। এ যুগ বাঙ্গালার ইতিহাসে Renaissance এর যুগ; আর বাঙ্গালী জাতির অতি বড় সৌভাগ্য ও গৌরবের যুগ।

বৈষ্ণব-গীতির স্বাধীন ভাব ও পদাবলী-সাহিত্যের Romantic element সম্বন্ধে সমালোচক শশাঙ্কমোহন লিখিয়াছেন,—"এই কবিতা মনুষ্য-হৃদয়ের চিরকালের কবিতা। * * কবি ও ভক্ত পরস্পরের তত্ত্বে ওতপ্রোত ও আত্মবিস্মৃত হইয়া অপরূপ রসানন্দে বিলসিত হইয়াছে। * * তাঁহারা পূজা, প্রচার প্রভৃতি লৌকিক বা সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়াই গান করিয়াছেন; সুতরাং এই সঙ্গীতে ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতি-নির্দ্দেশের লক্ষণ মুখ্য হইতে পারে নাই; এবং উহা সাহিত্য হইবার অধিকার লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালী বৈষ্ণব-গীতি-কবিতার মধ্যেই সর্ব্ব প্রথম নীতি ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের কবল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, নির্ম্মল সাহিত্যালোকে উপনীত হইতে পারিয়াছিল।"

পরকীয়া ও তত্ত্ব-পদাবলী সাহিত্যে Romantic loveএর চিত্র

চণ্ডীদাস রাধার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন,—"কানুর পীরিতি জাতি কুল শীল ছাড়া" এরূপ সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দেওয়া প্রেম ভিন্ন ভক্ত ও ভগবান্ লাভে সমর্থ হন না। এই 'জাতি কুল শীল ছাড়া' ভাব নায়ক নায়িকার রূপক দ্বারা বিবৃত করিতে হইলে, আমাদের দেশে পরকীয়া নায়িকার কল্পনা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। আমাদের দেশের বিবাহিত জীবন ও দাম্পত্য প্রেমের আদর্শ খুবই উচ্চ সন্দেহ নাই। কিন্তু কবিত্বের দিক্ দিয়া বা Romance-

এর দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, উহা বড়ই একঘেয়ে। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক স্বকীয়া নায়িকা বলিতে বিবাহিতা পত্নী এবং পরকীয়া বলিতে অন্যের স্ত্রী বুঝায়। বৈষ্ণব-কবির রাধা পরকীয়া নায়িকা; তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী নহেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের দাম্পত্য প্রেম বর্ণ ও বৈচিত্র্য বিহীন। প্রজাপতি ঠাকুর এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে পরস্পরকে বাঁধিয়া দেন। তারপর স্বামী যতই কুৎসিত, কদাকার ও অযোগ্য হউক না কেন, আমাদের মেয়েরা তাহাকেই পরমার্থরূপে গ্রহণ করে। ইহার মধ্যে কোনও রূপ ঘাত প্রতিঘাত নাই, জোয়ার ভাঁটা নাই, উহা একান্তই একটানা ভাবে বহিয়া যায়। তাই আবেগ, বৈচিত্র্য ও বাধা-বিঘ্ন-পূর্ণ প্রেমের চিত্র আঁকিতে গেলে পরকীয়া নায়িকাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। এই জন্যই বৈষ্ণব-কবিগণ রাধাকে পরকীয়া-নায়িকা রূপে কল্পনা করিয়াছেন।

কিন্তু আমাদের দেশে এই পরকীয়া-প্রীতি অত্যন্ত বিপদপূর্ণ ও বিঘ্ন-সঙ্কুল। এদেশে কত প্রেমিক সারাজীবনের গোপন পূজা গোপনেই সমাপ্ত করিয়া গিয়াছে; তবুও হয়ত তাহার চির-বাঞ্ছিতা বা চিরারাধ্যাকে মুখের কথাটী বলিবারও সুযোগ পায় নাই। কখনও বা স্নানের ঘাটে, কখনও তীর্থ-যাত্রার ছলে উভয়ে এক স্থানে আসিয়া দূর হইতে শুধু একবার চোখের দেখা দেখিয়াই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। পরকীয়া-নায়িকা রাধার সাহচর্য্য-লাভ সহজ ব্যাপার নহে; কেননা তাহার ঘরে শ্বাশুড়ী ননদী বাদী, আর বাহিরে পাড়া প্রতিবেশী বৈরী। তাই রাধা যে পথ দিয়া স্নানের ঘাটে গিয়াছেন, সেই পথে গিয়া,—"প্রতি পদ-চিহ্ন চুম্বয়ে কান।" রাধিকা স্নান সমাপন করিয়া গেলে কানু সেই জলে নামিয়া,—"অঙ্গের জল পরশ লাগিয়া বাহু পশারিয়া ধায়!" রাধার কানু-অপবাদ শত মুখে রটিয়া গিয়াছে; লোক-গঞ্জনা রাধার পক্ষে এখন এত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, কালা তো দূরের কথা শ্রীমতী কালো দ্রব্যাদি পর্য্যন্ত ব্যবহার করা ত্যাগ করিয়াছেন। এমত অবস্থায় রাধিকার দর্শন ও স্পর্শ লাভের উপায় নাই দেখিয়া, কানু

এক অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। রাই যে ধোপার বাড়ীতে কাপড় কাচিতে দেন, শ্যাম তাঁহার কাপড়গুলি সেখানে দিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্যামের বসনগুলি শ্রীমতীর বসনের স্পর্শ পাইবে, তাহা পরিধান করিয়াই কানু শ্রীমতীর স্পর্শ-সুখ অনুভব করিবেন। ইহা আমাদিগকে বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ গায়কের,—

"ভোরের বাতাস, কোথা চলে যাস, যাস বধূয়ার দেশে।
উড়িয়ে আনিস, কস্তূরী বাস, মাখা বধূয়ার কেশে।
পশিতে সে ঘরে, যদি না পারিস, সেই সে ঘরের ধূলো এনে দিস্।
সেই সে ধুলোর কাজল করিয়া, নয়নে পরিব হেসে।"

গানটী স্মরণ করাইয়া দেয়। আমাদের সমাজ অবাধ প্রণয়ের একটুও সুযোগ দেয় নাই, শাসনের লৌহ-শৃঙ্খলে অষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিয়াছে। এত বাঁধনের মধ্যে প্রস্ফুটিত হওয়াতেই আমাদের পদাবলী-সাহিত্যে বর্ণিত স্বাধীন প্রেমের চিত্র যেরূপ আলোক ও সৌরভে পূর্ণ সেরূপ জগতের আর কোনও দেশের সাহিত্যেই নহে।

পদাবলীতে ভাবাবেশ ও নায়ক-নায়িকার শ্রেণী-বিভাগ

পদাবলীতে প্রেমের বিভিন্ন পর্য্যায়ের শ্রেণী বিভাগগুলি মনোবিজ্ঞানের পাঠকগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বৈষ্ণব পদাবলী ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন খণ্ড কবিতা নহে। এক একটী বিশিষ্ট রস বা ভাবাবেশ অবলম্বনেই উহা রচিত।

পূর্ব্বরাগ :—প্রেমাসক্তির প্রথম অবস্থা "পূর্ব্বরাগ" নামে অভিহিত। "সঙ্গ নহে রাগ জন্মে কহি পূর্ব্বরাগ।" এই পূর্ব্বরাগ নায়কে প্রথম প্রকাশ পাইলেও নায়িকার পূর্ব্বরাগই প্রথমে বর্ণনা করিবার রীতি আছে।

প্রেম-বৈচিত্ত্য :—প্রেমাসক্তির পর নায়িকা তদ্গত মন প্রাণ হইয়া পড়েন। দিন রাত কেবল নায়কের রূপ ও গুণ-চিন্তা নায়িকার চিত্ত অধিকার করিয়া বসে। নায়ককে কোথায় রাখিয়া তৃপ্ত হইব, কি বলিয়া আত্মনিবেদন করিয়া সাধ মিটাইব, তাহা নায়িকা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন না। শ্রীমতী এই অবস্থায় কৃষ্ণ-ভ্রমে তমাল-তরু আলিঙ্গন করিয়াছেন,

মেঘ দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন এবং শ্যামের কোলে থাকিয়াও শ্যাম-বিরহে কাঁদিয়া অধীর হইয়াছেন।

অভিসার ঃ—নায়কের দর্শন-অভিলাষে নানাবেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া সংকেত স্থানে নায়িকার গমনকে অভিসার বলে। এই অভিসার বিভিন্ন প্রকারের আছে—

"সেই অভিসার হয় অষ্ট প্রকার।
জ্যোৎস্নী তামসী বর্ষা দিবা অভিসার॥
কুজ্ঝাটিকা তীর্থযাত্রা উন্মত্তাসঞ্চরা।
গীতবাদ্য শাস্ত্রে সর্ব্বজনোৎ করা॥"

মান ঃ—মান প্রধানতঃ দুই প্রকার যথা, কারণ মান ও নির্হেতু মান। নায়ক অন্যের প্রতি সমাকৃষ্ট জানিলে নায়িকার যে অভিমান হয় তাহা কারণমান নামে অভিহিত। এই কারণমান সহজে ভঙ্গ হইবার নহে। এতভিন্ন অন্যান্য কারণে যে মানের সঞ্চার হয়, তাহা নির্হেতুমান নামে অভিহিত। পদাবলীতে শুকবাক্যে মান, বংশীধ্বনি শ্রবণে মান, স্বপ্নদৃষ্টে মান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার মানের বর্ণনা পওয়া যায়।

ভাবসম্মেলন ঃ—এই ভাবসম্মেলন বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাদিগের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ইহাই বৈষ্ণব-কবির প্রেম-সাধনার চরম সিদ্ধি। কৃষ্ণ মথুরা হইতে আর ফিরেন নাই, কিন্তু শ্রীমতী শয়নে, স্বপনে, নিদ্রায় জাগরণে সতত কানুর চিন্তা করিতে করিতে নিজেই কানুময় হইয়া উঠিয়াছেন। তাই বিদ্যাপতি বলিতেছেন,—"অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মধাই।" ইহা আমাদের সেই "সোহহং" তত্ত্বেরই অনুরূপ।

নায়িকার শ্রেণীবিভাগ

অলঙ্কার শাস্ত্রে ৩৬০ প্রকার নায়িকার বর্ণনা আছে। বর্ত্তমানে আমরা মোটামুটি ৮ প্রকারের উল্লেখ করিব। অষ্টনায়িকা প্রকরণ যথা,—

অত্রাভিসারিকা বাসসজ্জা চোৎকণ্ঠিতা তথা,।
খণ্ডিতা বিপ্রলব্ধা চ কলহান্তরিতাপি চ।
প্রোষিত প্রেয়সী ভার্য্যা তথা স্বাধীনভর্ত্তৃকা।

অভিসারিকা ঃ—"কান্তার্থিনী তু যা যাতি সঙ্কেতং সাভিসারিকা।" বিভিন্ন প্রকার অভিসারের উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি।

উৎকণ্ঠিতা নায়িকার লক্ষণ—

"উৎকণ্ঠিতা কান্ত পথ করে নিরীক্ষণ।
কতক্ষণে হইবেক নায়ক মিলন॥"

এই উৎকণ্ঠিতার আবার ৮ প্রকার শ্রেণী-বিভাগ আছে। যথা, উন্মত্তা, বিকলা, স্তব্ধা, চকিতা, অচেতনা, সুখোৎকণ্ঠা, প্রগল্‌ভা, ও নির্ব্বন্ধা।

বাসকসজ্জা :—

"নায়ক আসিবে বলি মনেতে উল্লাস।
তাম্বুল পুষ্পের মালা সজ্জার বিলাস॥
নানাভূষা করি রহে সখীর সহিতে।
বাসক-সজ্জায় রহে উৎকণ্ঠিত চিতে।"

এই বাসকসজ্জায় নায়িকাও ৮ ভাগে বিভক্ত। যথা মোহিনী, জাগর্ত্তিকা, রোদিতা, মধ্যোক্তিকা, প্রগল্‌ভা, সুপ্তিকা, সুরসা, ও উদ্দেশা।

বিপ্রলব্ধা :—পূর্ব্বোক্ত অভিসারিকা বা বাসকসজ্জা লক্ষণের নায়িকার প্রিয়দর্শন না ঘটিলে যেরূপ অবস্থা হয় তাহার নাম বিপ্রলব্ধা। বিপ্রলব্ধা নায়িকা নির্ব্বন্ধা, প্রেমোন্মত্তা, ক্লেশা, বিনীতা, নির্দ্দয়া, প্রখরা, দূত্যাদরী ও চর্চ্চিতা এই ৮ ভাগে বিভক্ত।

খণ্ডিতার লক্ষণ :—

"সকল রজনী ধনি কাঁদিয়া পোহায়।
প্রভাতে নায়ক আইসে তাহার সভায়॥
অন্য নারীর ভোগ চিহ্ন তার কলেবরে।
খণ্ডিতা যে কোপ করে সেই নায়কেরে॥"

কলহান্তরিতা :—

কলহান্তরিতা মানে হইয়া বিমুখ।
কান্ত ব্যগ্রতা করে হইয়া সম্মুখ॥
চরণে ধরিয়া কান্ত পড়ে ভূমিতলে।
কোপ করি নিঠুর কথা অপমান করে॥
বিমুখ হইয়া কান্ত নিজ ঘরে যায়।
পিছে অনুতাপ করে বিফল হয় তাই॥"

চণ্ডীদাস

"এই গীতি-কবিতাগুলি আমরা জগতের সর্ব্বত্র সাহিত্য-প্রদর্শনীতে লইয়া দেখাইতে পারি ;—আত্ম-গরিমার রাজ্যের অধিবাসি-বৃন্দকে আত্ম-বিসর্জ্জনের কথা শুনাইয়া মুগ্ধ করিতে পারি।"

চণ্ডীদাসের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা

বড়ই দুঃখের বিষয় যে চণ্ডীদাসের মত মহাজন ব্যক্তিরও জন্ম-সময় ঠিক জানা যায় না। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ১৪শ শতকের শেষভাগ এবং "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন"-সম্পাদক বসন্ত বাবু ১৪শ শতকের প্রথম ভাগ চণ্ডীদাসের জন্ম-সময় বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের রচিত নিম্নোক্ত,

"বিধুর নিকটে নেত্র পক্ষ পঞ্চবাণ।
নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরমাণ॥
পরিচয় সংকেত অঙ্কে নির্জ্জা।
চণ্ডীদাস রস কৌতুক কির্জ্জা।

সাঙ্কেতিক পদটী হইতে রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় ১৩২৫ শক চণ্ডীদাসের আবির্ভাব-কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সাঙ্কেতিক পদটীতে যে কিসের সময় সঙ্কেত রহিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই।

চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার অন্তর্গত শাকুলিপুর থানার অধীন নান্নুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। চণ্ডীদাসের পিতা নান্নুরের "বাসুলী" দেবীর পূজক ছিলেন। এই বাসুলী দেবী এখনও নান্নুরে আছেন এবং এখনও নিয়মিত ভাবে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। বোধ হয় এই "বাসুলী" দেবীর অনুগ্রহে পুত্র লাভ করায় কবির পিতামাতা পুত্রের নাম চণ্ডীদাস রাখিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর চণ্ডীদাসই দেবীর পূজারী নিযুক্ত হন। এই মন্দিরের সেবিকা, রামী বা রামমণি তাঁহার হৃদয়ের অপার্থিব প্রেমভাব উদ্রেক করিয়াছিল।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতিব সমসাময়িক ছিলেন। শুভ বসন্তকালে গঙ্গাতীরে দুই মহা কবির সম্মেলন হইয়াছিল। এই মিলন সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ পদ-কল্পতরু গ্রন্থে তিনটী পদ পাওয়া যায়। উহাতে আছে,—

১। "চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তব চণ্ডীদাস গুণ শুনইতে বাঢ়ল রাগ॥
দুহুঁ উতকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপ-নারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল॥"

২। "সময় বসন্ত যাম দিন মাঝহি বটতলে সুরধুনী তীর।
চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল পুলক কলেবর গীর॥"

বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয় ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১ম সংখ্যার "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়" একটী প্রবন্ধে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, উক্ত পদ কয়টী বাসুলী-সেবক বড়ু চণ্ডীদাসের সহিত মিথিলার বিদ্যাপতির মিলন-বিষয়ক নহে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, শ্রীখণ্ড-বাসী কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির সহিত নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য দীন চণ্ডীদাসের মিলন-বিষয়ক। আর এই রূপনারায়ণও মিথিলার শিবসিংহ রূপ-নারায়ণ নহেন। পক্কপল্লীর রাজা নরসিংহ নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন, এই রূপনারায়ণ তাঁহারই সভাপণ্ডিত।

একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব

পদাবলী সাহিত্যের অনুশীলন করিতে করিতে বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত, স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় এম্, এ, মহাশয় প্রমুখ বিশিষ্ট সুধীগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, প্রচলিত চণ্ডীদাসী পদের সব গুলিই মহাকবি চণ্ডীদাসের রচিত নহে। কি উপায়ে খাঁটী চণ্ডীদাসী পদগুলি বাছাই করা যায়, তাহার কতকগুলি সূত্র নির্দ্দেশ করিয়া সতীশ বাবু ১৩২০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ

পত্রিকায় "প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ" শীর্ষক একটী গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহার অব্যবহিত পরে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় "শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড" নামক পুঁথির আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন যে, এরূপ অপকৃষ্ট রচনা কোনও মতেই কবি-শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। এই সময় হইতেই বিভিন্ন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতে থাকে। তৎপর শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্ত রঞ্জন রায় মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" প্রকাশিত হইবার পর হইতেই এই সমস্যা আরও গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্, এ, মহাশয় "দীন চণ্ডীদাস"-রচিত দুইখানি পদাবলীর পুঁথি আবিষ্কার করিয়া বড়ু চণ্ডীদাস হইতে দীন চণ্ডীদাসের স্বতন্ত্রতা প্রমাণিত করিয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র রায় মহাশয় "প্রবাসী" পত্রে "ছাতনায় চণ্ডীদাস" শীর্ষক প্রবন্ধে বাঁকুড়া জেলার ছাতনা নামক স্থানে বিভিন্ন দুই সময়ে দুই জন বাসুলী-সেবক চণ্ডীদাস ছিলেন প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। ইঁহাদের একজন চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে, আর একজন তাঁহারই সমসময়ে বিদ্যমান ছিলেন। অনেকে চণ্ডীদাসের পদের "দ্বিজ চণ্ডীদাস" ভণিতাযুক্ত পদগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের নহে এইরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন

পূর্ব্বে আমরা প্রসঙ্গান্তরে উল্লেখ করিয়াছি যে, চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" নামধেয় পুঁথি খানি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এবং তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুঁথিখানি প্রকাশিত হইবার পর হইতেই সাহিত্যিক মহলে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। গ্রন্থ খানির রচনা চণ্ডীদাসের রচনার অনুপাতে এত নিকৃষ্ট এবং ইহার রস ও ভাবধারা প্রচলিত

বৈষ্ণব-পদাবলী হইতে এত পৃথক্ যে, অনেক সাহিত্য-সেবীই ইহাকে চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে একান্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়েন। আবার অনেকে ইহার প্রতি এতদূর সমাকৃষ্ট হইয়াছেন যে, ইহাই চণ্ডীদাসের প্রকৃত রচনা এবং চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদগুলিই জাল এরূপ সিদ্ধান্তেও উপনীত হইয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থের আবিষ্কর্ত্তা ও সম্পাদক অধ্যাপক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গবেষণা দ্বারা পুঁথি খানির অকৃত্রিমতা, ভাষার প্রাচীনতা এবং ইহার ভাব ও রস-ধারা যে চৈতন্য মহা-প্রভুর প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বের তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পুঁথি খানি যে বাসুলী-সেবক, কবি-শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসেরই রচিত ইহাই তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস। চণ্ডীদাসের পদাবলী পড়িয়া "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন"কে তাঁহারই অমর লেখনী-প্রসূত বলিয়া গ্রহণ করিতে সাধারণের মনে যে দ্বিধা আসে, তাহা দূরীভূত করিবার জন্য তিনি লিখিয়াছেন, "কৃষ্ণ-কীর্ত্তন কবির প্রথম বয়সের রচনা মনে করা যাইতে পারে।" এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীপদকল্পতরু গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৯০ পৃষ্ঠাতে বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে একজন প্রবল শক্তিশালী কবির পরিণত বয়সের নিপুণ হস্তেরই পরিচয় পাওয়া যায়, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের একটা ঘটনার বর্ণনাত্মক পদ কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত ভাবে চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে পাওয়া গেলেও কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অন্য কোনও পদেই সেরূপ রূপান্তর দেখা যায় না ; সুতরাং কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পদাবলী ক্রমশঃই পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীর আকার ধারণা করিয়াছে বলিয়া অনুমান করার বিশিষ্ট হেতু নাই ; কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের আখ্যান-বস্তু ও রসের ধারার সহিত প্রচলিত পদাবলীর এতই গুরুতর প্রভেদ যে, ঐ সকল একই কবির যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের রচনা বলিয়া কোনও রূপে অনুমান করা যাইতে পারে না।" এই পুঁথির লিপি ও ভাষা যে প্রাচীন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তবে উহা বৈষ্ণব-সাহিত্যের আদি এবং শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাসের রচিত কিনা তাহার আলোচনার

ভার সুধীগণের উপর অর্পণ করিয়া, আমরা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বিভিন্ন মতামতের উল্লেখ করিয়া আমাদের কর্ত্তব্য সমাধা করিলাম।

চণ্ডীদাসের পদাবলী

চণ্ডীদাস যে পদাবলী-সাহিত্যের সম্রাট্ তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তাঁহার অপূর্ব্ব সুধা-বর্ষিণী গীতি-রত্ন-মালা জগতের গীতি-সাহিত্যে বাঙ্গালী কবি-প্রতিভার একটী বিশিষ্ট দান। চণ্ডীদাসের গীতি-কবিতাতে বৈষ্ণবের রাধা-ভাবের যেরূপ চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, পদাবলী-সাহিত্যের আর কোথায়ও সেরূপ নহে। আবার বাস্তব প্রেম ও মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও উহা বিশ্ব-সাহিত্যে অনুপম বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

পদাবলী-সাহিত্যে অনেক স্থলেই বাহিরের বেশী জাঁক-জমকে ভিতরের তত্ত্ববস্তুটী অনেকখানি চাপা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে; কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রতি স্থলে, প্রতি রস-পর্য্যায়ে উচ্চতম প্রেমজগতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। চণ্ডীদাসের রাধা প্রেম-পূজারিণী বেশে চোখভরা অশ্রুজল লইয়াই আমাদিগকে দেখা দিয়াছেন। বিদ্যাপতির বিলাস-কলাময়ী রাধিকা মাথুরের অশ্রু-সায়রে স্নাত হইয়া, কবিগুরু গেটে-কথিত শকুন্তলার ন্যায় মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে পরিণতি লাভ করিয়াছেন; কিন্তু যে আত্ম-বিসর্জ্জন, স্বাধিকারের বিলোপ ও ব্যক্তিত্ব-বিস্মৃতির ভাব চণ্ডীদাসের রাধিকার বৈশিষ্ট্য ও জীবন-সর্ব্বস্ব তাহার নিদর্শন পূর্ব্বরাগ হইতেই মিলে। পূর্ব্বরাগের সূচনা হইতেই চণ্ডীদাসের রাধার যোগিনীর বেশ ও অশ্রু-সজল নয়ন।

"যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া ঘরে এল বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ধেয়ায় শ্যামরূপ খানি॥
নিজ করোপর রাখিয়া কপোল মহাযোগিনীর পারা।
ও দুটী নয়নে বহিছে সঘনে শ্রাবণ মেঘেরি ধারা।"

এই দু'নয়নের শ্রাবণ মেঘের ধারা আমাদিগকে চৈতন্যদেবের সেই স্বর্গীয় প্রেমাশ্রু-বর্ষণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহা পড়িয়া রাধামোহন ঠাকুরের পদে বর্ণিত গৌরহরির সেই,—

"ঘামহি ভীগল সকল কলেবর বিবরণ দীশই কাঁতি।
নয়নক নীরহি সিঁচতু ভূতল সাঙন মেঘক ভাতি॥"

মূর্ত্তিটীই মনে পড়ে।

"না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম-পরতাপে যার ঐছন করল গো অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে হেরিয়া গো যুবতী-ধরম কৈছে রয়॥"

শ্রীমতী শ্যামবঁধুর নাম শুনিয়াই তাঁহার প্রতি সমাকৃষ্ট,—নাম মধুময়, বদন তাহা কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। এইরূপ নাম শুনিয়া প্রেমাসক্তির কথা মানবীয় প্রেমের সাহিত্যে মিলে না; কিন্তু নাম জপ করিতে করিতেই চণ্ডীদাসের রাধিকার অঙ্গ অবশ হইয়া আসিতেছে। "যেখানে বসতি তার নয়নে হেরিয়া গো যুবতী-ধরম কৈছে রয়।" শ্রীমতী শ্যামসুন্দরের প্রতি সমাকৃষ্ট হইয়া, কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার অভিসারে বাহির হইতে ব্যগ্র; সেই পরম-পুরুষের জন্য যখন আমাদের মনপ্রাণ উন্মুখ হইয়া উঠে, তখন আমরাও অমনি করিয়া সংসারের বন্ধন ছিঁড়িয়া বাহির হইতে উদ্যত হই।

চণ্ডীদাসের সম্ভোগ-মিলনের পদেও যে আধ্যাত্মিক-তত্ত্বের সমাবেশ দেখা যায়, তাহার তুলনা বিরল। একই সময়ে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য, ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের এরূপ অপূর্ব্ব সমাবেশ খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। রাধিকা এখন আর দেহের মিলন অভিলাষিণী নহেন; অন্তর্জ্জগতের মিলনের জন্যই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন। তাই দেখি,—"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া॥" রাই শ্যামের কোলে থাকিয়াও অতল-স্পর্শী বিরহ-যন্ত্রণায় অস্থির।

চণ্ডীদাসের ভাব-সম্মেলনের পদগুলি বিশ্ব-সাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ। এগুলি যেন ধর্ম্ম-মন্দিরের বেদী হইতে পঠিত হইবার জন্যই লিখিত হইয়াছে। আত্মদান, স্বাধিকারের বিলোপ ও ব্যক্তিত্ব-বিসর্জ্জনের এরূপ দৃষ্টান্ত আর নাই। চণ্ডীদাসের ভাব-সম্মিলনের রাধা জগতের কাব্য-সাহিত্যে অতুলনীয়া। ভাব-সম্মিলনের পদগুলি আর টীকা-টিপ্পনীর সাহায্যে বুঝাইবার জিনিস নহে; শুধু হৃদয় দিয়াই এই অপূর্ব্ব রসামৃত আস্বাদন করা যায় এবং ইহা কেবলমাত্র ভাবুক, ভক্ত ও রসিক-সুজন-বেদ্য।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি প্রেমাহ্লাদ বর্ণনায় কৃতার্থ, উপমা ও পরিহাস রসিকতায় সিদ্ধহস্ত; কিন্তু ভাবের গভীরতা ও আবেগের মাহাত্ম্যে চণ্ডীদাস অতুলনীয়। বিদ্যাপতিকে টীকা-টিপ্পনী দ্বারা আয়ত্ত করা যাইতে পারে; কিন্তু চণ্ডীদাসকে কেবলমাত্র হৃদয় দিয়াই আস্বাদন করা যায়। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া, কবি-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—"আমাদের চণ্ডীদাস সহজ ভাষায় সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি একছত্র লেখেন ও দশছত্র পাঠকদের দিয়া লেখাইয়া লন। * * বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় ও দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে, মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ, কিন্তু চণ্ডীদাসের হৃদয় আরও গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরও অধিক জানেন। চণ্ডীদাসের কথা এই যে প্রেমে দুঃখ আছে বলিয়া প্রেম ত্যাগ করিবার

নহে, প্রেমের যা কিছু সুখ সমস্তই দুঃখের যন্ত্রে নিংড়াইয়া বাহির করিতে হয়।” বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন,—“চণ্ডীদাস মনোরাজ্যের পরিদর্শক, বিদ্যাপতি বহির্জগতের চিত্রকর। একজন ভাবুক অপর দার্শনিক।” ভাবের মহত্ত্ব, আবেগের গভীরতা প্রভৃতির দিক্ দিয়া বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সমকক্ষ না হইলেও তাঁহার “সখিরে কি পুছসি অনুভব মোয়।”, “কি কহব রে সখি আনন্দ ওর”, “মাধব বহুত মিনতি করি তোয়” প্রভৃতি পদগুলি প্রেমিক ও ভক্তের চির আদরের ধন। তাঁহার “এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর” প্রভৃতি পদ সম্বন্ধে সুধী সমালোচক স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—“বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির যে অপূর্ব্ব মণি-কাঞ্চন যোগ সংঘটিত হইয়াছে, উহার তুলনা-স্থল বিশ্ব-সাহিত্যেও বড় অধিক মিলে না।” বিদ্যাপতির পদ-লালিত্য ও শব্দচিত্র অঙ্কনে (pen-picture) নিপুণতা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সুধী-সমালোচক বলেন, “কৌতূহলী রসজ্ঞ পাঠক বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি বর্ণনার * * * পদগুলি পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে, কবি “নবোঢ়া” নায়িকার বিলাস-বিভ্রমের উৎকৃষ্ট আলোক-চিত্রবৎ অল্প কথায় যে শব্দ-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, এ শ্রেণীর রচনায় তাহার তুলনা নাই বলিলেও বলা যাইতে পারে।”

বিদ্যাপতি

পদাবলী-সাহিত্যের অমর কবি বিদ্যাপতি বিহার প্রদেশের দ্বারভাঙ্গা জেলার মধুবাণী মহকুমার “বিসফী” নামক স্থানে ব্রাহ্মণবংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। চণ্ডীদাসের ন্যায় বিদ্যাপতিরও জন্ম-সময় নিরূপণ করা সুকঠিন। বর্ত্তমানে তাঁহার বংশধরগণের নিকট রক্ষিত মহারাজ শিবসিংহ কর্ত্তৃক “বিসফী” গ্রাম দানের তাম্রফলক হইতে জানা যায় যে,—১৪০০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাপতি উহা পূর্ব্বোক্ত রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত-প্রবর গ্রীয়ার্সন ও স্বর্গীয় কাব্য-বিশারদ মহাশয়ের মতে ১৪৪৬ খৃঃ অব্দে

শিবসিংহের রাজ্য-প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু সুধী-সমালোচক স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় এই মত সমীচীন মনে করেন নাই। কেন না বিদ্যাপতির একটী প্রসিদ্ধ মৈথিলী পদ হইতে নির্দ্ধারিত করা যায় যে, ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে অর্থাৎ ১৪০০ খৃষ্টাব্দে শিবসিংহ রাজ-সিংহাসনে সমাসীন হন। সতীশ বাবু আন্দাজ ১৩৮০ খৃষ্টাব্দ বিদ্যাপতির জন্ম-সময় বলিয়া অনুমান করেন। "পদ-সমুদ্র" নামক সুবৃহৎ পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে বিদ্যাপতির আত্ম-পরিচয় জ্ঞাপক একটী পদ আছে। উহাতে বিদ্যাপতির নিম্নোক্ত আত্ম-বিবরণী পাওয়া যায়ঃ—

"জন্মদাতা মোর গণপতি ঠাকুর মৈথিল দেশে করু বাস।
পঞ্চগৌড়াধিপ শিবসিংহ ভূপ কৃপা করি লেউ নিজ পাস॥
বিসফী গ্রাম দান করল মুঝে রহ তহি রাজ সন্নিধান।
লছিমাচরণ ধ্যানে কবিতা নিকশয়ে বিদ্যাপতি হই ভাণ॥"

পদাবলী ব্যতীত বিদ্যাপতির রচিত "কীর্ত্তিলতা", "পুরুষ-পরীক্ষা", "লিখনাবলী", "শৈবসর্ব্বস্বসার", "গয়াপত্তন", "দুর্গা-ভক্তি-তরঙ্গিণী" প্রভৃতি গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিতপ্রবর গ্রীয়ার্সন, স্বর্গগত জগদ্বন্ধু ভদ্র, স্বর্গীয় সারদা-চরণ মিত্র, স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট সুধীগণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ ঐ সকল আলোচনা পাঠ করিতে পারেন। সম্প্রতি পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিদ্যাপতির একটী নূতন সংস্করণ বাহির করিতেছেন। আমরা আশা করিতে পারি যে, উহাতে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে অনেক নূতন আলোকের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

বিদ্যাপতি সম্বন্ধীয় সমস্যা

বর্ত্তমানে বিভিন্ন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বের ন্যায় বিভিন্ন বিদ্যাপতির অস্তিত্ব-স্বীকারও অপরিহার্য্য হইয়া পড়িতেছে। পদকল্পতরু প্রভৃতি পদ-সংগ্রহ

গ্রন্থে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত অনেকগুলি পদ খাঁটী বাঙ্গালা মিশ্রিত ব্রজবুলিতে পাওয়া যায়। উহার কয়েকটী পদ কবি চম্পতির রচিত। এই কবি চম্পতির পদে "বিদ্যাপতি কবি চম্পতিভাণ" এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই "চম্পতি" যে বিদ্যাপতিরই নামান্তর তাহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই মত যে সমীচীন নহে তাহা স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত শ্রীশ্রীপদকল্পতরু গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে আমরা শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয়ের "চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন" শীর্ষক প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়াছি। উহাতে জানা যাইতেছে যে, বীরভূম প্রদেশে "বিদ্যাপতি" নাম বা উপাধিধারী একজন প্রাচীন বৈষ্ণব-পদকর্ত্তার উদ্ভব হইয়াছিল। অধুনা মিথিলার বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত পদাবলীর কতকগুলি পদ ইঁহারই রচিত। এই বিদ্যাপতির "কবিরঞ্জন" উপাধি ছিল। ইঁহার সহিতই শুভ বসন্তকালে গঙ্গাতীরে দীন চণ্ডীদাসের মিলন হয়।

বিদ্যাপতির পদাবলী

বিদ্যাপতি স্বভাবকবি ছিলেন। ভগবৎ-কৃপায় কবিত্বের সহিত পাণ্ডিত্যের সংমিশ্রণ হওয়ায় মণি-কাঞ্চনের অপূর্ব্ব সংযোগ ঘটিয়াছিল। উপমা-নৈপুণ্যে বিদ্যাপতি বৈষ্ণব-সাহিত্যে অতুলনীয়। এই দিক্ দিয়া মহাকবি কালিদাসের পরেই তাঁহার স্থান-নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সৌন্দর্য্যের অবিকল শব্দ-চিত্র অঙ্কন মহাকবি বিদ্যাপতির একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁহার চিত্রিত রাধার বয়ঃসন্ধির শব্দ-চিত্র (pen-picture) খানি দেখিলে মনে হয়, কবি যেন সুন্দরীর বিভিন্ন সৌন্দর্য্য ভঙ্গীর কতকগুলি ফটোগ্রাফ তুলিয়া রাখিয়াছেন। বিদ্যাপতির "রাধিকা সৌন্দর্য্য-রাজ্যের রাণী। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন—

"Vidyapati's Radha is a special creation of beauty, she is a dream seen in the flesh." বিদ্যাপতির এই সৌন্দর্য্য-সম্রাজ্ঞী বিরহের অশ্রুতে স্নাত হইয়া, চির-বাঞ্ছিতের বিরহ-বেদনায়, বেশ-বিন্যাস ও বিভ্রম-বিলাস 'যামুন সলিলে ডারি' দিয়া প্রেম-তপস্বিনী সাজিয়াছেন। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে বলা যাইতে পারে,—**"Vidyapati moves all day in the sunny groves and floral meadows of the earth but in the evening rises high and overtakes his fellow-poet." (Chandidas)** তাঁহার "মাধব হাম পরিণাম নিরাশা", "তাতল সৈকতে বারি বিন্দু সম সুতমিত রমণী-সমাজে," এবং "অনুক্ষণ মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মধাই" প্রভৃতি পদগুলি বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

বিদ্যাপতির উপর বাঙ্গালীর দাবী

আমরা দেখিতে পাইলাম যে বিদ্যাপতি মৈথিলী কবি, বাঙ্গালী নহেন। তিনি মৈথিলী ভাষাতেই তাঁহার অমর পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে মিথিলা বিদ্যা-চর্চ্চার একটী প্রধান কেন্দ্র ছিল, বহু বাঙ্গালী বিদ্যার্থী এই সময়ে মিথিলায় গমনাগমন ও অবস্থান করিতেন। এই সকল বিদ্যার্থীর দ্বারাই বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণের প্রেম-গীতি সমূহ বঙ্গদেশে সমানীত হইয়াছিল। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, মিথিলা অপেক্ষা বঙ্গদেশেই বিদ্যাপতি সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর বহুদিনের প্রেম-পিপাসা ও বিরহের অশ্রুধারার সহিত তাঁহার গীতিগুলি বিজড়িত হইয়া গিয়াছে।

কাব্যেতিহাসের সূত্রপাত-শাখা

বর্ত্তমানে বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের চেষ্টায় বহু সংখ্যক কুলজী গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কুলজী গ্রন্থগুলি বাঙ্গালার

সামাজিক ইতিহাস-রচনার অমূল্য উপাদান। ইহাদের মধ্যে দেবীবর ঘটক-কৃত মেলবন্ধ, বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত কুলার্ণব, দনুজারি মিশ্র-প্রণীত মেল-রহস্য, নুলো পঞ্চানন-কৃত গোষ্ঠীকথা প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল কুলজী গ্রন্থ পাঠে জানা যায় বর্ত্তমানে আচার জিনিসটা যতই প্রাণ-হীন হউক না কেন, ঐ সময়ে বিকৃত বৌদ্ধ মত ও তান্ত্রিক প্রভাবের ফলে শিথিল বঙ্গসমাজে শৃঙ্খলা-স্থাপন জন্য ইহার সবিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। তাই কৌলিন্য-প্রথা প্রবর্ত্তনের সময় বল্লাল সেন সর্ব্বাগ্রে এই আচারের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কুলীনগণ যেরূপে অজস্র বিপদ ও নানা প্রকার প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া কুল মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

বাঙ্গালা রাজমালা

১৪০৭ হইতে ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের সময় রাজমালা বাঙ্গালা পদ্যে রচিত হইতে থাকে। এই রাজমালার সারমর্ম্ম এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্নালে একবার ১৯শ ভাগে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই সময়ে রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ও শিল্প-বাণিজ্য

এই সময়ে বাঙ্গালীরা মাথায় দীর্ঘকেশ রাখিত। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কাঁচুলি ব্যবহার করিবার রীতি ছিল। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের রমণীদিগের মধ্যে বেশভূষার পার্থক্য ছিল। অনেক বাল-বিধবা সিন্দূরের পরিবর্ত্তে আবিরের ফোঁটা পরিতেন।

এই সময়ের শিল্পজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছেন, —"এই সময়ে শিল্পজাত দ্রব্যের উন্নতি খুব বেশী হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। উৎকৃষ্ট ঢাকাই সাড়ী এই সময়ের আরও ২০০ বৎসর পরের সামগ্রী।"

পূর্ব্ববঙ্গের পাটের পাছড়ার বিশেষ আদর ছিল। এই সময়ে ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য-বিদ্যার অবনতি ঘটিয়াছিল মনে হয়। কেননা, সুগঠিত হর্ম্ম্য ও প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি কেবল বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত বলিয়া কল্পিত হইত। এই সময়ে বিনিময় রীতিদ্বারা বাণিজ্য-কার্য্য নির্ব্বাহ হইত।

বঙ্গসাহিত্যের চৈতন্য-যুগ

চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলা

"নীরদ নয়ানে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকসিত ভাব কদম্ব॥
কি পেখলুঁ নটরর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর॥"

অভিব্যক্তিই সৃষ্টির রীতি। এই জগৎ যাহা আজ বিরাট্ ও রূপ-রস গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-বিশিষ্ট—একদিন উহা সূক্ষ্ম ভাবময় ছিল। সৃষ্টি-কর্ত্তার চেষ্টা ও তপস্যা-বলে ক্রমবিকাশের পথে বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী বহুকাল ধরিয়া প্রেম স্বরূপ ভগবানের আরাধনা করিয়া আসিতেছিল। তাই প্রথমতঃ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গীতি-কবিতাতে সেই অখণ্ড প্রেমতত্ত্বের সন্ধান এবং পরে উত্তরোত্তর সাধনার ফলে সাক্ষাৎ মানব-মূর্ত্তি-রূপে উহার প্রাপ্তি-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যদেব বাঙ্গালীর একনিষ্ঠ প্রেম-সাধন-তরুর অমৃতময় ফল।

শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশ ও বৈষ্ণব-পদাবলীর সার্থকতা

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিতে যাহা কেবল কবির কল্পনা ছিল, চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে তাহা বাস্তবে পরিণত হইল। সমালোচক শশাঙ্কমোহন যথার্থই বলিয়াছেন,—"ইঁহাদের (বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস) অব্যবহিত পরে বাঙ্গালায় যে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল তিনি বৈষ্ণব-আত্মার শরীরী মূর্ত্তি, এই উভয় কবিহৃদয়ের সংযুক্ত মহান্ সংস্করণ মাত্র,—ইঁহাদের পদাবলীই তাঁহার প্রধান সাধনোপায় ছিল, তিনি এই উভয় কবির ভাব স্বধর্ম্মে নিজের জীবনের বিকাশ সাধন করিয়া, তাহাকে বিশ্বপূজ্যরূপে দেদীপ্যমান করিয়া বাঙ্গালীর সমক্ষে ধরিয়াছেন।" পদাবলীর রাধিকার ভাবাবেশগুলি চৈতন্যদেবে জীবন্তভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে,—"গৌরহরি শ্রীমদ্ভাগবত ও বৈষ্ণব-গীতি-সমূহের সত্যতা প্রমাণিত করিষাছেন,—দেখাইয়াছেন, এই বিরাট্ শাস্ত্র ভক্তির ভিত্তিতে, নয়নের অশ্রুতে, চিত্তের প্রীতিতে দণ্ডায়মান। এই শাস্ত্রের শোভা-স্বরূপ পূর্ব্বরাগ, বিরহ, সম্ভোগ-মিলন ইত্যাদি যে সব লীলা রসের ধারা ছুটিয়াছে, তাহা কল্পিত নহে, তাহা আস্বাদযোগ্য ও আস্বাদিত হইয়াছে। প্রেমের আশ্চর্য্য স্ফূর্ত্তিতে শ্রীগৌরের দেহ কদম্বপ্রায় হইয়াছে, চটকপর্ব্বত গোবর্দ্ধন হইয়াছে ও পৃথিবী কৃষ্ণময় হইয়াছে।" পদাবলীর শ্রীরাধিকা যেমন কৃষ্ণভ্রমে 'বিজনে তরুণ তমাল আলিঙ্গন করিয়াছেন, চৈতন্য মহাপ্রভুও তেমনি, "তমালের বৃক্ষ এক সম্মুখে দেখিয়া। কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়ে ধরে জড়াইয়া॥" চণ্ডীদাসের রাধা যেমন কানুর নাম শুনিলে বক্তার পায়ে লুটাইয়াছেন, গোবিন্দদাসের কড়চাতে দেখা যায়, গৌরহরিও তেমনি "কৃষ্ণ অনুরাগে সদা ব্যাকুল হৃদয়। শুনিলে কৃষ্ণের নাম অশ্রুধারা বয়॥ যদি কেহ কৃষ্ণ বলি উচ্চৈঃস্বরে ডাকে। ধেয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করেন তাহাকে॥" শুধু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যই নহেন; এই সম্প্রদায়ের আরও অনেক ভক্ত উন্মাদিনী শ্রীমতী

মতই—"জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর" এবং "হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে, কি কহে দুহাত তুলি" প্রভৃতি বর্ণনার জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে মাধবেন্দ্র পুরী প্রভৃতির কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। চৈতন্য-ভাগবত এই মাধবেন্দ্র পুরী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "মাধবেন্দ্র পুরীর কথা অকথ্য কথন। মেঘ দরশন মাত্র হয় অচেতন।" মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তী পদরচয়িতৃগণ তাঁহার অলৌকিক ভাবাবেশ সমূহ অবলম্বনেই শ্রীরাধিকাকে চিত্রিত করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন "চম্পক শোণ, কুসুম কনকাচল, জিতল গৌর তনু লাবণি রে। উন্নতগীম, সীম নাহি আনুভব জগমনোমোহন ভাঙ্গনী রে॥" মূর্ত্তিটীও যেন বৈষ্ণব-কবির মানস-প্রতিমা, হরি-বিরহ-বিধুরা সেই চম্পক-বরণীরই প্রতিচ্ছবি। চৈতন্যদেব রূপ দেখাইয়াই জগৎ মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার রস-মধুর গৌর-মূর্ত্তিটী যে দেখিয়াছে সেই ভুলিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ১৪৮৬ অব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীধাম নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহাদের আদি নিবাস শ্রীহট্ট জেলায়। ইনি বিদ্যালাভার্থ নবদ্বীপে আগমন করেন। পাঠ-সমাপনান্তে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীর পাণি-গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপেই বসবাস করিতে থাকেন।

চৈতন্যদেবের বাল্যকালের আদরের নাম ছিল নিমাই। নিমাই শৈশবে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। প্রতিদিন গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থী ব্রাহ্মণগণের উপর অত্যাচার করিতেন। কাহারাও শিবলিঙ্গ চুরি করিতেন, কাহারও বা উত্তরীয় লইয়া পলাইতেন। পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম কালে নিমাই বিদ্যাশিক্ষার্থ গঙ্গাদাসের টোলে প্রেরিত হন। সেখানে অত্যল্পকাল মধ্যেই ব্যাকরণ-শাস্ত্রে

অদ্বিতীয় হইয়া উঠেন। তাঁহার অধ্যয়নে কৃতিত্ব ও একাগ্রতা সম্বন্ধে চৈতন্য-ভাগবত-প্রণেতা লিখিতেছেন,—"না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক একক্ষণে॥ কিবা স্নানে কিবা ভোজনে কিবা পর্য্যটনে। নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র বিনে॥ একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়। আর বার উলটীয়া সবারে সবারে ঠকায়॥" কিন্তু এইরূপ উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার দুরন্তপনার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তিনি শ্রীহট্টিয়াগণকে দেখিলেই বিদ্রূপ করিতেন। মুরারি গুপ্ত তাঁহার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন; তাঁহাকে তর্কে পরাভূত করিয়া, "প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড়। লতা পাতা লইয়া গিয়া রোগী দৃঢ় কর॥ ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি। কফপিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাই ইথি॥" এইরূপে তিনি বড় বড় পণ্ডিতগণকেও আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া পরাভব-ব্যঞ্জক হাস্য করিতেন।

২০ বৎসর বয়ক্রম কালে নিমাই নবদ্বীপে একটী টোল সংস্থাপন করেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অসাধারণ পণ্ডিতা ও প্রতিভায় বিমুগ্ধ হইয়া অসংখ্য বিদ্যার্থী তাঁহার টোলে সমাগত হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরকে তর্কযুদ্ধে পরাভূত করেন। ইহার কিয়ৎ-কাল পরে নিমাই পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যটনে বাহির হন এবং তথাকার বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট হইতে প্রভূত সম্মান লাভ করেন। তৎপর নবদ্বীপে প্রত্যাগত হইয়া শুনেন, তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী লক্ষ্মীদেবী সর্প-দংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর মাতার অনুরোধে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার পাণি-গ্রহণ করেন।

পিতৃপিণ্ড প্রদানার্থ মাতার আদেশে গয়া-গমন চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনে একটী ফলিতার্থময় ঘটনা। তথায় গিয়া ভক্ত-প্রবর ঈশ্বরপুরীর ভক্তির আবেগ-দর্শনে নিমাই উদ্বেলিত হইয়া উঠেন এবং বিশ্বনাথের শ্রীচরণে অঞ্জলি প্রদান-কালে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গিগণের যত্নে মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন,—"তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও,

আমি আর সংসারে যাইব না, আমি প্রাণেশ্বরকে দেখিতে মথুরায় চলিলাম।" এই অপূর্ব্ব ভক্তি-উচ্ছ্বসিত পূর্ব্বরাগের আবেশে আবেশময় যুবককে সঙ্গিগণ নানারূপে বুঝাইয়া গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন। কিন্তু গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াও প্রেমোন্মত্ত নিমাই,—"কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ। দিবানিশি শ্লোক পড়ি করয়ে রোদন॥" ইহার পর কাঞ্চননগর-নিবাসী কেশব ভারতীর নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণান্তে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামে অভিহিত হন। সন্ন্যাস-গ্রহণকালে তাঁহার বয়ঃক্রম সবে মাত্র ২৪ বৎসর হইয়াছিল। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর মহাপ্রভু ১৮ বৎসর নীলাচলে বাস করেন এবং ৬ বৎসর দাক্ষিণাত্য, শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি ভ্রমণে অতিবাহিত করেন। ৪৮ বৎসর বয়সে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমীতে তাঁহার তিরোভাব হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্মনীতি

বৈষ্ণব-সাধনার মর্ম্মকথা আমরা পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা-কালে বিবৃত করিয়াছি এবং চৈতন্য মহাপ্রভু যে বাঙ্গালীর প্রেম-সাধন-তরুর পূর্ণ পরিণত অমৃতময় ফল তাহাও পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, গৌরহরি বৈষ্ণব-পদাবলীর সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনটীও সম্পূর্ণভাবে গীতিময় (lyrical) ছিল। চৈতন্যদেব যেন একটী গানের সুর,—তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপী একটী সুরেরই ঝঙ্কার উত্থিত হইয়াছে। আর সেই সুরে পাগল হইয়া বাঙ্গালী বলিয়াছে—"আজ হতে গোরা তোরি সাথে রব, জ্ঞানের গৌরব আর না করিব। আজ সব ছেড়ে ফেলে হরি হরি বলে নাচিতে বাসনা হতেছে॥" যে রসিক সমালোচক চৈতন্যের জীবনটীকে "The lyric cry of the human soul" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তিনি প্রকৃত রস-গ্রাহিতারই পরিচয় দিয়াছেন।

চৈতন্যদেবের ধর্ম্মনীতি বা চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাস লিখিয়াছেন,—"It represented in its negative

aspect a revolt against the dry intellectualism and soulless ceremonialism of the orthodox Brahmins, and in the positive aspect it voiced the longing lyric cry of the human soul for the divine. "Liberty, equality and fraternity in the sphere of religion and spirituality was its watch-word."

ভারতের ধর্ম্মরাজ্যে বিপ্লব ও বাঙ্গালার ধর্ম্মেতিহাসে সত্যাগ্রহনীতি

বৈষ্ণবযুগে বাঙ্গালী ভারতের ধর্ম্মরাজ্যে একটী বিরাট্ বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিল—স্মৃতি ও পৌরোহিত্যের প্রাণহীন শাসনে নিষ্পেষিত সমাজের বুকে দাঁড়াইয়া ভক্তির প্রাধান্য ও মানবতার জয় গান গাহিয়াছিল। চৈতন্য-দেব ঋজু কণ্ঠে "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ" মন্ত্র অকুতোভয়ে ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই ভেদাভেদে পর্য্যুসিত হিন্দুসমাজে কায়স্থ নরোত্তম ঠাকুরের নিকট বিপ্র গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও বলরাম মিশ্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ভুঁইমালী ঝড়ুঠাকুর সকলের পূজ্য হইয়াছিলেন। চর্ম্মকার মুরারি দাসের চরণামৃত পান করিয়া ক্ষত্রিয় রাজা-রাণী আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী জাতি রাজনীতিক্ষেত্রে সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের মন্ত্র-রক্তের অক্ষরে প্রচারিত করিতে গিয়াছিল; কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী ধর্ম্মনীতিক্ষেত্রে উহার প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল নয়নের অশ্রুতে, হৃদয়ের প্রীতিতে, ও নিষ্ঠাবৃত্তির প্রাচুর্য্যে। অধুনা রাজনীতি-ক্ষেত্রে মহাত্মা গন্ধী-প্রবর্ত্তিত সত্যাগ্রহ আদর্শ ভারতে নূতন নহে। প্রাচীন ভারতে প্রহ্লাদ প্রভৃতির মধ্যে এই সত্যাগ্রহী নীতি জীবন্তভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব-যুগে বাঙ্গালী ধর্ম্মক্ষেত্রে এই

সত্যাগ্রহ নীতির চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। মুসলমান কাজীর আদেশে নির্ম্মম বেত্রাঘাতে অচেতন-প্রায় যবন হরিদাস ঠাকুরের,

"খণ্ড খণ্ড কর যদি বাহিরায় প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম ॥"

উক্তি আর কলসীর কাণা দ্বারা নির্ম্মমভাবে প্রহৃত নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কর্ত্তৃক জগাই মাধাই আলিঙ্গন ও নামামৃত দান ভারতীয় সত্যাগ্রহ-নীতির ইতিহাসে উজ্জ্বলতম অধ্যায়।

চৈতন্য-যুগের পদাবলী

গোবিন্দ দাস :—গোবিন্দ দাস এ যুগের অন্যতম কবি। শুনা যায় ইনি চৈতন্য-সহচর, পরমভাগবত চিরঞ্জীব সেনের পুত্র। গোবিন্দ দাস প্রথমে শাক্ত ছিলেন, পরে গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির অনুবর্ত্তী। ইঁহার শেষ জীবন সম্বন্ধে ভক্তি-রত্নাকর লিখিয়াছেন, "নির্জ্জনে বসিয়া নিজ পদ-রত্ন গণে। করেন একত্র অতি উল্লসিত মনে॥"

অনুভবের গাঢ়তা ও উদ্দীপনা শক্তিতে গোবিন্দ দাসের পদ সুপ্রসিদ্ধ। অধুনা কীর্ত্তন-গানে গোবিন্দের পদের প্রচলনই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

জ্ঞানদাস :—জ্ঞানদাস সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই জানিতে পারা যায়। ইনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাঁদড়া গ্রামে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানদাস খেতুরের প্রসিদ্ধ মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, ইঁহার রচিত মুরলী-শিক্ষা ও দানলীলা-বিষয়ক পদগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ।

যদুনন্দন দাস ও যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী—যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী গদাধরের শিষ্য। ইনি "রাধাকৃষ্ণ লীলাকদম্ব" নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকের শ্লোক-সংখ্যা ৬০০০। যদুনন্দন দাস শ্রীনিবাসের

কন্যা হেমলতার আদেশে ১৬০৭ অব্দে "কর্ণানন্দ" নামধেয় একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতদ্ভিন্ন ইনি কৃষ্ণদাস-বিরচিত "গোবিন্দ-লীলামৃত" ও রূপ গোস্বামীর "বিদগ্ধ-মাধব" নাটকের অনুবাদ করেন; কিন্তু পদকর্ত্তা হিসাবেই দাস যদুনন্দন সমধিক প্রতিষ্ঠা-লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

নরহরি সরকার—নরহরি চৈতন্য মহাপ্রভুর সহচর ছিলেন। ইনি চিরকৌমারব্রত অবলম্বন করেন। নরহরি সরকার লোচন দাসের গুরু এবং "চৈতন্য-মঙ্গল"-রচনার উপদেষ্টা ছিলেন। ইনি গৌরলীলার পদ-রচনার প্রবর্ত্তক বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। গৌর-চন্দ্রিকার অনেক পদই নরহরির রচিত। ইঁহার প্রদর্শিত পথাবলম্বন করিয়াই বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি পদকর্ত্তা যশস্বী হইয়াছেন।

সর্ব্ব সমেত ১৬৬ জন কবি বৈষ্ণব-পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে উদ্ধব দাস, প্রেম দাস, বলরাম দাস, ঘনশ্যাম দাস, রায়শেখর, শশি-শেখর, বাসুদেব ঘোষ, জগদানন্দ প্রভৃতি কবিগণ সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন চণ্ডীদাসের রামী, রসময়ী দাসী, মাধবী দাসী প্রভৃতি মহিলা কবি এবং আকবর আলি, সেখ জালাল, সেখ ভিক, সৈয়দ মর্ত্তুজা প্রভৃতি মুসলমান কবিও রাধা কৃষ্ণের প্রেম-গীতি গাহিয়া গিয়াছেন।

পদসংগ্রহ-সমন্বিত গ্রন্থ

এযাবৎ যতগুলি পদ-সংগ্রহ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে খৃষ্টীয় ১৬শ শতকের সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ওরফে পদ-কর্ত্তা হরিবল্লভ বা বল্লভ দাসের "ক্ষণদা গীত-চিন্তামণি"ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই সংগ্রহখানি ক্ষুদ্রাকার, ইহাতে মাত্র ৩১৫টী পদ আছে। স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মতে ইহার ২০।২৫ বৎসর পরেই নরহরি চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক "গীত-চন্দ্রোদয়" সঙ্কলিত হয়। এই পুঁথি এখন নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। শুনা যায় আগরতলা রাজধানীর রাজকীয় গ্রন্থশালায় উহা সংরক্ষিত আছে।

সতীশ বাবুর মতে আনুমানিক ১৭২৫ অব্দ "গীত-চন্দ্রোদয়"এর সঙ্কলনকাল। এই গীত-চন্দ্রোদয়ের প্রায় সম সময়েই শ্রীনিবাস আচার্য্যের সুযোগ্য বংশধর রাধামোহন ঠাকুরের "পদামৃত-সমুদ্র" সঙ্কলিত হয়। রাধামোহন ঠাকুর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমারের গুরু এবং নিজেও একজন বিশিষ্টপদ-রচয়িতা ছিলেন। "পদামৃত-সমুদ্রে" তাঁহার স্বরচিত পদ-সংখ্যা ২২৮টী। ইহাতে পদ ব্যাখা করিবার জন্য তিনি যে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ সংস্কৃত টীকা সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহা মহাভাবানুসারিণী টীকা নামে অভিহিত। সতীশ বাবুর মতে এই "পদামৃত-সমুদ্র" সংগৃহীত হইবার আন্দাজ ২০।২৫ বৎসর পরেই গোকুলানন্দ সেন ওরফে বৈষ্ণবদাস সুপ্রসিদ্ধ "পদ কল্পতরু" সঙ্কলন করেন। অদ্যাবধি যতগুলি পদাবলীর সংগ্রহ-পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে "পদ-কল্পতরু"ই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। বৈষ্ণব দাস নিজে একজন রসজ্ঞ পদ-কর্ত্তা ও সুনিপুণ কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। সুবৃহৎ "পদকল্পতরু"তে তাঁহার স্বরচিত পদ-সংখ্যা মাত্র ২৬টী। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থ-কলেবর সুপ্রসিদ্ধ কবিগণের পদরত্ন-রাজি দ্বারাই পরিপূর্ণ করিয়াছেন। পদগুলিকে বৈষ্ণব দাস রস-পর্য্যায় অনু-যায়ী যেরূপভাবে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসাধারণ রসজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। পদসংগ্রহ-গ্রন্থগুলির মধ্যে এই পদকল্পতরুই সমধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। পদসংগ্রহ গ্রন্থগুলির মধ্যে আর একখানি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সংগ্রহ গ্রন্থের খবর পাওয়া যায়। এই পুঁথিখানির নাম "পদ-সমুদ্র"। ইহাতে নাকি ১৫০০০ পদ আছে। এই পদসমুদ্র বাবা আউল মনোহর দাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন পদকল্পলতিকা, পদচিন্তা-মণিমালা, পদার্ণবসারাবলী প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে।

চরিত-শাখা

চৈতন্য মহাপ্রভুর অপার্থিব লীলা-কাহিনী অবলম্বনেই বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্ব প্রথম জীবন-চরিত গ্রন্থ রচিত হয়। তাঁহার জীবদ্দশাতেই ভক্তগণ তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া প্রচার করিতেন। পরবর্ত্তী কালে তাঁহার

উচ্চশিক্ষিত ভক্তগণ শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ তাঁহার দেবত্ব প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইলেন। মহাপ্রভুর জীবন ও লীলা-কাহিনী সম্বন্ধে তাঁহার ভক্ত-গণের কেহ কেহ কড়চা বা Note রাখিয়া গিয়াছেন; আবার কেহ কেহ বা প্রচলিত জনশ্রুতি বা ভক্তগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবরণ অবলম্বনে ভক্তি-মিশ্রিত দর্শনাত্মক চরিতাখ্যান প্রণয়ন করিয়াছেন। এই চরিত গ্রন্থগুলি বৈষ্ণব-সাহিত্যের এক অতি লোভনীয় সম্পদ।

গোবিন্দদাসের কড়চা

গোবিন্দ দাস ১৫০৮ অব্দে বর্দ্ধমান জেলার কাঞ্চননগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা জাতিতে কর্ম্মকার ছিলেন। গোবিন্দ স্ত্রীকর্ত্তৃক "নির্গুণ" ও 'মূর্খ' বলিয়া তিরস্কৃত হওয়ায় অভিমানে গৃহত্যাগ করেন। অতঃপর ইনি নবদ্বীপে আসিয়া শচীদেবীর আলয়ে ভৃত্যরূপে অবস্থান করিতে থাকেন। ইহার এক বৎসর পরে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে, গোবিন্দও তাঁহার অনুগমন করেন। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত অবলম্বনেই এই কড়চা খানি লিখিত। ইতিহাসের দিক্ দিয়া গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান। ইহা হইতে সেই সময়কার ভারতবর্ষের বহুবিধ ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান মিলে।

কড়চার আলোচ্য বিষয় এবং দোষগুণ

কড়চায় বর্ণিত বিষয়সমূহের মধ্যে গোদাবরী-তীরে রামানন্দ রায়ের সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ, তীর্থ বটেশ্বরে তীর্থ রামের প্রতি কৃপা, চোরানন্দী বনে দস্যু নরোজীর সন্ন্যাস-গ্রহণ প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি বিখ্যাত চরিতগ্রন্থ-রচয়িতৃগণ মহাপ্রভুকে দেখেন নাই। প্রচলিত জনশ্রুতি ও ভক্তগণ-প্রদত্ত বিবরণসমূহ অবলম্বনেই ইঁহাদের গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছে। কিন্তু গোবিন্দ দাস মহাপ্রভুর

নিত্য-সহচর ছিলেন। এই কারণে ডাঃ সেন কড়চা খানিকে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করেন। কড়চার আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইহাতে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার ভাব আদৌ নাই।

আলোচ্য গ্রন্থখানির একমাত্র ত্রুটী এই যে, গোবিন্দ দাস অশিক্ষিত হওয়ায় তাঁহার কড়চাতে মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপাদেশামৃতের মনোহারিত্ব বিনষ্ট হইয়াছে। বড় বড় পণ্ডিতদিগের সহিত মহাপ্রভুর তর্ক ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় আলোচনাগুলি উচ্চ শিক্ষার অভাবে গোবিন্দদাস লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই।

জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল

কবি জয়ানন্দ বর্দ্ধমান জেলার আমাইপুর গ্রামনিবাসী সুবুদ্ধি মিশ্রের পুত্র। এই বংশেই স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের আবির্ভাব হইয়াছিল। জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলের পুঁথির আবিষ্কর্ত্তা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে ১৫১১ খৃষ্টাব্দে জয়ানন্দের জন্ম হয়।

আলোচ্য গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যঃ—কয়েকটী বিষয়ে জয়ানন্দের মত প্রচলিত মত হইতে বিভিন্ন। তন্মধ্যে চৈতন্যদেবের তিরোভাব সম্পর্কীয় বিবরণটী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং ইতিহাস হিসাবে গ্রহণীয়। অপরাপর চরিত-গ্রন্থ-প্রণেতাদিগের মধ্যে কেহবা এসম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব; কেহবা নানাবিধ অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু জয়ানন্দের প্রদত্ত বিবরণে জানা যায়, একদিন নগর-কীর্ত্তন করিবার সময় মহাপ্রভুর পদে ইষ্টক খণ্ড বিদ্ধ হয়। দুই এক দিনের মধ্যেই বেদনা বৃদ্ধি পায়। আষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমীতে মহাপ্রভু শয্যাশায়ী হন এবং সপ্তমীতে ইহলোক ত্যাগ করেন। এতদ্ভিন্ন জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে নবদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত গ্রামসমূহের ব্রাহ্মণদিগের উপর মুসলমান নরপতির অত্যাচার,—পিরুল্যা ব্রাহ্মণগণের জাতিচ্যুতি প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত

বৃন্দাবন দাস ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীধাম নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের মাত্র দুই বৎসর পূর্ব্বে মহাপ্রভুর তিরোধান হয়। চৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন-সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত হওয়ায় বৃন্দাবন দাস তাঁহার গ্রন্থমধ্যে অনেক বিলাপ করিয়াছেন।

চৈতন্য-ভাগবত শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকরণে লিখিত। ইহাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বিষ্ণু-অবতার প্রতিপন্ন করিতে গ্রন্থকারের চেষ্টার ক্রটী নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের মত কখনও তিনি অতিথি ব্রাহ্মণের নিবেদিত অন্নগ্রহণ করিতেছেন এবং পরক্ষণেই তাঁহাকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী রূপ দেখাইতেছেন। আবার কখনও শচীমাতাকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইতেছেন। চৈতন্য-ভাগবত ৩ খণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ডে গৌর-হরির গয়া-গমন অবধি, মধ্যম খণ্ডে সন্ন্যাস-গ্রহণ পর্য্যন্ত ও শেষ খণ্ডে তাঁহার অন্ত্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

নানা অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ থাকিলেও চৈতন্য-ভাগবত বঙ্গভাষার একখানি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহাতে বঙ্গদেশের তদানীন্তন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অতি সরলভাবে লিখিত হইয়াছে।

চৈতন্য-ভাগবত বৈষ্ণব-ভক্তের বিশেষ আদরের ধন।

লোচন দাসের চৈতন্য-মঙ্গল

লোচন দাস ১৫২৩ অব্দে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ণনাম ত্রিলোচন দাস। ইঁহাদের নিবাস কোগ্রাম।

লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গলের ঐতিহাসিক মূল্য না থাকিলেও ইহার সাহিত্যিক মূল্য যথেষ্ট আছে। কবিত্বের দিক্ দিয়া গ্রন্থখানি বিশেষ

মূল্যবান্। চৈতন্য-মঙ্গলের রচনা অতি প্রাঞ্জল; করুণ-রসের অবতারণায় গ্রন্থকার সমধিক নিপুণ। চৈতন্য-মঙ্গলের অনেকাংশ এখনও ভিখারী বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত

কৃষ্ণদাস কবিরাজ সম্ভবতঃ ১৫১৭ অব্দে বর্দ্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ভগীরথ ও মাতার নাম সুনন্দা। কৃষ্ণদাস ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামদাস অতি শৈশবেই পিতৃ-মাতৃহীন হন। ইনি নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া পদব্রজে বৃন্দাবন-যাত্রা করেন। এখানে আসিয়া রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামী ও রঘুনাথ দাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নিকট অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েন। চৈতন্য-চরিতামৃত কৃষ্ণদাসের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অপূর্ব্ব অবদান।

গভীর পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতাগুণে চৈতন্য-চরিতামৃত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই পুস্তকের শ্লোক সংখ্যা ১২০৫১। গ্রন্থখানি আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিনখণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ডে ১৭ পরিচ্ছেদ, মধ্যখণ্ডে ২৫ পরিচ্ছেদ ও অন্ত্যখণ্ডে ২০ পরিচ্ছেদ আছে।

এই অমূল্য গ্রন্থ বৃন্দাবন হইতে বঙ্গদেশে প্রেরিত হইবার সময় বনবিষ্ণুপুরে দস্যুদল কর্ত্তৃক অপহরণের সংবাদ পাইয়া গ্রন্থশোকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ দেহত্যাগ করেন।

ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম বিলাস ও প্রেমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থ

পরবর্ত্তী চরিত-গ্রন্থের মধ্যে নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তম-বিলাস, নিত্যানন্দ দাসের প্রেম-বিলাস, শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস বাবাজী কর্ত্তৃক অনূদিত ভক্তমাল, ঈশান নাগরকৃত অদ্বৈত প্রকাশ প্রভৃতি সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রসিদ্ধ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য। ইঁহার ভক্তিরত্নাকর অতি বিরাট্ গ্রন্থ। গ্রন্থখানি সর্ব্বসমেত পঞ্চদশ তরঙ্গে বিভক্ত এবং নানা মূল্যবান্ তথ্যে পরিপূর্ণ। ইহাতে জীব গোস্বামীর বংশ-পরিচয়, গোস্বামিগণের গ্রন্থ-বর্ণন, শ্রীনিবাস আচার্য্যের বিবরণ, রাগরাগিণী-গণের শ্রেণীবিভাগ, নায়ক ও নায়িকা ভেদবর্ণন প্রভৃতি নানা জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার প্রদত্ত তদানীন্তন নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের বিবরণ ঐ দুই স্থানের তৎকালীন ভৌগোলিক তথ্য হিসাবে বিশেষ মূল্যবান্।

নরহরির নরোত্তম-বিলাস গ্রন্থে নরোত্তম ঠাকুরের জীবন-চরিত বিবৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রীনিবাস-চরিত ও গৌরচরিত-চিন্তামণি নাম-ধেয় গ্রন্থ এবং অনেকগুলি বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের অপর নাম বলরাম দাস। ইনি শ্রীখণ্ডবাসী আত্মারাম দাসের পুত্র। ইঁহারা জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। ইঁহার প্রেমবিলাস গ্রন্থ বিংশতি অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে বনবিষ্ণুপুরে দস্যুদল কর্ত্তৃক গোস্বামিগণ-প্রেরিত গ্রন্থ অপহরণ ও বীরহাম্বীরের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ প্রভৃতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বঙ্গ-সাহিত্যের চৈতন্যোত্তরীয় যুগ

বৈষ্ণব-যুগে বাঙ্গালী সব ভুলিয়া হরিনামে মাতোয়ারা হইয়াছিল। ঐ সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-প্রতিভার চরমবিকাশ দেখা দিয়াছিল। বাঙ্গালী কবি রাইকানুর প্রেম-গীতিতে মত্ত হইয়া রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতির কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। এই যুগে এগুলি আবার বাঙ্গালী কবি ও কাব্যকারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাঁহারা এ গুলিকে আবার নবভাবে সংস্কার করিয়া জনসাধারণের চিত্ত-বিনোদনের

উপযোগী করিয়া তুলিলেন। তাই অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র এই যুগকে সংস্কারযুগ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

চণ্ডী-মঙ্গল

ইতঃপূর্ব্বে আমরা দ্বিজ জনার্দ্দনের চণ্ডী-মঙ্গলের কথা উল্লেখ করিয়াছি। মুকুন্দরামের পূর্ব্বে কতজন কবি যে চণ্ডীমঙ্গলের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। যাহা হউক, পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতাদিগের মধ্যে কবিকঙ্কণ বলরাম ও মাধবাচার্য্যই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দীনেশ বাবুর মতে মাধবাচার্য্যের চণ্ডী ১৫৭৯ অব্দে প্রণীত হয়। কথিত আছে যে, মাধবাচার্য্য ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে মেঘনা নদীর তীরবর্ত্তী নবীনপুর গ্রামে বসবাস করিতেন।

চণ্ডী-মঙ্গল মাধবাচার্য্যের হাতে পড়িয়া পরিপূর্ণ কলেবরই লাভ করিয়াছিল। গল্পাংশে উভয় কবির মধ্যেই যথেষ্ট ঐক্য আছে। কেবল চরিত্র-চিত্রণে উভয়ের মধ্যে তারতম্য লক্ষিত হয়। মুকুন্দরাম প্রথম শ্রেণীর কবি, আর মাধু দ্বিতীয় শ্রেণীর।

কবি-কঙ্কণ মুকুন্দরাম

বাঙ্গালার অমর গ্রাম্য কবি মুকুন্দরাম সাতপুরুষ যাবৎ বর্দ্ধমান সিমিলা-বাদ পরগণার অধীন রত্নানু নদীর তীরবর্ত্তী দামুন্যা গ্রামে বসবাস করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন মুসলমান ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যা-চারে স্থানীয় প্রজাবর্গ যখন সর্ব্বস্বান্ত হইতে লাগিল, তখন মুকুন্দরাম সস্ত্রীক গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। নানাস্থান অতিক্রম করিয়া কবি আরড়া ব্রাহ্মণভূমির রাজা রঘুনাথ রায়ের শরণাপন্ন হন। তাঁহার অনুগ্রহে মুকুন্দ কবি রাজ-পরিবারের শিশুগণের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। এই আরড়া বর্ত্তমানে মেদিনীপুর জেলার ঘাঁটাল থানার অধীন। উক্ত রঘুনাথ রায়ের বংশধরগণ বর্ত্তমানে উহার নিকটবর্ত্তী সেনাপত নামক স্থানে বসবাস

করিতেছেন। দীনেশ বাবু আনুমানিক ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দ মুকুন্দের জন্মসময় বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

মুকুন্দের কবি-প্রতিভা

মুকুন্দরামের প্রতিভা ১ম শ্রেণীর কবির। সমাজের অবিকল চিত্র অঙ্কনে মুকুন্দরাম প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে অতুলনীয়। মুকুন্দের কাব্যে উৎকৃষ্ট পুরুষ-চরিত্রের অভাব পরিদৃষ্ট হইলেও অত্যুৎকৃষ্ট রমণী-চরিত্রের অভাব নাই। মুকুন্দের ফুল্লরা বঙ্গ-সাহিত্যের অনুপম সৃষ্টি এবং বাঙ্গালার কুটীর-লক্ষ্মীগণের ত্যাগশীল-প্রেমের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। কাব্যে নাটকীয় কৌশল বা Dramatic element মুকুন্দের রচনার একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য। কাব্যে এই নাটকীয় কৌশল কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর কবিগণের মধ্যেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মুকুন্দের কাব্যের নাটকীয় কৌশল সম্বন্ধে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"কাব্য লিখিতে লিখিতে যখন অন্তর্দৃষ্টি নির্ম্মল ও প্রতিভান্বিত হইয়াছে, তখন মুকুন্দরাম নিজে লেখনী ছাড়িয়া দিয়াছেন, চরিত্রগুলি হাস্য পরিহাস ও কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তিনি ভণিতায় নিজের নাম সহি করিয়া গ্রন্থ-সত্ব স্থির রাখিয়াছেন।" ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমরা মুরারি শীলের সহিত কালকেতুর সাক্ষাতের অংশটী উল্লেখ করিতে পারি। সর্ব্বোপরি তাঁহার রচনার স্বাভাবিকতা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। ব্যাধ-কুটীরের বর্ণনা করিতে গিয়া তালপাতার ছাউনি, ছেঁড়া কাঁথা, ভেরেণ্ডার থাম প্রভৃতির দ্বারা যে অবিকল ফটোগ্রাফ তুলিয়া দিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেতাবতী ছাঁচে ঢালিয়া মার্জ্জিত করিতে গেলে, মুকুন্দ-কবি আমাদিগকে ব্যাধ-কুটীরের ও ব্যাধ-রমণীর নিরাভরণ সৌন্দর্য্যের এরূপ ফটোগ্রাফ উপহার দিতে পারিতেন না।

মুকুন্দরাম সর্ব্বতোভাবে দুঃখের কবি। দুঃখের করুণ-কাহিনীই তাঁহার কাব্যে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে।

কালকেতুর চরিত্র

প্রাচীন অলঙ্কার-শাস্ত্রকারগণ কাব্য ও নাটকাদির নায়কের গুণ সম্বন্ধে সূত্রনির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন,—"প্রখ্যাত বংশ রাজর্ষি ধীরোদাত্ত প্রতাপবান্।" কিন্তু মুকুন্দ-কবির কালকেতুর চরিত্রে ইহার কোনটীই পরিদৃষ্ট হয় না। নীচ ব্যাধ-কুলে তাঁহার জন্ম। উদরান্নের সংস্থানের জন্য সে সর্ব্বদা বিব্রত। সে প্রত্যহ প্রভাতে শীকারে বহির্গত হয় এবং সন্ধ্যায় মৃত পশু-ভার স্কন্ধে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। তাহার শয়ন ও ভোজন কুৎসিত ধরণের,—"শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিকার। গ্রাসগুলি তুলে যেন তে-আঁটিয়া তাল।" কালকেতু নীচ-কুলোদ্ভব এবং তাহার চাল চলন কুৎসিত ধরণের হইলেও তাহার চরিত্রের কতকগুলি দিক্ বেশ উজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তাহার ভাঙ্গা-কুঁড়ে ঘরে ষোড়শী-রূপিণী চণ্ডীর আবির্ভাব দেখিয়া ফুল্লরা যখন তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছে,—"পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে। কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে॥" তখন তাহার অমার্জ্জিত মনের একটা সরল নির্ম্মলতা নিম্নোক্ত-অংশে অতি সুন্দররূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে,—

"সুব্যক্ত করিয়া রামা কহ সত্য ভাষা।
মিথ্যা হইলে চুয়াড়ে কাটিব তোর নাসা॥"

কালকেতু গৃহে প্রবেশ করিয়া ষোড়শী-রূপিণী চণ্ডীকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। সে যুবতীকে বলিতে লাগিল, আমি অধম ব্যাধ,—ঘরের চতুর্দ্দিকে পশুর হাড় ছড়ান রহিয়াছে। এ ঘরে "প্রবেশে উচিত হয় স্নান।" তুমি এখানে কেন? তুমি এখানে রাত্রিবাস করিলে লোকে নানারূপ কুৎসা রটনা করিবে, অতএব চল, আমি তোমাকে তোমার বাড়ীতে রাখিয়া আসিব। এখানে তাহার সৎশিক্ষা ও সৎসংসর্গের প্রভাবই পরিদৃষ্ট হয়। অতঃপর কালকেতু ষোড়শীকে বলিতেছে,—"চল বন্ধু জন-পথে, ফুল্লরা চলুক সাথে,

পিছে ল'য়ে যাব ধনুঃশর।" এখানে তাহার স্বতঃপ্রবৃত্ত নৈতিক সাবধানতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। চণ্ডী এ কথার কোনই উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তখন কালকেতু বলিল, "চরণে ধরিয়া মাগি ছাড় গো নিলয়।" তাহাতেও যখন চণ্ডী যাইতে চাহেন না, তখন ক্রুদ্ধ হইয়া,—"ধর্ম্ম সাক্ষী করি বীর যুড়িলেন শর।" এখানে তাহার চরিত্রের শুচিতা, সংযম ও পবিত্রতা অতি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরে দেবী বলিলেন যে, তিনি চণ্ডী, তাহাকে বর দিতে তিনি আসিয়াছেন। তখন এই নির্ভীক সত্যবাদী, সরল ও জিতেন্দ্রিয় ব্যাধ আপনার হীনতা ও অপরাধের কথা স্মরণ করিয়া বলিতেছে,—"হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি। কি কারণে মোর ঘরে আসিবে পার্ব্বতী॥" এই সময়ে দেবী তাহাকে দশভূজা মূর্ত্তি দেখাইয়া সন্দেহ বিমোচন করিলেন। কালকেতু-চরিত্রে নানা সদ্‌গুণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থের শেষভাগে কলিঙ্গ-পতির সহিত যুদ্ধে হারিয়া ধানের গোলায় লুক্কায়িত হইবার চিত্রে অত্যন্ত হীনতাই পরিদৃষ্ট হয়। রাজা কালকেতু অপেক্ষা ব্যাধ কালকেতুই মনোরম।

ফুল্লরা

ফুল্লরা বঙ্গ-সাহিত্যের মনোমোহিনী প্রতিমা। স্বামী কালকেতুর গৃহে ফুল্লরার দুঃখের অন্ত ছিল না। অভাগী ফুল্লরা হরিণের ছড় পড়িত, জ্যৈষ্ঠে বেঙ্গুচের ফল খাইয়া দিন যাপন করিত। কিন্তু এত দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যেও ফুল্লরা কেবলমাত্র অপরিসীম স্বামীপ্রেম লাভ করিয়া সুখিনী ছিল। ইহা তাহাকে দারিদ্র্য, অনশন প্রভৃতি সমস্তই ভুলাইয়া দিয়াছিল; কিন্তু তাহার পতিগৃহে আজ ষোড়শী-রূপিণী চণ্ডীদেবীর আবির্ভাব দেখিয়া, তাহাকে তাহার স্বামী-প্রেমের অংশভাগিনী মনে করিয়া ভয়ে ফুল্লরার মুখ শুকাইয়া আসিল। সে নানাভাবে বুঝাইবার পরও ষোড়শী যখন আদৌ গৃহত্যাগের ইচ্ছা দেখাইল না, তখন তাহাকে দারিদ্র্যের ভয় দেখাইয়া

প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য নিজ জীবনের মর্ম্মন্তুদ দুঃখ-কাহিনী শুনাইতে লাগিল। ফুল্লরা বাঙ্গালার কুটীর-লক্ষ্মীগণেরই জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। এই ত্যাগ-শীল ও কষ্টসহিষ্ণু মূর্ত্তি নানা আধি-ব্যাধি এবং দুঃখ-দারিদ্র্যের তীব্র হাহা-কারের মধ্যেও বাঙ্গালীর দুর্ব্বহ জীবনে একমাত্র শান্তি ও সান্ত্বনা রূপে বাঙ্গালার কুটীরগুলি আলো করিয়া রাখিয়াছে। কে একজন অজ্ঞাত কবি দ্বিজেন্দ্রলালের "ধন-ধান্যপুষ্পে ভরা" গানের অনুকরণে বঙ্গ-ললনার প্রশস্তি গাহিতে গিয়া যথার্থই গাহিয়াছেন,—

"তারা সারাটী জীবন কাটায় সুখে আঁচল গায়ে দিয়ে।
এমন হাসি-মুখে আধ-পেটা খায় আর কোন্ দেশের মেয়ে॥"

চণ্ডীমঙ্গলের উপাখ্যানঃ—চণ্ডীমঙ্গলে দুইটী উপাখ্যান আছে। একটী কালকেতুর উপাখ্যান অপরটী শ্রীমন্ত সদাগরের উপাখ্যান। আখ্যায়িকা অবগতির জন্য আমরা মূল-গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শিবায়ন

বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত শিবের গানগুলি অতি প্রাচীন। বলা বাহুল্য এই সকল গানে বর্ণিত শিব পৌরাণিক শিব নহেন, বৌদ্ধ যুগের সেই কৃষক শিব। এ সম্বন্ধে আমরা শূন্যপুরাণ আলোচনা-কালে সবিশেষ বিবৃত করিয়াছি। চণ্ডী ও মনসার গানের ন্যায় এই শিবের গানও বিভিন্ন কবি কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া বৃহৎ কাব্যাকারে পরিণত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র, দ্বিজ ভগীরথ ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কবিগণ শিব-মাহাত্ম্য-বিষয়ক কাব্য রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে রামেশ্বরের শিবায়নই সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয়। ইনি বরদা পরগণার যদুপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন, মেদিনীপুর কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের উৎসাহে 'শিবায়ন' রচনা করেন। ইহাতে হর-পার্ব্বতীর কলহ, শিবের চাষ আবাদের কথা, পার্ব্বতীর বাগ্দিনী বেশে শিবকে

প্রতারিত করিবার প্রচেষ্টা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। রামেশ্বরের রচনা অনুপ্রাস-বহুল হইলেও গ্রন্থখানি হাস্যরসে সমুজ্জ্বল।

মনসা-মঙ্গলের কবিগণ

গৌড়ীয় যুগের সাহিত্য আলোচনা কালে আমরা কানা হরি দত্ত, নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত প্রভৃতির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। দীনেশবাবুর "বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে সর্ব্বসমেত ৬২ জন মনসা-মঙ্গল রচয়িতার উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কেতকা দাস ও ক্ষেমানন্দের পুস্তকখানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কেতকা দাস সম্ভবতঃ কায়স্থ ছিলেন। কেননা ভণিতাতে তিনি কায়স্থগণের প্রতি মনসাদেবীর আশীর্ব্বাদ চাহিতেছেন। দীনেশ বাবুর মতে কেতকা দাস ও ক্ষেমানন্দ সম্ভবতঃ বর্দ্ধমান জেলার অধিবাসী ছিলেন।

ধর্ম্ম-মঙ্গল

ধর্ম্ম-মঙ্গল প্রথমতঃ রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণোক্ত ধর্ম্মঠাকুর এবং বৌদ্ধ রাজা ও সাধুগণের মহিমা-কীর্ত্তনের জন্যই উদ্ভূত হইয়াছিল। পরে বিভিন্ন কবি উহার বৌদ্ধত্ব হিন্দুয়ানীর আবরণে ঢাকিয়া, উহাকে হিন্দু করিয়া লইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই ধর্ম্ম-মঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্ট। এতদ্ভিন্ন রামচন্দ্র, মাণিক গাঙ্গুলি, খেলারাম, প্রভুরাম, রূপরাম, ঘনরাম, সহদেব চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কবিগণের ধর্ম্ম-মঙ্গল পাওয়া যায়। ঘনরামের ধর্ম্ম-মঙ্গল বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের আদেশে রচিত।

ধর্ম্ম-মঙ্গলে মহাবীর লাউ সেনের বিক্রম-কাহিনী বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। লাউসেন বারাঙ্গণাগণের ইন্দ্রজালে পড়িয়াও ইন্দ্রিয়-জয়ী। ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতির সহিত যুদ্ধেও তিনি অজেয়। অপরাজেয় ইছাই ঘোষকে তিনি হেলায় জয় করিয়াছেন। একদিকে তিনি যেমন আদর্শ বীর, অন্যদিকে তেমনি আদর্শ তপস্বী।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ঘনরামের ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্যের ভূমিকায় বঙ্গবাসী পত্রিকার তদানীন্তন সুযোগ্য সম্পাদক স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"(এই) কাব্যের গল্প উপকথা নহে, আকাশ-কুসুম নহে—বাস্তব ঘটনা এ কাব্যের একাংশীভূত। * * বঙ্গদেশ যখন স্বাধীন ছিল, পাল-বংশীয় রাজগণ যখন গৌড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, যখন বাঙ্গালী বীরের পদভরে বঙ্গভূমি কাঁপিত—সেই সময়—সেই শুভ সময়—এই কাব্যের উৎপত্তিকাল। * * * * বঙ্গের অপর কোনও কাব্যে যে দৃশ্য কেহ কখন দেখে নাই, তাহা ঘনরামে আছে। অশ্বে আরোহণ করিয়া, কোমলাঙ্গে কঠিন বর্ম্ম পরিয়া বাঙ্গালী বীর রমণীর যুদ্ধে গমন কোন্ কাব্যে এ নয়ন মনোহর দৃশ্য আছে?"

ধর্ম্ম-মঙ্গল-বর্ণিত অজেয় মহাবীর ইছাই ঘোষের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। সুপণ্ডিত হাণ্টার তাঁহার **Annals of Rural Bengal** নামক পুস্তকে ইছাই ঘোষ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দিয়াছেন।

এ যুগের অনুবাদ-সাহিত্য

এই যুগের অনুবাদকগণ সংস্কৃতের ধন-ভাণ্ডার হইতে সম্পদ আহরণের জন্য বিশেষ লোলুপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে,—"কবিকঙ্কণের পরে প্রকৃতি বাঙ্গালীর পর হইলেন—শাস্ত্র আপন হইল; * * * এবং কবিগণ প্রকৃত মানুষ না দেখিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ছবিগুলি দেখিয়া পাগল হইলেন। সংস্কৃতের নানারূপ অদ্ভুত উপমা ও ভাবদ্বারা লেখনীগুলি ভূতাশ্রিত হইল, তাহারা সত্যযুগ হইতে আসিয়া কলিযুগের মানুষগুলির উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল।" এ যুগে বহু সংস্কৃত পুস্তক অনূদিত হইয়াছিল তন্মধ্যে নৈষধ, ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যান, হরিবংশ, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রামায়ণের অনুবাদকগণ

কৃত্তিবাস ভিন্ন অপরাপর প্রধান রামায়ণ অনুবাদকগণের নাম আমরা ইতঃপূর্ব্বে করিয়াছি। এ যুগের রামায়ণ-অনুবাদগণের মধ্যে ষষ্ঠীবর সেন গঙ্গাদাস সেন এবং ময়মনসিংহের মহিলা-কবি চন্দ্রবতী প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। চন্দ্রবতী মনসা-মঙ্গল রচয়িতা কবি বংশীদাসের কন্যা। ইনি কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাটওয়ারী গ্রামে বাস করিতেন। বংশীদাসের মনসা-মঙ্গল দীনেশ বাবুর মতে ১৫৭৬ অব্দে সমাপ্ত হয়। এই পুস্তক রচনার সময়ে চন্দ্রাবতী পিতার সহায়তা করিয়াছেন। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ কতক-গুলি গানের সমষ্টি। ইহা মৈমনসিংহ অঞ্চলে এখনও গীত হইয়া থাকে। এই রমায়ণ সম্পূর্ণ নহে; ইহাতে সীতার বনবাস পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

মহাভারতের অনুবাদকগণ

ইতঃপূর্ব্বে আমরা সঞ্জয়, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি মহাভারত-অনুবাদকগণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন রাজেন্দ্র দাস, গোপীনাথ দত্ত, গঙ্গা দাস সেন প্রভৃতি কবিগণ কাশীরাম দাসের পূর্ব্বে মহাভারতের অংশ-বিশেষের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন।

কাশীরাম দাস

কাশীরাম দাসই ধারাবাহিক ভাবে সমগ্র মহাভারতের প্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক। কাশীরাম বর্দ্ধমান জেলার ইন্দ্রাণী পরগণাস্থিত সিঙ্গি গ্রামে প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন।

কাশীদাসের অনূদিত মহাভারতে তাঁহার কবিত্ব-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কাশীর রচনা প্রসাদগুণে বিশেষভাবে সুসমৃদ্ধ। তাঁহার ভাষা বেশ সরল, সরস ও মধুর। সমগ্র গ্রন্থখানি ভক্তিরসে সমুজ্জ্বল। অনেকের ধারণা আছে, কাশীদাস সংস্কৃত জানিতেন না। কিন্তু এ ধারণা ভ্রমাত্মক।

কাশীদাসী মহাভারতে সংস্কৃত শব্দ-প্রয়োগের দক্ষতা এবং রচয়িতার সংস্কৃত-জ্ঞানের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ছদ্মবেশী অর্জ্জুন ও দ্রৌপদীর রূপবর্ণনা প্রভৃতিতে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

কাশীদাসী মহাভারতের সমগ্র অংশ কাশীরামের স্বরচিত নহে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কাশী-সুত রচিত "স্বর্গারোহণ পর্ব্বের" ১২৮২ সনে নকল করা একখানি পুঁথি পাইয়াছেন। উহাতে আছে,—"দ্বিজ-পদ রজ লয়্যা কাশীর নন্দন। জনকের আজ্ঞামত করিল রচন।" ইহাতে অনুমিত হয় যে, কাশীরাম তাঁহার পুত্র নন্দরামকে মহাভারতের অসমাপ্ত অংশ সম্পূর্ণ করিতে আজ্ঞা দিয়া গিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আর একটী জনপ্রবাদ আছে, "আদি সভা বন বিরাটের কত দূর। ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর।" সম্ভবতঃ এই প্রবাদও সত্য।

বাঙ্গালা মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশ—বাঙ্গালা মহাভারতে শ্রীবৎস-চিন্তার উপাখ্যান প্রভৃতি বহু প্রক্ষিপ্ত অংশের সমাবেশ আছে।

বারমাসী ও চৌতিশা

বারমাসীঃ—প্রাচীন কবিগণ বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে ও বিভিন্ন মাসে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে নায়ক নায়িকার মনোভাবের যেরূপ পরিবর্ত্তন ও ভাব-বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় তাহা এবং বৎসরের বিভিন্ন মাসে নর-নারীর জীবন যাপন কাহিনী অবলম্বনে কবিতা রচনা করিতেন। এই কবিতাগুলি বারমাসী বা বারমাস্যা নামে অভিহিত। এই বারমাসী কবিতা প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে যথেষ্ট মিলে। তন্মধ্যে রাধিকার বারমাসীগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত। প্রচলিত রাধিকার বারমাসীগুলির মধ্যে গোবিন্দ দাস রচিত বারমাসীটিই বোধহয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এখানে আমরা নদীয়া ও যশোহর জেলার সংযোগ স্থলের বংকিরা গ্রাম হইতে ভিখারীদিগের নিকটে প্রাপ্ত রাধিকার বারমাসীর কিয়দংশ সন্নিবেশ করিতেছি,—"মাঘেতে

মাধব কৈল মথুরায় গমন। দশদিক্ শূন্য হইল নব বৃন্দাবন॥ ফাল্গুনে দ্বিগুণ আগুন চিত্তে ওঠে রোল। গোবিন্দ গোকুলে নাই কে করিবে দোল॥ চৈত্রেতে চাতক পাখী নিকুঞ্জ-মন্দিরে। পিয়া পিউ রব করে ডাকে উচ্চৈঃ-স্বরে॥ বৈশাখে বিদেশে গেছে শ্যাম গুণমণি। মোর ঘরে কৃষ্ণ নাই কে খাবে নবনী॥ জ্যৈষ্ঠেতে যমুনার জলে খেলতেন বনমালী। শ্যাম অঙ্গে দিতাম জল পূরিয়া অঞ্জলি।" ইত্যাদি।

চৌতিশাঃ—'ক' হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যঞ্জনবর্ণের অক্ষরগুলি পর পর ছত্রের প্রথমে রাখিয়া রচিত দেব-দেবীর মাহাত্ম্যসূচক ৩৪ অক্ষরের কবিতাগুলি চৌতিশা নামে অভিহিত। এই চৌতিশা কবিতা অনেক আছে। এখানে আমরা লোকমুখে প্রচলিত শ্রীচৈতন্যের চৌতিশা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি—কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য অবতার। খেলিবারে প্রবন্ধ খোল করতাল॥ গড়াগড়ি যান প্রভু নিজের সংকীর্ত্তনে। ঘরে ঘরে হরিনাম দিচ্ছে সর্ব্বজনে॥ ইত্যাদি।

এই সময়ের দেশের অবস্থা ও আচার-ব্যবহার

এই সময়ে বঙ্গদেশে বিদ্যাচর্চ্চার প্রসার বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থাও নিতান্ত মন্দ ছিল না। ইতঃপূর্ব্বে আমরা ময়মনসিংহের মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর উল্লেখ করিয়াছি। পদাবলী-সাহিত্যে শিখি মাইতির ভগিনী মাধবী দাসীর রচিত কয়েকটী সুললিত বৈষ্ণবপদ পরিদৃষ্ট হয়। কবি কঙ্কণ চণ্ডীতে দেখা যায় যে, বণিক-রমণী খুল্লনা স্বামীর হস্তাক্ষর চিনিতেন। দেশে সৈনিক পুরুষ যথেষ্ট ছিল। দ্রব্যাদি অনেক সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইত। ভদ্র ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা পাদুকা পরিধান করিতেন না। শয়নগৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পা ধুইয়া পাদুকা পরিয়া যাইতেন। রমণীগণ কঙ্কণ প্রভৃতি স্বর্ণালঙ্কার, 'মেঘডম্বুর' শাড়ী ও কাঁচুলি পরিতেন। সুন্দরীগণ সাবানের পরিবর্ত্তে আমলকীর দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

কবি আলাওয়াল

কবি আলাওয়াল মুকুন্দ ও কাশীরামের পরবর্ত্তী। ইনি পদ্মাবতী কাব্য রচনা করিয়া সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আলাওয়ালের পদ্মাবতী মীর মহম্মদ-রচিত হিন্দি "পদ্মাবৎ" কাব্যের অনুবাদ। কবি আলাওয়াল ফতেয়াবাদ পরগণার জালালপুর নামক স্থানের অধিপতি সমসের কুতুবের জনৈক অমাত্যের পুত্র। ইঁহার পিতা পর্টুগীজ জল-দস্যুগণকর্ত্তৃক নিহত হইলে কবি আরাকানের রাজার অমাত্য মাগন ঠাকুরের শরণাপন্ন হন। এই মাগন ঠাকুর মুসলমান ছিলেন। ইনি আলাওয়ালের কবিত্ব-শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মীর মহম্মদের পদ্মাবৎ কেচ্ছার অনুবাদ করিতে আদেশ দেন।

পদ্মাবতী কাব্যে আলাওয়ালের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও নানামুখী প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহাতে দৃষ্ট হয় যে, তিনি হিন্দুদিগের রীতিনীতি ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতির সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিষশাস্ত্রেও তাঁহার অনেকখানি অধিকার ছিল।

বঙ্গসাহিত্যের কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ

এ যুগের সাহিত্যের আদর্শ

এ যুগের সাহিত্যের অন্যতম উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। তাই এই যুগ নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ বা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের যুগ নামে অভিহিত। এই যুগের সাহিত্যের আদর্শের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সাহিত্যের আদর্শের আশমান জমিন তফাৎ। এখন রাজসভায় সমানীত হইয়া বঙ্গভাষার পল্লীবাসিনী-সুলভ সেই সরল, সহজ ও অনাড়ম্বর মূর্ত্তিটী হারাইল। রাজসভার বড় বড় পণ্ডিতগণ কেতাব-সাগর

সেঁচা উপমা ও অলঙ্কারের মণিমুক্তা দিয়া বঙ্গভাষাকে সুসজ্জিত করিতে অগ্রসর হইলেন। এরূপ উপমা অলঙ্কারের ছড়াছড়ি কখনও সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করে না বরং হ্রাস করিয়া দেয়। যখন সাহিত্যের ভাব-সম্পদের দৈন্য উপস্থিত হয়, তখনই ইহার বাড়াবাড়ি দেখা দেয়।

এ যুগের সাহিত্য মুসলমান-সাহিত্যের ভাবধারায় বিশেষভাবে পরিপুষ্ট। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্রের মতে বিদ্যাসুন্দরের সিঁধকাটা বিলাস এবং কুটনী দাসীর সাহায্যে গৃহস্থ ঘরের কন্যা বশীকরণ মুসলমানী প্রভাবের ফল। এতদ্ভিন্ন চিত্রপটে নায়িকার রূপ দেখিয়া বা রূপের কথা শুনিয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া নায়িকার অনুসন্ধানে বাহির হওয়া উর্দ্দু ও পারসীগল্পের নায়কগণকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ১৬৩৪ শকে বর্দ্ধমান জেলার একটী পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা নরেন্দ্র নারায়ণ রায় একজন সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ছিলেন। ঘটনাচক্রে বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের রোষ-দৃষ্টিতে পড়ায় ইনি হৃতসর্ব্বস্ব হন। এই সময়ে ভারতচন্দ্র মাতুলালয়ে গমন করিয়া সংস্কৃত শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। ১৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কবিবর পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি শুধু সংস্কৃত শিক্ষা করায় অগ্রজবৃন্দ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হওয়ায় হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে আসিয়া, পারসী ভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন। অতঃপর ভারত গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, বর্দ্ধমানের রাজকর্ম্মচারীদিগের চক্রান্তে কারারুদ্ধ হন। সৌভাগ্যক্রমে কবি কারাধ্যক্ষের অনুগ্রহে মুক্ত হইয়া, কটকের সুবাদার শিবভট্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি অনুগ্রহ-পরবশ হইয়া পলাতক কবিকে শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করিবার উপায় করিয়া দেন। পরে নানারূপ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পর কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের শ্রেষ্ঠ-কবি ফরাসডাঙ্গার ফরাসী গভর্ণমেণ্টের ধনাঢ্য দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ পাল

চৌধুরী মহাশয়ের নিকট উপনীত হন। কিছুকাল পরে তাঁহারই অনুরোধে নদীয়াধিপতি কবি ভারতের প্রতিপালন-ভার গ্রহণ করেন। মহারাজ ভারতের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া, ইঁহাকে রায়গুণাকর উপাধি প্রদান করেন এবং কবি রাজার আদেশানুযায়ী অন্নদা-মঙ্গল ও বিদ্যা-সুন্দর রচনায় ব্রতী হন।

ভারতচন্দ্রের ভাষা ও রচনারীতি

ভারতচন্দ্র শব্দমন্ত্রের ঐন্দ্রজালিক। তাঁহার অপূর্ব্ব শব্দমন্ত্রই তাঁহার রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। শ্লেষ, যমক, উপমা, অতিশয়োক্তি প্রভৃতিতে ভারত কবি মুক্ত-হস্ত। তাঁহার রচনা চিত্ত অপেক্ষা কর্ণের নিকটই সমধিক আদরণীয়। বাঙ্গালা ছন্দকে যে ভারত কবি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার এই উপমা ও অতিশয়োক্তির হরিলুটের মধ্যেও কাব্য-বর্ণিত নায়ক নায়িকার চরিত্র এবং চিত্রগুলি সেরূপ ভাবে ফুটিতে পারে নাই। তাঁহার প্রসিদ্ধ বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের মধ্যে কেবলমাত্র হীরামালিনীই জীবন্তভাবে ফুটিয়াছে। প্রাচীন-পন্থীগণ ভারতচন্দ্রের প্রতি অত্যধিক সমাকৃষ্ট ছিলেন। স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ভারতের রচনা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"ইংরেজিতে পোপের ও সংস্কৃতে বাল্মীকির রচনা যেরূপ মধুর, আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালাতে ভারতচন্দ্রের রচনাও সেইরূপ।"

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

ভারতের অন্নদামঙ্গল কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কাব্য-গ্রন্থ। অন্নদামঙ্গল বিভিন্ন তিনভাগে বিভক্ত। ইহার প্রথম ভাগে দক্ষযজ্ঞ, শিব-বিবাহ ও ভবানন্দের জন্ম-বিবরণ, দ্বিতীয় ভাগে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান এবং তৃতীয় ভাগে মানসিংহ কর্ত্তৃক যশোর-বিজয় বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তিনি "রস-মঞ্জরী", অসম্পূর্ণ "চণ্ডী-নাটক", "সত্যনারায়ণের পাঁচালী" ও বহু খণ্ড-কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসুন্দর

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। অনেক কবিই ইহা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন। তন্মধ্যে কায়স্থ কবি গোবিন্দ-দাস, কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিছুকাল পূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিদ্যা-সুন্দরের বিভিন্ন রচয়িতা সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক রামায়ণের বহু অনুবাদক থাকা সত্ত্বেও যেমন কৃত্তিবাস এবং মহাভারতে কাশীরাম দাস প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানে ভারতচন্দ্রই তেমনি সর্ব্বজনবিদিত।

অনেক নীতিবাগীশ সমালোচক শ্লীলতার দোহাই দিয়া ভারত কবির বিদ্যাসুন্দরকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিতে কৃতসংকল্প। অবশ্য উহার "বিহারারম্ভ", "বিপরীত বিহার" প্রভৃতি অংশ নিতান্তই কুরুচিপূর্ণ। পরন্তু এগুলি বর্জ্জন করিলেও কাব্যের কোন রূপ অঙ্গহানি হয় না। বর্ত্তমান সংস্করণ গুলিতে ঐ সকল অংশ বর্জ্জিত হওয়াই উচিত। তদ্ভিন্ন বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের বিষয়গত বা ভাবগত অশ্লীলতা লইয়া যাঁহারা নাসিকা কুঞ্চন করিতে চাহেন, আমাদের মতে তাঁহাদিগের কাব্য বা সাহিত্য না পড়াই শ্রেয়ঃ। কেননা তাহা হইলে জগতের বেশীর ভাগ সাহিত্যই তাঁহাদিগের পাঠের অযোগ্য কিংবা তাঁহারাই পাঠ করিবার পক্ষে অযোগ্য থাকিয়া যান। বিদ্যাসুন্দরে অন্যান্য ত্রুটি যথেষ্ট আছে; কিন্তু উহা যে Romance হিসাবে মূল্যবান্ তাহাতে সন্দেহ নাই।

সাধক রামপ্রসাদ

শ্যামা-সঙ্গীতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রসাদ, ২৪ পরগণা হালিসহরের অন্তঃ-পাতী কুমারহট্টগ্রামে বৈদ্যবংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তঁহার পিতার নাম রামরাম সেন। রামপ্রসাদ ১৭১৮ হইতে ১৭২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত

হইয়াছিলেন। ইনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক। এই বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী রাজা বঙ্গের অন্যতম সাধক কবিকে ১০০ বিঘা নিষ্কর ভূমি এবং "কবিরঞ্জন" উপাধি দান করিয়া উৎসাহিত করেন। কৃষ্ণচন্দ্র প্রসাদ কবিকে স্বীয় রাজসভায় আনয়ন করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু বিষয়-নিস্পৃহ সাধক কবি তাহাতে সম্মত হন নাই। কথিত আছে রামপ্রসাদ জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির মুহুরী ছিলেন। কিন্তু সাধক কবির চিত্ত কিছুতেই জমীদারী সেরেস্তার কড়া, ক্রান্তি ও বাকী ওয়াশীলের মধ্যে নিবিষ্ট থাকিতে পারে নাই। তিনি জমীদারী সেরেস্তার খাতাপত্রে মাঝে মাঝে দুই চারিটী শ্যামা-সঙ্গীত লিখিয়া মন-প্রাণের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেন। একদিন সেরেস্তা পরিদর্শনের সময় উহা তাঁহার মনিবের দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। তদ্দর্শনে উক্ত উদার ও অভিজ্ঞ ভূস্বামী কবিকে মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকে বিষয়-কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক শ্যামা-সঙ্গীত রচনা করিবার উপদেশ দেন।

রাম প্রসাদের শ্যামা-সঙ্গীত সম্বন্ধে বাঙ্গালী পাঠককে বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। তাঁহার অমৃতবর্ষী মাতৃস্তুতির অন্ততঃ দুই চারিটীও কণ্ঠস্থ নাই এমন বাঙ্গালী বোধ হয় খুব কমই আছে। প্রসাদ কবির প্রাণভরা মাতৃমন্ত্রের প্রতিধ্বনি এখনও বঙ্গের আকাশ বাতাস ও কানন কান্তার মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে।

শ্যামা-সঙ্গীত ব্যতীত রামপ্রসাদ "বিদ্যাসুন্দর" ও "কালীকীর্ত্তন" রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই কালী-কীর্ত্তন সম্পূর্ণভাবে বৈষ্ণবী রীতিদ্বারা সুশাসিত। ইহাতে ব্রজলীলার অনুকরণে কালীমাতার গোষ্ঠ, রাসলীলা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু শ্যামা-সঙ্গীতই রামপ্রসাদকে কালজয়ী করিয়াছে।

রামপ্রসাদের আগমনী গানগুলি বঙ্গসাহিত্যের এক অনুপম সম্পদ। এ গুলির ন্যায় অফুরন্ত বাৎসল্য-রসের প্রবাহ বঙ্গ-সাহিত্যে খুব কমই মিলে। মেনকা বাঙ্গালার মাতৃ-হৃদয়ের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। এই বাৎসল্য-ভাবমূলক

ভগবৎপ্রীতির পুণ্যসলিলে স্নাত হইয়া, বাঙ্গালার শারদোৎসব স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। আর এই ভাবকে ভাষায় অভিব্যক্তি দিয়া শারদোৎসব-বিষয়ক প্রচলিত গান ও ছড়াগুলি বাঙ্গালী ভক্ত ও ভাবুকের মনোরাজ্যে অক্ষয় আসন স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। গত ১৩৩৭ সালের ভাদ্র সংখ্যার "ভারতবর্ষে" একটী আগমনী-বিষয়ক ছড়ার আলোচনা-কালে আমরা ইহা বিশদ ভাবে বিবৃত করিয়াছি। কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লিখিয়াছেন,—"আমাদের বাংলা দেশের এক কঠিন অন্তবেদনা আছে—মেয়েকে শ্বশুর-বাড়ী পাঠানো। অপ্রাপ্তবয়স্ক, অনভিজ্ঞ, মূঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়, সেইজন্য বাঙালী কন্যার মুখে সমস্ত বঙ্গদেশের একটী ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ কাতর স্নেহ বাংলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই ঘরের স্নেহ, ঘরের দুঃখ, বাঙালীর গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাঙালীর হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসব পল্লবে ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙালীর আম্বিকা-পূজা এবং বাঙালীর কন্যা-পূজাও বটে। আগমনী এবং বিজয়া বাংলার মাতৃহৃদয়ের গান।"

বাঙ্গালা তান্ত্রিক গান ও তন্ত্রবিষয়ক পুঁথি

রামপ্রসাদের অনেক গানের মধ্যে তান্ত্রিক মতের নিগূঢ় মর্ম্মকথা নিহিত আছে। তাঁহার "ষট্চক্র বর্ণন" ও "ষট্চক্র ভেদ" গান দুইটীতে সংক্ষিপ্ত ভাবে ষট্চক্র ভেদ রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত গান কয়টীতেও প্রত্যক্ষভাবে ষট্চক্র রহস্যের কথা পাওয়া যায়। গত ১৩৩৮ সালের কার্ত্তিক সংখ্যার "মাসিক বসুমতী"তে প্রসঙ্গান্তরে আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

"কে জানে গো কালী কেমন।
ষড়্-দর্শনে না পায় দরশন ॥

কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁরে মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন॥"

"এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে।
সহস্র কমল দলে শ্রীনাথ অভয় দিয়ে বসে আছে॥
দ্বারে আছে শক্তি বাঁধা চৌকিদারী ভার লয়েছে।
সে শক্তির জোরে চেতন করে তাহ'তে প্রাণ নির্ভয়ে আছে॥
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে কণ্ঠ যুগে ভুরু মাঝে।
এই চারি স্থানে চারি শিব নবদ্বারে চৌকী আছে॥"

তন্ত্র সম্বন্ধীয় বাঙ্গালা পুঁথি খুবই বিরল। এ যাবৎ একখানি মাত্র তান্ত্রিক পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। পুঁথিখানির নাম সাধকরঞ্জন। কয়েক মাস পূর্ব্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় কৌল-মার্গ বিষয়ে একখানি খণ্ডিত পুঁথি প্রকাশ করিয়াছেন। বর্দ্ধমানে অনেক কৌল আছেন; ইঁহাদের নিকট অনুসন্ধান করিলে সম্ভবতঃ কিছু কিছু পুঁথি পাওয়া যাইতে পারে।

বাঙ্গালায় তান্ত্রিক গান ও গীতি-পুস্তকের মধ্যে কাটোয়া হইতে প্রকাশিত "গীতিকোচ্ছ্বাস বা ক্ষেপার গান" নামধেয় পুস্তিকাখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ। উহাতে প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ষট্‌চক্রভেদ-রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সংখ্যার "মাসিক বসুমতী" পত্রিকায় "নদীয়ার সাধক পল্লী-কবি" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা তান্ত্রিক সাধক রাধারমণের ষট্‌চক্রবিষয়ক কয়েকটী অতীব মনোরম সঙ্গীত এবং উক্ত কবির সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। সাধক কবি রাধারমণ নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার খোকসা জানিপুরের সন্নিহিত যাবলবা গ্রামে কায়স্থ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে ইনি বিদ্যাশিক্ষার্থ খোকসা জানিপুর উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চিত্ত সাধন-মার্গের অনুগামী হওয়ায় বিদ্যালয়ে অধীত-বিদ্যা তিনি আশানুরূপ লাভ করিতে পারেন নাই। বিদ্যালয়ে অধীত

পরীক্ষায় পাশ করা বিদ্যার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে উচ্চতম ও শ্রেষ্ঠতম বিদ্যার অধিকারী করাই বোধহয় বিধাতার অভিপ্রেত ছিল। তাহার ফলেই নদীয়া একটী কেরাণী বা স্কুল-মাষ্টারের পরিবর্ত্তে ভক্তকবি কৃষ্ণকমল ও কাঙ্গাল হরিনাথের ন্যায় একজন বিশিষ্ট সাধক কবিকে পাইয়াছে। আমরা ইঁহার রচিত যে সকল গান পাইয়াছি, তৎসমুদয় হইতে কবির উচ্চতম শিক্ষা, পাণ্ডিত্য-সমন্বিত কবিত্ব ও তন্ত্রশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। মাত্র ৮।১০ বৎসর হইল এই সাধক কবি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এখানে আমরা ইহার একটী তান্ত্রিক গান সন্নিবেশ করিতেছি। নানা কারণে এই কবির সমগ্র সঙ্গীত সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। সঙ্গীতগুলির সমুদয় সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইলে, বিশেষ একটী মূল্যবান্ সামগ্রী হইবে সন্দেহ নাই।

সহস্রারে দিব্য-দর্শন

"শঙ্খিনী শিখরে দূরে মহাশূন্যে কেরে রাজে।
দীপ্ত করি সপ্ত চক্র ক্লৃপ্ত জ্যোতির্ম্ময় সাজে॥
শত শিশু সূর্য্য শোভা দশ শতদল পদ্মে,
রাখিয়া চরণ-পদ্ম বিলসিত সদ্মে,
কাম কলা শক্তি সঙ্গে, শোভে চিদানন্দ রঙ্গে,
অনাহত ছন্দ সুমধুরানন্দ মন্দ্রে বাজে॥

শীর্ষে বিসর্গরূপা মৃন্ময়ী মণ্ডিত ছত্র,
শূন্যে পাদ রুচি তার হেরি পদ্ম অধোবক্ত্র,
ওঙ্কারার্দ্ধে অর্দ্ধ ইন্দু তদুপরি পাদবিন্দু,
বন্দে * * * সে পদারবিন্দ রাজে॥

অধশ্চক্রে বীজচক্র সহ শক্তি সর্ব্ব,
সুসিদ্ধ সাধন বীর্য্যে স্তম্ভিছে অবিদ্যা গর্ব্ব,
প্রসুপ্ত ভুজঙ্গী তূর্ণ প্রবুদ্ধ হইয়া পূর্ণ,
ত্রিলিঙ্গ ষট্‌চক্র ভেদি ধায় মহাব্যোম মাঝে ॥

ষোড়শাধার রসচক্র উদ্দীপিত পরানন্দে
প্রমোদিত ঊর্দ্ধ মধ্য অধঃস্ফুট পদ্মগন্ধে
উন্মুক্ত সে ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্যোমে রাজে কোটী চন্দ্র
দ্বন্দ্ব ত্যজি মহানন্দে চল রাধা ডাকে মা যে ॥"

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত-সার

তৃতীয় খণ্ড

বৃটিশ-অধিকারে বঙ্গ-সাহিত্য

কবি ও পাঁচালীগানের যুগ

পলাশী বিজয়ের তিন বৎসর পরে ১৭৬০ আব্দ রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র বঙ্গের কাব্য-কানন আঁধার করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া "প্রভাকর" এর কবি ঈশ্বর গুপ্তের প্রভা দানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই আঁধারে দীপ্তিদান করিতে তাদৃশ প্রতিভা সম্পন্ন কোনও বাণী সেবকের আবির্ভাব হয় নাই। কেবল কবিওয়ালা ও পাঁচালীকারগণই এই সময়ে বঙ্গের নীরব কাব্য-কাননকে মুখর করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সময়কে আমরা "গানের যুগ" নামে আখ্যাত করিতে পারি।

কবি গান ঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয়ের মতে ১৭শ শতক হইতেই কবি গানের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু ১৭৬০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৩০ অব্দ পর্য্যন্তকালই কবিগণের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব-ময় যুগ। এই সময়ের মধ্যেই রাসু, নরসিংহ, হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু প্রভৃতি কবি-গায়কগণের সুললিত সঙ্গীতে বাঙ্গালা দেশ ভরপূর হইয়া উঠিয়াছিল।

রাসু ও নরসিংহ ঃ—ইহারা দুই ভ্রাতায় কবিগায়ক ছিলেন। ইহাদের নিবাস চন্দননগরের নিকটবর্ত্তী গোন্দল পাড়ায়। ইহারা জাতিতে কায়স্থ ছিলেন।

হরু ঠাকুর ঃ—স্বনামধন্য কবি-গায়ক হরু ঠাকুর বা হরেকৃষ্ণ কলিকাতা সিমলাতে জন্মগ্রহণ করেন। ১১ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হইবার পরই লেখা পড়া ত্যাগ করেন। অতঃপর ইনি রঘুনাথ দাস নামক জনৈক কবিওয়ালার পরিচালনাধীনে একটী সখের দল খুলেন। হরু ঠাকুর কবি গানে দেশজোড়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। হরু ঠাকুরের সহিত ফিরিঙ্গী কবিওয়ালা এন্টুনি সাহেবের কবির লড়াই বিশেষ উপভোগ্য বস্তু ছিল।

নিতাই বা নিতে বৈরাগী ঃ—নিতাই বৈরাগীর নিবাস চন্দননগরে। ইনি বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন। নিতাইএর সেরূপ কবিত্ব-শক্তি না থাকিলেও সুদক্ষ গায়ক ছিলেন। নিতে বৈরাগী এবং ভবানী বেণের কবির লড়াই দেখিতে বহুদূর হইতে লোক সমাগত হইত। একবার পূজার সময় কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে গান করিতে গিয়া তথায় নিতাইএর মৃত্যু হয়।

রাম বসু ঃ—রাম বসু বা রামমোহন বসু হাওড়ার নিকটবর্ত্তী শালখিয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি ভবানী বেণের কবির দলে যোগদান করেন পরে নিজে দল খুলেন। ইহার "সখী-সংবাদ" এবং দুর্গার আগমনীবিষয়ক গানগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

পরবর্ত্তী কবিওয়ালাগণের মধ্যে আমরা গদাধর মুখুর্য্যে, নীলমণি পাটনী, ভীমদাস মালাকর, লোকা বুগী, ভোলা ময়রা, চিন্তে ময়রা প্রভৃতির নাম করিতে পারি।

এই কবিওয়ালাগণ ঐ সময়কার কামরস-কলুষিত মুসলমানী কেচ্ছা ও বিদ্যাসুন্দরী ভাবধারার গতিরোধ করিয়া বৈষ্ণব সঙ্গীতের ভাব-মন্দাকিনী প্রবাহ প্রত্যানয়ন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পাঁচালী-গায়ক ভক্ত-কবি কৃষ্ণকমলের মধ্যে উহার প্রকৃষ্ট বিকাশ সাধিত হইয়াছিল।

টপ্পা গান

অনেকের মতে নিধু বাবুই বাঙ্গালা টপ্পা গানের প্রবর্ত্তক। এই টপ্পা প্রেম-মূলক গীতি-কবিতা। ইহাতে পরোক্ষভাবে পাত্র পাত্রীর মারফতে না বলাইয়া কবি নিজে প্রণয়-বিষয়ক আশা, নৈরাশ্য ও ব্যাকুলতা বিবৃত করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা টপ্পাগানে নিধু বাবুর স্থান সর্ব্বোচ্চে। ইনি বঙ্গের সারিমিঞা নামে পরিচিত।

নিধু বাবু ঃ—নিধু বাবুর পূর্ণ নাম রামনিধি গুপ্ত। ইনি ১৭১১ অব্দে ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী চাঁপতা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। নিধু বাবু নিজে একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ১৮৩৯ অব্দে নিধু বাবুর মৃত্যু হয়। এখানে আমরা নিধু বাবুর একটী গান উদ্ধৃত করিতেছি।

"নয়নের দোষ কেন ?
মনেরে বুঝায়ে বল নয়নের দোষ কেন ?
আঁখি কি মিলাতে পারে না হ'লে মনো মিলন॥
আঁখিতে যে যত হেরে, সকল কি মনে ধরে,
যেই যাকে মনে ধরে সেই তার হৃদিরঞ্জন॥"

নিধু বাবুর পরবর্ত্তী টপ্পা গান রচয়িতাদিগের মধ্যে কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীধর কথক প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

দাশুরায়

স্বনামধন্য পাঁচালীকার দাশরথি রায় মহাশয় ১৮০৪ অব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বাদমুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দাশু রায়ের পাঁচালী উচ্চ সাহিত্য হিসাবে খ্যাতিলাভের অযোগ্য হইলেও এ জাতীয় সাহিত্য মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দাবী করিতে পারে। দাশুর ভাষা-পরিপাট্য বিশেষ প্রশংসনীয়। এ সম্বন্ধে স্বয়ং বঙ্কিম বাবুই দাশুর যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার

রচিত পালাগুলির মধ্যে “নলিনী ভ্রমরোক্তি”, “দক্ষযজ্ঞ”, মানভঞ্জন “বিধবা-বিবাহ” প্রভৃতি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। “তাহার রচিত শ্যামা-সঙ্গীতগুলি অতীব প্রশংসনীয়। এগুলির মধ্যে সাধক কবি রামপ্রসাদের সেই প্রাণভরা ও অশ্রুঢালা ভক্তি জগতই পরিদৃষ্ট হয়। ১৮৫৭ অব্দে দাশুর মৃত্যু হয়।

ভক্ত-কবি কৃষ্ণকমল

নদীয়া মাজদিয়া ষ্টেশনের সন্নিহিত ভাজনঘাট গ্রামে ভক্ত-কবি কৃষ্ণকমলের জন্ম হয়। কৃষ্ণকমল একাধারে কবি ও কথক দুইই ছিলেন। ইঁহার কথকতা ও সুমধুর সঙ্গীতে এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে ভক্তি গঙ্গার প্রবাহ ছুটিয়াছিল।

কৃষ্ণকমল “স্বপ্ন-বিলাস”, “বিচিত্র-বিলাস” ও “রাই উন্মাদিনী” পালা রচনা করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কৃষ্ণকমলের “দিব্যোন্মাদ বা রাই উন্মাদিনী” বৈষ্ণবগণের বিশেষ আদরের সামগ্রী। “দিব্যোন্মাদ” সম্বন্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন লিখিয়াছেন,—“কৃষ্ণকমল বৈষ্ণব-গীতি পুনরুত্থান কালের শ্রেষ্ঠ কবি, * * * বিদ্যাপতির রূপবিলাস, চণ্ডীদাসের প্রাণের গভীরতা, আর কৃষ্ণকমলের “স্বাদিতে নিজ মাধুরী”তে যে বিরহ, এই তিনের অপূর্ব্ব রস-রচনা, কোন দেশের সাহিত্যে আজও পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই। * * চৈতন্য মহাপ্রভুর যে রাধাভাব, সেই জীবন্ত রাধাভাবের ছাপ কৃষ্ণকমলের রাই উন্মাদিনীর রাধিকায় ফুটিয়াছে। ভাগবতের উক্তি চৈতন্যের প্রেমাশ্রুতে ধৌত করিয়া কৃষ্ণকমল রাধিকা গড়িয়াছেন।” (বাঙ্গালার গীতি-কবিতা, পৃষ্ঠা ৩৫)

বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাস

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী মহামতি হ্যালহেড সাহেব ১৭৭৮ অব্দে বাঙ্গালা ভাষার একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। হ্যালহেড সাহেবের

এই ব্যাকরণ মুদ্রণ বাঙ্গালার নব যুগের সভ্যতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। পুস্তকখানি অবশ্য ইংরাজীতে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু উহাতে প্রয়োজন বোধে যে সকল বঙ্গাক্ষর সন্নিবিষ্ট করিতে হইয়াছিল, তাহা মুদ্রিত করিবার মত একসেট বাঙ্গালা টাইপ অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। তখন বাঙ্গালার Caxton, সিভিলিয়ান Wilkins সাহেব স্বহস্তে বঙ্গাক্ষর খোদাই করিতে অগ্রসর হন। ইঁহারই খোদিত অক্ষরে হুগলীতে হ্যালহেড সাহেবের ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। এই মহামতি সিভিলিয়ানের অপরিসীম প্রচেষ্টা শুধু হ্যালহেড সাহেবের ব্যাকরণ ছাপিয়াই নিঃশেষ হয় নাই,—এতদ্দেশীয় প্রাদেশিক ভাষার মুদ্রাযন্ত্র প্রচলনই তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এই মুদ্রাক্ষর নির্ম্মাণ-কার্য্য তাঁহার বাঙ্গালী সহকারী পঞ্চানন কর্ম্মকারকে শিক্ষা দেন। পঞ্চানন এবং তাহার সহকর্ম্মী মনোহর এই অভিনব শিল্পে সবিশেষ নিপুণতার পরিচয় দিয়া বাঙ্গালী শিল্পীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ইহার পরে মিশনারী কেরী সাহেব পঞ্চানন এবং মনোহরের সহায়তায় শ্রীরামপুরে একটী type foundry খুলেন। ইহাদের খোদিত অক্ষরেই কেরীকৃত বাইবেলের বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হয়। কয়েক বৎসর পরেই পঞ্চাননের মৃত্যু ঘটে। মনোহর এখানে প্রায় ৪০ বৎসরকাল মুদ্রানির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপূর্ব্ব নিপুণতার ফলে বাঙ্গালা, নাগরী, আরবী ও পারসী ভাষার উৎকৃষ্ট মুদ্রাক্ষর নির্ম্মিত হয়।

বঙ্গসাহিত্যে ইউরোপীয় মিশনারীগণের দান

শ্রীরামপুর মিশন

ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধার জন্য পর্টুগীজ মিশনারীগণ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষা ও সাহিত্য চর্চ্চার বিবরণ আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। পর্টুগীজগণের পরে ইংরাজ মিশনারীগণের প্রচেষ্টার কথা বিশেষভাবে চিন্তনীয়।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা বিশেষ একটী সার্থক ঘটনা। ইহা কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতির আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে সংস্থাপিত হয়। কিন্তু বলিতে গেলে কেরীই উহার প্রাণ। এদেশীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিয়া প্রচার করিবার স্পৃহা বহু পূর্ব্ব হইতেই কেরীর হৃদয়ে বলবতী হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়েই তিনি পরম আগ্রহে বঙ্গভাষা অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। কেরী-কৃত বাইবেলের অনুবাদ ১৮০১ অব্দে শ্রীরামপুর মিশন হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার মুদ্রণের ইতিহাস আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। কেরীকৃত অন্যান্য পুস্তকের বিবরণ আমরা যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতেছি।

জনক্লার্ক মার্শম্যান ঃ—ডাঃ মার্শম্যানের পুত্র জনক্লার্ক মার্শম্যান বঙ্গভাষায় সবিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখনী-নিঃসৃত বাঙ্গালা গ্রন্থরাজি তাঁহার বঙ্গভাষায় পাণ্ডিত্যের বিজয়-কেতন। তন্মধ্যে, (১) ভারতের ইতিহাস, (২) বাঙ্গালার ইতিহাস, (৩) পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ, (৪) দেওয়ানী আইনের গ্রন্থ প্রভৃতি পুস্তক শ্রীরামপুর মিশন হইতে প্রকাশিত হয়। তাঁহার বঙ্গভাষায় পাণ্ডিত্য দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সরকারী অনুবাদক নিযুক্ত করেন।

ফেলিক্স্ কেরী ঃ—কেরীর পুত্র ফেলিক্স্ কেরী বাঙ্গালার জ্ঞান-ভাণ্ডারে একটী মূল্যবান্ জিনিস দিয়াছেন। ইঁহার "বিদ্যাহারাবলী"তে ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা সম্যগ্‌ভাবে আলোচিত এবং **Encyclopædia Britannica**র বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

সিভিলিয়ানদিগকে ভারতীয় সাহিত্য, ইতিহাস এবং প্রাদেশিক ভাষা প্রভৃতিতে কৃতবিদ্য করিবার অভিপ্রায়ে ১৮০০ অব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৮০১ অব্দে কেরী সাহেব উক্ত কলেজের সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার শিক্ষক এবং পরে প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানে আসিয়া কেরী বঙ্গভাষা-চর্চ্চার অপেক্ষাকৃত সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পাইলেন। কেবল তিনি নিজে বঙ্গভাষার চর্চ্চা করিয়াই পরিতৃপ্ত হন নাই, উক্ত কলেজের পণ্ডিত ও মুন্সীগণের মধ্যে বঙ্গভাষা অনুশীলনের তীব্র স্পৃহা জাগাইয়া তুলিলেন। তাঁহার প্রেরণাতেই উক্ত কলেজের মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, রাজীবলোচন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বঙ্গভাষার অনুশীলনে মনোনিবেশ করিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বাঙ্গালা সাহিত্য-সেবার একটী কেন্দ্র-ভূমিতে পরিণত হইল। এখান হইতে প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকগুলির মধ্যে কেরীকৃত "কথোপকথনমালা" "ইতিহাসমালা," "বাঙ্গালা ব্যাকরণ", "বাঙ্গালা অভিধান", মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "রাজাবলী", "প্রবোধ-চন্দ্রিকা, "বত্রিশ সিংহাসনের অনুবাদ" রামরাম বসুর "প্রতাপাদিত্য-চরিত্র, রাজীব লোচনের "কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত্র" প্রভৃতি সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

বাঙ্গালা গদ্যের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ

যে কোন ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করিতে গেলেই আমরা দেখিতে পাই,—প্রথমতঃ পদ্যের এবং তৎপরে গদ্যের উৎপত্তি। আমাদের বঙ্গভাষার ক্ষেত্রেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। বাঙ্গালা গদ্য বাঙ্গালা পদ্যের অনেক পরে সৃষ্ট হইলেও উহা একেবারে নূতন নহে,—বহু প্রাচীন। রামাই পণ্ডিতের শূন্য-পুরাণে প্রাচীনতম বাঙ্গালা গদ্যের নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয়। তৎপর বাঙ্গালা গদ্যের চরণ-চিহ্ন দেখা যায়, চণ্ডীদাস-রচিত "চৈত্যরূপ প্রাপ্তি"তে এবং চৈতন্য-পার্ষদ রূপগোস্বামীর "কারিকা"তে। এতদ্ব্যতীত সহজিয়া রসিকগণ কর্ত্তৃক লিখিত "আশ্রয় নির্ণয়", "ত্রিগুণাত্মিকা", "রস-ভক্তি-চন্দ্রিকা", "দেহ-ভেদ-তত্ত্বনিরূপণ" প্রভৃতি গ্রন্থেও বাঙ্গালা গদ্যের নিদর্শন যথেষ্ট মিলে।

ঢাকা পর্টুগীজ মিশনের অধ্যক্ষ Manoel da Assumpa Ca´o লিখিত "কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ" নামক বাঙ্গালা গন্থ গ্রন্থের উল্লেখ আমরা ইতঃপূর্ব্বে করিয়াছি। ইহার পর শ্রীরামপুর মিশনের কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতি মিশনারীগণ বাঙ্গালা গন্থকে যথেষ্ট সম্পন্ন করিয়া তুলেন। অতঃপর কেরীর অনুপ্রেরণায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মুন্সীগণ বাঙ্গালা গন্থের অনুশীলনে প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করিয়াছেন।

এইরূপে ১৯শ শতকের ১ম ভাগ পর্য্যন্ত আসিয়া বাঙ্গালা গদ্যের বিভিন্ন ৪টী রূপ দেখা দিল। ১। সাহেবী বাঙ্গালা, ২। পণ্ডিতী বাঙ্গালা, ৩। লোক-ব্যবহারে প্রচলিত বাঙ্গালা, ৪। আদালত বা বিষয়-কর্ম্মে ব্যবহৃত বাঙ্গালা।

১। **সাহেবী বাঙ্গালা** :—মিশনারী সাহেবরা ইংরাজীর ছাঁচে ঢালা যে বাঙ্গালা লিখিতে লাগিলেন উহা সাহেবী বাঙ্গালা নামে অভিহিত। নিম্নে আমরা ইহার একটু নমুনা দিতেছি :—

"প্রথমে ঈশ্বর সৃজ্জন করিলেন, স্বর্গ ও পৃথিবী। পৃথিবী শূন্য এবং অস্থিরাকার হইল এবং গভীরের উপরে অন্ধকার ও ঈশ্বরের আত্মা দোলায়-মান হইল জলের উপর॥"

২। **পণ্ডিতী বাঙ্গালা** :—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ সংস্কৃতের পণ্ডিতগণকেই বাঙ্গালাতে সমধিক অভিজ্ঞ মনে করিয়া, তাঁহা-দিগকেই বাঙ্গালা রচনা-কার্য্যে একমাত্র অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা যে বাঙ্গালা লিখিতে লাগিলেন তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে অনুস্বর-বিসর্গ-বিবর্জ্জিত সংস্কৃত-বিশেষ। নিম্নে আমরা ইহার একটু নমুনা সন্নিবেশ করিতেছি :—

"ইন্দুতে ইন্দীবর সুন্দর চিহ্ন চারুচ্ছবি বিস্তার করে। কামিনী কাঞ্চী মঞ্জীর মঞ্জুসিঞ্জিত করে। * * কোকিল কলালাপ বাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছী করাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।"

এতদ্ভিন্ন আদালতে এবং বিষয়-কার্য্যে ব্যবহৃত এক প্রকারের ভাষা ছিল। ইহা বাঙ্গালা ও পারসীর সংমিশ্রণে গঠিত। এই ভাষা দরবারী ভাষা নামে অভিহিত। ইহার নমুনা ঃ—

"চাকালা একব্বর পুরের হরে কৃষ্ণ চৌধুরী আজ রায় জবরদস্তী করিয়া দখল করিয়া ভোগ করিতেছে। আমি মাল গুজারীর সরবরাহতে মারা পড়িতেছি। উমেদার যে আমি ও এক চোপদার সর জমিনেতে গিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া আদালত করিয়া হক দেলাইয়া দেন।"

উপর্য্যুক্ত তিন প্রকারের ভাষা হইতে স্বতন্ত্র আর এক ধরণের ভাষা ছিল। এই ভাষাই তখনকার দিনের জনসাধারণের কথোপকথনের ভাষা। ইহাতে সংস্কৃত ও পারসী-প্রভাব অনেকখানি বিদ্যমান থাকিলেও ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুললিত, সুমিষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষা ছিল। এই ভাষাই কবিওয়ালাদিগের গানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

অতঃপর বঙ্গে নবযুগের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন নব জীবনের বার্ত্তা লইয়া বঙ্গের বাণী-মন্দিরে প্রবেশ করেন। রামমোহনের সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের তর্কযুদ্ধের ফলে পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতী ভাষা অনেকটা সহজাকার ধারণ করে। ইহার অব্যবহিত পরেই "বীরসিংহের সিংহ-শিশু" বিদ্যাসাগর বঙ্গবাণীর পূজায় ব্রতী হইলেন। বিদ্যাসাগরী ভাষা এখনকার মাপকাঠিতে দেখিতে গেলে বিশেষভাবে সংস্কৃত বহুল হইলেও উহা প্রসাদগুণে সুসমৃদ্ধ এবং তখনকার দিনে উহাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, সরল ও হৃদয়গ্রাহিণী ভাষা ছিল। যাহা হউক স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরই প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গভাষায় নব প্রাণের সঞ্চার করেন। তিনি সংস্কৃতের আস্তাকুড় হইতে উচ্ছিষ্ট না কুড়াইয়া লোক-ব্যবহারে প্রচলিত ভাষার ভিত্তিতে বাঙ্গালা গদ্যের গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্যারীচাঁদের "আলালের ঘরের দুলাল" তাঁহার এই প্রচেষ্টার নিদর্শন। বর্ত্তমানে চলিত-ভাষার সমাবেশে সৃষ্ট বাঙ্গালা গদ্যের যে সৌন্দর্য্যের তাজমহল গড়িয়া উঠিতেছে উহার ভিত্তি

প্যারীচাঁদই স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে এই বিদ্যাসাগরী ও আলালী ভাষার সমন্বয় সাধন করিয়া বঙ্কিমের ভাষা সমুদ্ভূত হয়। বঙ্কিমের রচনাতে সাধু ভাষায় লিখিত বাঙ্গালা গদ্যের চরম বিকাশ। প্যারীচাঁদ বঙ্গবাণীর যে অনুপম নিজস্ব মূর্ত্তির সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি নিজে সম্পূর্ণ সফল কাম না হইলেও বর্ত্তমানে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রতিভালোক উহাকেই বঙ্গের বাণীমন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যে বৃটিশ-বিজয়ের ফল

"পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে.
যাবেনা ফিরে,
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে।"

১৭৫৭ অব্দে পলাশীর গঙ্গাতীরে সম্পূর্ণ অভাবনীয়ভাবে যে ব্যাপারটী সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা ভারতীয় রাষ্ট্রে, সাহিত্যে ও সমাজ-নীতিতে যেমন যুগান্তরকর, তেমনি উহা পাশ্চাত্য জগতের এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসেও একটী ফলিতার্থময় ঘটনা। এই সৃষ্টি বিশ্বনিয়ন্তার পরিচালনাধীনে একটী নির্দ্দিষ্ট নীতি ও লক্ষ্যের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার বিভেদ, বিভিন্নতা ও ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়া বিশ্বসৃষ্টি একটী অখণ্ড তাৎপর্য্য ও সমন্বয়ের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। কেননা ইহার মূলে বিশ্বদেবতার সামঞ্জস্য ও সম্প্রসারণের কল্যাণকর উদ্দেশ্যটীই নিহিত রহিয়াছে। তিনি বিশ্বের সমস্ত পদার্থকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া একটী

বিপুল সমন্বয়ের পথে লইয়া যাইতেছেন। জাতিগত বা ব্যক্তিগত উত্থান পতন ও সাময়িক অমঙ্গল দেখিয়া উদ্বিগ্ন হওয়া আমাদিগের সংকীর্ণ দৃষ্টি ও ভ্রান্ত বুদ্ধির ফল। জড়বাদের প্রবল পীড়নে নিষ্পেষিত পাশ্চাত্য জগৎকে শান্তি, তৃপ্তি ও স্বস্তি লাভের জন্য অধ্যাত্ম্য-বাদী ভারতের সংস্পর্শে আসিবার বিশেষ আবশ্যক ছিল,—আর এই ভেদাভেদ পর্য্যসিত, একতাবন্ধন-বিহীন, রাষ্ট্রক্ষেত্রে উদাসীন জাতির পক্ষেও বর্ত্তমান জগতের আবহাওয়ার সহিত পরিচিত হইয়া, জাতীয়তা ও একতা শিক্ষা করিয়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত আপনাকে খাপ খাওয়াইয়া টিঁকিয়া থাকিতে পাশ্চাত্যের সংস্রব লাভ অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতে বৃটিশ-বিজয় এই উভয় উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিয়াছে। বৃটিশ-বিজয়ে প্রাচী ও প্রতীচীর চিন্তা ও ভাব-ধারার আদান-প্রদানের ফলে আজ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার অপূর্ব্ব সমন্বয়ে ভবিষ্যৎ মানব-সভ্যতার বিকাশ-চেষ্টা পরিদৃশ্যমান। বস্তু-তান্ত্রিক ইউরোপীয় সভ্যতা কেবল ধনসম্পদ ও বিলাস-বিভ্রমের বৃদ্ধি-চেষ্টায় অনবরত মারামারি কাটাকাটি করিয়া, জগতের শান্তি ও সমৃদ্ধি নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। কবি-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে,—

> "স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত,—লোভে লোভে
> ঘটেছে সংগ্রাম; প্রলয় মন্থন ক্ষোভে
> ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা উঠিয়াছে জাগি
> পঙ্ক-শয্যা হ'তে।"

এই ধনলিপ্সা ও বিজাতি-বৈরিতার হলাহলে জর্জ্জরিত ইউরোপকে ভারতই আজ শান্তি ও পরিতৃপ্তির মন্ত্র প্রদান করিতেছে। এই মহাব্রতের পৌরো-হিত্য গ্রহণ করিয়াছেন বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ। জগদ্বিখ্যাত মনস্বী মহা-মতি সিলভ্যাঁ লেভী রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"Tagor's works prove to us that in the people of India there are still hid-den such spiritual forces that we need not fear for the

future of India as a seat of highest mental culture that will yet have to teach a great deal to us in the west." অপর দিকে ইংরাজের গণতন্ত্র, সাম্যনীতি ও স্বাদেশিকতার আদর্শ বর্ত্তমান যুগের বঙ্গ-সাহিত্যে আত্মগরিমায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। হেম, মধু, নবীন, বঙ্কিম ও দ্বিজেন্দ্রলালে ইহার পূর্ণ পরিণতি। এতদ্ভিন্ন বঙ্গ-সাহিত্য আজ শুধু স্বদেশীয় সম্পদে নহে, ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী ইংরাজী-সাহিত্যের এবং বিশ্বের অপরাপর বিশিষ্ট সাহিত্যসমূহের রস-সম্ভারে পরিপুষ্ট হইতেছে। একজন কবি বঙ্গ-ভাষার প্রশস্তি গাহিতে গিয়া গাহিয়াছেন,—

> "বাজিয়ে রবি তোমার বীণে,
> আনল মালা জগৎ জিনে,
> তোমার চরণ-তীর্থে আজি
> বিশ্ব করে যাওয়া আসা।"

বাস্তবিকই বঙ্গের বাণীকুঞ্জ আজ বিশ্ব-সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য-সম্ভারে ভরপূর হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য শুধু বাঙ্গালীর নয়,—শুধু ভারতবাসীর নয়,—বাঙ্গালা সাহিত্য আজ বিশ্ববাসীর আদরের ধন।

এই ক্ষুদ্রাকার পুস্তিকাতে এ যুগের সাহিত্য সম্যক্‌রূপে ধারণা করা সম্ভবপর নহে। আমরা কেবল প্রধান প্রধান বাণী-সেবকের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর

রামমোহন ঃ—রামমোহন প্রধানতঃ সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইয়াই লেখনী ধারণ করেন। প্রতিবাদ-স্বরূপ হিন্দু-সমাজের পণ্ডিত ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তাহার ফলে বাঙ্গালার ভাল ভাল গ্রন্থ প্রকাশিত এবং বাঙ্গালা গদ্য ক্রমে পরিপুষ্ট ও মার্জ্জিত হইতে

লাগিল। রামমোহন "পৌত্তলিকদিগের ধর্ম্মপ্রণালী", "বেদান্তের অনুবাদ", "কঠোপনিষৎ", "পথ্য-প্রদান" প্রভৃতি গ্রন্থ-রচনা এবং "সংবাদ-কৌমুদী" ও "সমাচার-চন্দ্রিকা" নামক সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া বঙ্গ-ভাষার পরিপুষ্টি সাধন করেন। মহাত্মা রামমোহনই ভক্তি ও বৈরাগ্যোদ্দীপক সুমধুর ব্রহ্ম-সঙ্গীতের প্রথম রচয়িতা। এই সাধন-সঙ্গীতগুলি তাঁহাকে বঙ্গ-সাহিত্যে চিরবরেণ্য করিয়া রাখিবে।

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার ঃ—বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বগামী খ্যাতনামা লেখকগণের মধ্যে তারাশঙ্করের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাদম্বরীর অনুবাদই তারাশঙ্করের অন্যতম গ্রন্থ। তারাশঙ্করের কাদম্বরীর ভাষা এক সময়ে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। ইহার পরই বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের যুগ। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার প্রাণপণ পরিশ্রমে বঙ্গভাষাকে সহজ, সরল ও হৃদয়গ্রাহিণী করিবার প্রয়াস পাইলেন। এই মহাত্ম-দ্বয়ের প্রচেষ্টায় ইংরাজী ও সংস্কৃত-সাহিত্যের নানা সম্পদে বঙ্গভাষা সুসমৃদ্ধ হইতে লাগিল। অনুবাদে অনেক সময়ই মূলের সৌন্দর্য্য অনেকখানি বিনষ্ট হয়। কিন্তু প্রতিভাবান্ লেখকের হাতে পড়িলে অনুবাদ মূলের মতই সুখপাঠ্য হইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "শকুন্তলা", "সীতার বনবাস" ও "উত্তর-রাম-চরিত" প্রভৃতি অনুবাদ হইলেও মূলের সৌন্দর্য্য উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত তিনি মহাকবি সেক্সপীয়রের "Comedy of Errors" "ভ্রান্তি-বিলাস" নাম দিয়া অনুবাদ করেন। "বিধবা-বিবাহ" গ্রন্থে স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগরের হৃদয় অতি সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে আমরা কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহিত্যিক জীবনই অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। ইহার বিস্তৃত আলোচনা, এবং তাঁহার সেই বিপুল কর্ম্মময় জীবনের ইতিহাস, সেই অপার্থিব দয়া, সেই অতুলনীয় মহাপ্রাণতা এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সন্নিবেশ করা সম্ভবপর নহে।

কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত

গুপ্তকবি ১৮১২ অব্দে নৈহাটির নিকটবর্ত্তী কাঁচড়াপাড়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়াধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবী সুপ্রসন্ন না হওয়ায় বিদ্যালয়ে-অধীত-বিদ্যা গুপ্তকবির অদৃষ্টে বিশেষ জুটে নাই। ১২৩৭ বঙ্গাব্দে ইনি পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহায্যে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ প্রভাকর পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রভাকরেই গুপ্ত-কবির সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিকাশ হয়। একাধারে ধর্ম্ম, সমাজ, ও সাহিত্য-বিষয়ক বহু পদ্য গদ্যময়ী রচনা প্রভাকরে থাকিত। ব্যঙ্গ ও শ্লেষাত্মক কবিতায় গুপ্ত কবির সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কৃতিত্ব ছিল। স্বর্গীয় হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় বলেন,—"কবিতায় হাস্যরসের সম্যক্ বিকাশ, এ যুগে ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম দেখাইয়াছেন।" ইনি বঙ্কিম, দীনবন্ধু প্রভৃতি স্বনামধন্য মহারথগণের সাহিত্য-গুরু ছিলেন।

প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের গান ও জীবনী-সংগ্রহ গুপ্ত-কবির অক্ষয় কীর্ত্তি। ক্রমাগত ১০ বৎসর কাল নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া তিনি এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করেন। বাঙ্গালীজাতির মধ্যে এ বিষয়ে গুপ্ত-কবিই প্রথম অগ্রণী।

প্যারীচাঁদ মিত্র ঃ—কলিকাতানিবাসী প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। বঙ্গভাষায় প্রথম উপন্যাসিকের গৌরব প্যারীচাঁদেরই প্রাপ্য। তাঁহার "আলালের ঘরের দুলাল" বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস। এতদ্ব্যতীত কথিত ভাষা ও খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের সমাবেশে বাঙ্গালা গদ্য সৃষ্টি করিবার পথ তিনিই প্রথমে প্রদর্শন করেন। এই গ্রন্থ ছাড়া প্যারীচাঁদ "মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়", "রামারঞ্জিকা", "যৎকিঞ্চিৎ", "অভেদী" প্রভৃতি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের ইতিহাস

১৮১৬ অব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের "বেঙ্গল গেজেট"ই বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সংবাদ-পত্র। ইহার পরমায়ু অতি অল্পকাল-স্থায়ী ছিল। ১৮১৮ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীরামপুর মিশন হইতে মার্শম্যান সাহেব "দিগ্দর্শন" নামে একখানি সাময়িক পত্রের প্রকাশ করেন। ইহার মাত্র একটী সংখ্যা বাহির হইয়াছিল। এই "দিগদর্শন" শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাদৃত হইবামাত্র, শ্রীরামপুর মিশন হইতে "সমাচার-দর্পণ" নামক সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়। ১৮১৯ অব্দে রাজা রামমোহন "সংবাদ-কৌমুদী" এবং পরে "সমাচার-চন্দ্রিকা" প্রকাশ করেন। ইহার পর হইতেই একক্রমে অনেকগুলি সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়। ১৮৩০ অব্দে গুপ্ত কবির সুবিখ্যাত "সংবাদ-প্রভাকর" এবং ১৮৫৮ অব্দে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের "সোম-প্রকাশ" বাহির হয়। ইহার পূর্ব্বে এবং পরে অনেকগুলি সংবাদ-পত্রের উৎপত্তি ও বিলয় ঘটিয়াছিল। বঙ্গীয় সাংবাদিকতার (Journalism) ইতিহাসে উক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাম চিরদিন সুবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সেই সত্যনিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা,—পল্লীর অভাব অভিযোগের বিশদ বর্ণনা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের সেই জ্বলন্ত উপদেশ আধুনিক সংবাদ-পত্রগুলির এই অধঃপতনের দিনে বিশেষভাবে স্মরণ করিবার বিষয়।

বর্ত্তমান সময়ের বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রগুলির মধ্যে "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী" ও "সঞ্জীবনী"র একদিন প্রভূত খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। অধুনা-প্রচলিত বাঙ্গালা প্রাত্যহিকগুলির মধ্যে "দৈনিক বসুমতী", "আনন্দবাজার" ও "বঙ্গবাণী" সুবিখ্যাত।

বঙ্গীয় থিয়েটারের আদিকথা

Gerasim Lebedeff নামক জনৈক রুশীয় ভদ্রলোকই এদেশে প্রথম থিয়েটারের প্রবর্ত্তন করেন। তিনি ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৫নং ডোমতলা ষ্ট্রীটে

(বর্ত্তমান এজরা ষ্ট্রীট) বাঙ্গালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের সাহায্যে অভিনয় সম্পন্ন করেন। এই অভিনয়-উদ্দেশ্যে তিনি "The disguise" এবং "Love is the best Doctor" নামক দুইখানি ইংরাজী পুস্তক বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। অতঃপর ১৮২৬ অব্দে "সমাচার-দর্পণ" পত্রিকাতে পাশ্চাত্য-রীতি অনুযায়ী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা-জন্য আগ্রহাতিশয্য পরিদৃষ্ট হয়। এই সময়ে এতদ্দেশীয় নব্যশিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায় Shakespeareএর নাটক এবং সংস্কৃত নাটকের ইংরাজী অনুবাদ অভিনয় করিতে অগ্রগামী হন। ১৮৩১ অব্দে এইরূপে ইংরাজী ভাষায় ও ইংরাজী রীতিতে বাঙ্গালী অভিনেতৃগণ কর্ত্তৃক নাটকাভিনয় সম্পন্ন হয়। স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গঙ্গাচরণ সেন প্রভৃতি এই অভিনয়ের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সময়ে Julius Caesarএর কতকাংশ এবং উইলসন সাহেব কর্ত্তৃক অনূদিত "উত্তররামচরিত" অভিনীত হয়। অতঃপর ১৮৩৩ অব্দে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায় প্রায় ৪।৫ খানি বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় হয়। ইহাতে স্ত্রীলোকের ভূমিকা স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। এই সময়ে খুব সমারোহের সহিত বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় সম্পন্ন হয়। ইহার পর কয়েকবৎসরের মধ্যে আর নাটকাভিনয়ের বিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় না। কেবল স্কুল কলেজের ছেলেরা মাঝে মাঝে সখ করিয়া অভিনয় করিত। ১৮৫৩ অব্দে ডেবিড হেয়ার একাডেমীর ছাত্রগণ কর্ত্তৃক Merchant of Venice নাটক অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং "সংবাদ-প্রভাকরে" ইহার যথেষ্ট প্রশংসা বাহির হয়। ডেবিড-হেয়ার একাডেমীর ছাত্রগণের দৃষ্টান্তে Oriental Seminaryর ছাত্রগণও অভিনয়ের প্রতি মনোনিবেশ করেন। ইঁহাদেরই উদ্যোগে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। এই Oriental Theatre সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী-পরিচালিত নাট্যশালা। ইহা তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড ড্যালহৌসী বাহাদুরের বিশেষ প্রসংশা অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিল। ১৮৫৭ অব্দে পাথুরিয়া-

ঘাটার জয়রাম বসাকের বাড়ীতে "কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব" নাটকের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অতঃপর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ১৮৫৮ অব্দে "রত্নাবলী" নাটকের মাইকেলকৃত ইংরাজী অনুবাদ প্রভৃতি অভিনীত হয়। ইহার পরবর্ত্তী যুগে ১৮৭১ অব্দে নটরাজ গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর প্রচেষ্টায় ন্যাশান্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হইল।

বাঙ্গালা নাটকের আদি কথা

প্রাচীন ভারতে নাট্য-সাহিত্যের চরম বিকাশ সাধিত হইয়াছিল। কালিদাস, ভবভূতি, ভাস প্রভৃতির অমর লেখনী-নিঃসৃত নাটকাবলী জগতের নাট্য-সাহিত্যে অত্যুজ্জ্বল-রত্ন। বহু প্রাচীন গ্রন্থে নাট্যশালার উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতে দেখা যায় যে বিরাট রাজার ভবনে নাট্যশালা ছিল। এদেশের প্রাচীন নরপতিগণ নাটক-রচনা ও নাট্যাভিনয়ের বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। আধুনিক আদর্শের বাঙ্গালা নাটকের অস্তিত্ব ১৯শ শতকের পূর্ব্বে মিলে না। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে লোচনদাসের "জগন্নাথ-বল্লভ" যদুনন্দন দাসের "বিদগ্ধমাধব", প্রেমদাসের "চৈতন্য-চন্দ্রোদয়-কৌমুদী" প্রভৃতি যে সকল নাটক পাওয়া যায়, সংস্কৃত বা আধুনিক বাঙ্গালা নাটকের কোনটীর সহিতই উহাদের কোনরূপ সামঞ্জস্য নাই। আধুনিক আদর্শের বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তি আলোচনার পূর্ব্বে আমরা যাত্রা-গানে প্রচলিত "গীতাভিনয়" জাতীয় নাটকগুলির একটু উল্লেখ করিব। এই গীতাভিনয় জাতীয় নাটকগুলি ভক্ত কবি কৃষ্ণকমল, গোবিন্দ অধিকারী, মতিলাল রায়, রসিক চক্রবর্ত্তী, অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির দ্বারায় চরম বিকাশ লাভ করে। স্বর্গীয় তারাচরণ শিকদার-লিখিত "ভদ্রার্জ্জুন" আধুনিক আদর্শের প্রথম বাঙ্গালা নাটক। ইহাতে নট নাই, প্রস্তাবনা নাই এবং এক একটী অঙ্ককে বিভিন্ন গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করিয়া স্থান ও কালের ঐক্যকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। ইহার পর হরচন্দ্র

ঘোষ কর্ত্তৃক Shakespeareএর "Merchant of Venice অবলম্বনে "ভানুমতীর চিত্তবিলাস" নাটক রচিত হয়। অতঃপর নাটুকে রামনারায়ণের "কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব", "নব নাটক", "বেণী-সংহার" প্রভৃতি নাটক রচিত হইল। রামনারায়ণ অবশ্য সংস্কৃত-রীতির অনুসরণ করিয়াই নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই মহাকবি মধুসূদনের আবির্ভাব। বিয়োগান্ত বা বিষাদান্ত নাটকের অভিনয়-দর্শন ক্লেশকর ও নিষ্ঠুরতাপূর্ণ বলিয়া সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ ইহার রচনা বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য মতে বিষাদান্ত নাটকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রাচীন গ্রীসের এস্কাইলাস, সোফোক্লিস ও ইউরিপিডিসের নাম জগৎজোড়া। ইঁহাদের অমর লেখনী-প্রসূত নাটকাবলী সমগ্র জগতে সমাদৃত। পাশ্চাত্য রীতিতে দীক্ষিত নব্য-বঙ্গের মহাকবি মধুসূদনই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গ-ভাষায় বিষদান্ত নাটকের প্রবর্ত্তন করেন। বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রথম বিষাদান্ত নাটক মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী" ১৮৬০ অব্দে লিখিত হয়। ইহার পরে স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র কর্ত্তৃক বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্য যথেষ্ট পরিপুষ্ট হয়। অতঃপর নটরাজ গিরিশ, স্বদেশপ্রাণ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল, সুপরিচিত নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ, হাসির রাজা অমৃতলাল প্রভৃতির সাধনা-ফলে বাঙ্গালা নাটক উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে।

কবি হেমচন্দ্র

নব্যবঙ্গের অন্যতম কবি হেমচন্দ্র ১৮৩৮ অব্দে হুগলী জেলার গুলিটা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহাদের আদি নিবাস কলিকাতার নিকটবর্ত্তী উত্তরপাড়ায়। হেমচন্দ্র বি, এ ও বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক মাস মুন্সেফের কার্য্য করেন। তৎপর ১৮৬২ অব্দ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় আরম্ভকরেন। এই সময়ে তিনি যথো চিত প্রতিষ্ঠা ও অর্থোপার্জ্জনে

সমর্থ হন। তাঁহার হৃদয় মহৎ, উদার এবং কবিজন-সুলভ কোমলতায় পরিপূর্ণ ছিল। এই কোমলতা ও উদারতাবশে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া, পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ইহার ফলে কবিকে শেষ-জীবনে যৎপরোনাস্তি অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। মহাকবি মধুসূদনের পরলোকগমন উপলক্ষে হেমচন্দ্রের অমৃতময়ী লেখনী হইতে যে, "হায় মা ভারতী, চিরদিন তোর এ কুখ্যাতি কেন ভবে ? যে জন সেবিবে ও-পদযুগল সেই সে দরিদ্র হবে।" উক্তি নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহা হেমচন্দ্রের পরবর্ত্তী জীবনে বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে। জীবনের অপরাহ্নে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া এবং কমলার কোপ-দৃষ্টিতে পড়িয়া হেমচন্দ্র যে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইংরাজ কবি মিল্‌টনের শেষ জীবনেরই অনুরূপ।

সহৃদয় হেমচন্দ্রই "মেঘনাদ-বধ" কাব্যের উৎকৃষ্ট সমালোচনা লিখিয়া বঙ্গীয় সামাজিকগণ কর্ত্তৃক অনাদৃত মধুকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে ইনিই "আলো ও ছায়া"-রচয়িত্রীকে সর্ব্বসাধারণ্যে পরিচিত করেন।

হেম, নবীন ও মধু সমুন্নত পাশ্চাত্য সাহিত্যের সম্পদ আহরণ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। হেমচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম "চিন্তা-তরঙ্গিণী" প্রকাশ করেন। ইহা অনেক দিয়া ইংরাজ কবি **Byron**এর **Manfred**এর সমধর্ম্মী। তাঁহার "আশা-কানন"এর সহিত **Chaucer**এর **"House of Fame"** এবং **Pope** এর **Temple of Fame**এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ইটালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি **Dante**র **Divina Comedia** অবলম্বনে তাঁহার "ছায়াময়ী" রচিত হয়।

হেমচন্দ্রের স্বদেশ প্রেমাত্মক কবিতাগুলি ভাবে, মাহাত্ম্যে, ঔদার্য্যে ও উদ্দীপনায় **Byron**এর **Giaour** নামক কাব্য এবং **Campbell**এর স্বদেশ-প্রেমাত্মক কবিতাগুলির সহিত তুলিত হইতে পারে।

"বৃত্রসংহার" কবির পরিণত প্রতিভা ও সামর্থ্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী। বিশেষজ্ঞগণের মতে ক্লাসিক আদর্শের সাহিত্যের মধ্যে ইংরাজ কবি কীট্‌সের Hyperionই ইহাঁর একমাত্র তুলনাস্থল। হেমচন্দ্রের "বৃত্র-সংহার" সম্বন্ধে সমালোচক শশাঙ্কমোহন লিখিয়াছেন, "সকল দিক্‌ বিবেচনা করিলে এই কাব্যকে বাঙ্গালার সর্ব্বাপেক্ষা সুসম্পূর্ণ, সুগঠিত এবং সুলিখিত কাব্য বলা যাইতে পারে। বৃত্রসংহার কাব্যের নাটকীয় সমাধান সুন্দর। চরিত্রগুলি এক একটী বিশেষ বিশেষ স্থায়ী ভাবে অনুপ্রাণিত, কবির লক্ষ্য সর্ব্বত্র স্থায়ীভাবের উদ্দীপনায় স্থির আছে। * * * * বৃত্র-সংহারে চরিত্রের কিংবা ভাবের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্বচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। যে অবস্থায় কবির কণ্ঠ ক্রমশঃ কোমলে মধুরে নামিয়া আসিয়া, পরিশেষে শ্রোতৃমণ্ডলীকে হঠাৎ ভাবের অতলস্পর্শের সমক্ষে উপস্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং মনোরম গুহায় বিলীন হইয়া যায়, বৃত্র-সংহারে সে অবস্থা বিরল। কবির কণ্ঠ সর্ব্বত্র উচ্চগ্রামে বিরাজ করিতেছে। স্থানে স্থানে স্বর হয়ত কাটিয়া গিয়া, কর্কশতায় পরিণত হইতেছে, তথাপি শ্রোতৃবর্গ গায়কের শক্তি এবং স্বর-সাধনায় বিমুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেছে।"

হেমচন্দ্রের রুচি ও নীতি অতি উচ্চ এবং অতি পবিত্র। পাপের প্রতি ঘৃণা, সাধুতার প্রতি শ্রদ্ধা স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগ ও ব্যথিতের প্রতি সমবেদনাতে হেমচন্দ্রের কবি-হৃদয় ভরপূর ছিল।

কবিবর নবীনচন্দ্র

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন ১৮৪৬ অব্দে চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৮ অব্দে নবীন বাবু বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন। "অবকাশ-রঞ্জিনী" নবীনচন্দ্রের প্রথম রচনা। ইহার পরেই

তাঁহার অমর কাব্য "পলাশীর যুদ্ধ" রচিত হয়। অতঃপর তিনি "কুরুক্ষেত্র", "রৈবতক" ও "প্রভাস" প্রভৃতির রচনা করেন।

বায়রণ ও নবীনচন্দ্র ঃ—এই উভয় কবির জীবন ও প্রতিভার প্রকৃতি চিন্তা করিতে গেলে উভয়ের মধ্যে নানা সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকে। নবীনচন্দ্র প্রথম জীবনে বায়রণের মতই উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। অল্প বয়সেই কবির পিতৃবিয়োগ হয়। মাতা পুত্রের শাসন-ব্যাপারে বিশেষ অবহিত ছিলেন না। ইহার ফলেই নবীনচন্দ্র অনেক-পরিমাণে বায়রণের মত প্রবৃত্তিসম্পন্ন হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

কবি-প্রতিভার দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলেও দেখা যায় personal element বা আত্মসম্পর্ক যেমন বায়রণের রচনার একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য, তেমনি নবীনচন্দ্রেও উহা বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। Childe Harold কাব্যে বায়রণ যেমন Haroldএর মুখোস পরিয়া তাঁহার স্বীয় জীবন-কাহিনীই বিবৃত করিয়াছেন, নবীনচন্দ্রের "অবকাশ-রঞ্জিনী"ও তেমনি কবির আত্মকাহিনীরই অভিব্যক্তি। এতদ্ভিন্ন উভয় কবির মধ্যে ভাবগত এবং বিষয়-বর্ণনাগত সাদৃশ্য যথেষ্ট দেখাযায়। কিন্তু এতগুলি মিল সত্ত্বেও বায়রণ ও নবীনচন্দ্রের মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য লক্ষ্য করিবার আছে। ফরাসীবিপ্লবের পর ইউরোপীয় সাহিত্যসমূহে একটা ধ্বংসের কালানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্যে বায়রণের মধ্যেই উহার পূর্ণ পরিণতি। কিন্তু নবীনচন্দ্র ভল্টেয়ারের মন্ত্রশিষ্য বায়রণের মত ধ্বংস-প্রয়াসী কবি নহেন, তিনি গঠনপ্রয়াসী কবি। সংযম এবং সাবধানতায় তিনি বায়রণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সমালোচক শশাঙ্কমোহন নবীনচন্দ্রের পলাশীযুদ্ধ সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন,—"পরাধীন দেশের কবি নবীনচন্দ্রের সতর্ক-রুদ্ধ বাষ্পোচ্ছ্বাসই 'পলাশীর যুদ্ধের' প্রধান সৌন্দর্য্য।"

নবীনচন্দ্রে বায়রণ ব্যতীত Shakespeare ও মিলটন প্রভৃতির প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু "কুরুক্ষেত্র" "প্রভাস" প্রভৃতিতে নবীনচন্দ্র সম্পূর্ণ—

ভাবে ভারতীয় আদর্শের কবি। মোটকথা নবীনে পাশ্চাত্য-প্রভাব খুবই সামান্য। মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের রচনা নানা সমৃদ্ধিতে সুসমৃদ্ধ হইয়াও বৈদেশিক প্রভাবের আধিক্যবশতঃ বাঙ্গালী সাধারণের অন্তরের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু নবীনচন্দ্রের বিষয় নির্ব্বাচন, বক্তব্য এবং উদ্দেশ্য বাঙ্গালীর প্রকৃতি-বিহিতই হইয়াছে।

পলাশীর যুদ্ধঃ—নবীনের পলাশীর যুদ্ধ কাব্যের বিশেষত্ব উহার জাতীয়তার আদর্শ এবং স্বাধীনতার মর্ম্ম উপলব্ধি। ইহাতে কবির স্বদেশ-প্রেম এবং এই পর-পদানত জাতির জন্য মর্ম্মান্তিক হৃদয়-বেদনাই বিশেষভাবে প্রকটিত। হতভাগ্য সিরাজের জীবন-নাট্যের যবনিকা-পতন অথবা সুচতুর ক্লাইবের বীরত্ব বা কৌশল-জাল বিস্তারের কৃতিত্ব তাঁহার প্রতিভাকে সমাকৃষ্ট করে নাই। স্বাধীনতারূপ দুর্লভ রত্ন হারাইবার দরুণ কবির ক্ষুব্ধ-হৃদয়ের সতর্কতা-রুদ্ধ হাহাকারই "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই কাব্যের মোহনলালের মধ্যে আমরা কবির হৃদয়কেই পাইতেছি।

নবীনচন্দ্র ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করিতে সমধিক উৎসুক ছিলেন। নবীনের পলাশীযুদ্ধই বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রথম খাঁটি ঐতিহাসিক-কাব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় নবীন ইতিহাসের অভিনিবিষ্ট পাঠক ছিলেন না। অনেক সময়ে তিনি কল্পনা-নেত্রেই ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন। পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে ঐতিহাসিক বিষয়গত অনৈক্য বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। কিন্তু এখানে তাহার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নহে।

দোষেগুণে নবীনচন্দ্র একজন বিশিষ্ট প্রতিভাবান্ কবি। তাঁহার অবদান-সম্ভার বঙ্গের শ্বেত-দল-বাসিনীকে নানারত্নে সুসজ্জিত করিয়াছে। নবীনকে পাইয়া বঙ্গবাণী সুপুত্রের গৌরবে গৌরবিনী হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

মহাকবি মধুসূদন

মহাকবি মধুসূদন যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ী গ্রামে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে কায়স্থ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মধুসূদনের শিক্ষা, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনায় কালক্ষেপ না করিয়া, আমরা বঙ্গ-সাহিত্যে মধুসূদনের দান সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করিব। বঙ্গ-সাহিত্যে মহাকবি মধুসূদনের কার্য্যকাল মাত্র ৪টী বৎসর—১৮৫৮—১৮৬২ অব্দ পর্য্যন্ত। এই চারি বৎসরের মধ্যে মধুসূদন তাঁহার মাতৃভাষাকে যে সকল সম্পদের অধিকারিণী করিয়াছেন, বর্ত্তমানে আমরা তাহাই হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়াস পাইব।

বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের প্রথম দান এই পয়ার-প্লাবিত বঙ্গদেশে স্বাধীন অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি।

মধুসূদনের দ্বিতীয় দান বঙ্গসাহিত্যে পাশ্চাত্য কাব্য-গঠন-রীতির প্রবর্ত্তন। আমাদের দেশীয় কাব্যে কোন ঘটনা বিবৃত করিতে হইলে, উহার বীজ হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে উহার চরমতম পরিণতি পর্য্যন্ত বিবৃত করিবার রীতি ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতে এক একটী পাত্রের কথা বর্ণিত হইবার সময় তাহার বংশের উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে তাহার সন্তান সন্ততি পর্য্যন্ত অনুসরণ করা হইয়াছে। পৌরাণিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদনের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহাই এদেশীয় কাব্যের গঠন-রীতি ছিল। উহার একটী অংশকে অবলম্বন করিয়া কোন Message বা criticism of life উপস্থিত করা আমাদের কবিগণের নিকট একরূপ অবিদিত ছিল বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কোনও ঘটনার অংশ-বিশেষ অবলম্বন করিয়া রস সৃষ্টি করা বা criticism of life বিবৃত করাই পাশ্চাত্য কাব্যের বৈশিষ্ট্য। ক্রমাগত দশ বৎসর-ব্যাপী যুদ্ধের ফলে ট্রয়নগর ধ্বংস হয়। কিন্তু হোমার শেষ ভাগের

মাত্র কতিপয় মাসের ঘটনা লইয়াই তাঁহার ঈলিয়াডের রচনা করেন। মধুও এই আদর্শকে বরণ করিয়া, লঙ্কা-সংগ্রামের অংশ-বিশেষ অবলম্বনে মেঘনাদ-বধ কব্যের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন।) হেমচন্দ্র "বৃত্র-সংহারে" এবং নবীন "পলাশীর-যুদ্ধ"কাব্যে এই আদর্শকেই বরণ করিয়াছেন। এইরূপ খণ্ড বক্তব্যের রীতি প্রাচীন ভারতে একবার সমুদ্ভূত হইয়াছিল। মাঘের শিশুপাল-বধ এবং ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়ে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু এই রীতি ভারতীয় কাব্যে যে প্রচলিত হয় নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ মধু যে মাঘ বা ভারবির পরিবর্ত্তে উহা পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকগণ যে তাঁহারই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

(মধুসূদনের তৃতীয় দান বঙ্গ-সাহিত্যে গ্রীক অদৃষ্টবাদের অবতারণা। এই গ্রীক অদৃষ্টবাদই তাঁহার "পদ্মাবতী-নাটক" ও "মেঘনাদ-বধ" কাব্যের রস-নিষ্পত্তি করিয়াছে। আমরা হিন্দু; আমাদের বিশ্বাস এজন্মের কর্ম্মফল শুধু এই জন্মেই শেষ হইবে না। এক জন্মের কৃতকর্ম্মের ফল বহু জন্ম জন্মান্তরের ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিতে হইবে। কর্ম্মফলবশতঃই ন্যায়বান্ পরমেশ্বরের রাজ্যে কেহ বা জন্মান্ধ হইয়া জন্মিতেছে, কেহ বা চিরজীবন ন্যায়নিষ্ঠ ও সদাচার-পরায়ণ হইয়াও সারাটী জীবন নানা দুঃখ কষ্ট, ঘাত প্রতিঘাত, ও অসহ্য নিষ্পেষণের মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিতেছে। হিন্দুশাস্ত্র বলেন, ইহা আর কিছুই নহে,—ইহা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল। কিন্তু এই জন্মান্তর ও কর্ম্মবাদ যদি অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এই সকল ব্যাপার দেখিয়া বিশ্বস্রষ্টাকে আর ন্যায়বান্ ও সমদর্শী বলা চলে না। তখন মনে হয় একটা উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী ও পক্ষপাতী দৈব যন্ত্রের নিষ্পেষণ মধ্যে পড়িয়া অসহায় মানব এইরূপে বিপর্য্যস্ত হইতেছে। মানব ন্যায়নিষ্ঠই হউক, আর দুরাচার-সম্পন্নই হউক সেই স্বেচ্ছাচারী বিশ্বাধিপ যাহাকে সুনজরে দেখিবেন সেই সুখী, আর যে তাঁহার কুনজরে পড়িবে তাহার দুর্দ্দশার সীমা নাই। সংক্ষেপে বলিতে

গেলে ইহাই আমাদিগের আলোচ্য গ্রীক অদৃষ্টবাদের মূল কথা। এই দুর্ব্বোধ্য অদৃষ্ট-যন্ত্রকেই হোমার তাঁহার কাব্যের পরিচালনী-শক্তি বা **Machinery**রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপর্য্যুক্ত গ্রীক অদৃষ্টবাদই মেঘনাদ-বধ কাব্যের প্রাণ। মধুসূদনের রাবণ বাল্মীকির রাবণ নহেন, ইনি একজন আত্ম-সম্মানগর্ব্বী আদর্শ রাজা ও আদর্শ বীর পুরুষ। মধুসূদনের রাবণ কামাভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া সীতাহরণ করেন নাই। ভগিনীর অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্যই সীতাকে বন্দিনী করিয়াছিলেন। নতুবা মধুসূদনের রাবণের সীতার প্রতি একটুও কামাভিলাষ নাই। কিন্তু কেবল মাত্র দারুণ অদৃষ্ট-যন্ত্রের নিষ্পেষণের ফলেই ত্রিভুবনে অজেয় এই পরাক্রান্ত সম্রাট্ পদে পদে নিপীড়িত হইতেছেন। একে একে দেউটী নিবিতেছে,—সোনার লঙ্কা শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে,—ক্ষোভে ও রোষে জর্জ্জরিত হইয়া এই ত্রিভুবনজয়ী মহাবীর যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে বিধাতার অনিয়ম ও অবিচারের কথাই স্মরণ করিতেছেন।

"হে বিধি, এ ভব-ভূমি তব লীলাস্থলী,
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কিহে তুমি
হও সুখী? পিতা সদা পুত্র দুঃখে দুখী
তুমি হে জগৎ পিতা, একি রীতি তব।"

রাণী চিত্রাঙ্গদা ইহাকে কর্ম্মফল বলিয়া বুঝাইতে গিয়াছেন,—"হায় নাথ, নিজ কর্ম্মফলে, মজালে রাক্ষসকুলে মজিলা আপনি।" কিন্তু রাবণ তাহা গ্রহণ করেন নাই। উহা যে অদৃষ্ট-যন্ত্রেরই নির্ম্মম নিষ্পেষণ তাহারই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—(১) "গ্রহদোষে দোষীজনে কে নিন্দে সুন্দরী, হায় দেবী বিধিবশে সহি এ যাতনা আমি।" (২) বিধি প্রসারিছে বাহু বিনাশিতে লঙ্কা মম কহিনু তোমারে।" বলা বাহুল্য ইহা জন্মান্তর ও কর্ম্মফলবাদী ভারতের অদৃষ্টবাদ নহে,—ইহা গ্রীক অদৃষ্টবাদ।

মহাকবির চতুর্থ দান বঙ্গভাষায় ode-জাতীয় কবিতার সৃষ্টি। একটী বিশিষ্ট ভাবদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অভিভাষণ ও উচ্ছ্বাস-প্রকাশই এই ode-জাতীয় কবিতার বৈশিষ্ট্য। মধুসূদন ব্রজাঙ্গনার রাধার উক্তিতে পাশ্চাত্য ode-কবিতাকেই বঙ্গসাহিত্যে অবতারিত করিয়াছেন।

কবির পঞ্চম দান বঙ্গভাষায় সনেট কবিতার প্রবর্ত্তন। এই সনেট কবিতা **Renaissance** যুগের ইটালীর সৃষ্টি। ইউরোপীয় সাহিত্যগুলি ইহা ইটালী হইতেই গ্রহণ করিয়াছে। ইংরাজী সাহিত্যে **Shakespeare, Milton** ও **wordsworth** প্রভৃতির সনেটগুলি ইংরাজী খণ্ড কবিতার এক অতি অমূল্য সম্পদ। আমাদের বঙ্গসাহিত্যে সনেটে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত মধুর সমকক্ষ কবি কেহ এখনও আসেন নাই।

বঙ্গসাহিত্যে মধুর আর একটী বিশিষ্ট দান বঙ্গভাষায় বিয়োগান্ত নাটকের সৃষ্টি। এ সম্বন্ধে আমরা ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এক রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত মধুর ন্যায় প্রতিভাশালী কবি এ যুগে আর কেহ আবির্ভূত হন নাই। জনৈক সমালোচক মধুর সম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছেন,—"**His influence on the destinies and history of our literature might be compared to the achievement of Napoleon while he was winning the Victories that changed the Map of Europe.**"

বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিম

বঙ্গীয় সাহিত্য-গগনের অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বঙ্কিম ১৮৩৮ অব্দে নৈহাটী ষ্টেশনের সন্নিহিত কাঁঠালপাড়াতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ৺ যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন। বঙ্কিম প্রথমতঃ হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। পরে কলিকাতা হিন্দু কলেজ হইতে বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন।

বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী গ্রাজুয়েট। ইনি বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, তাঁহার সম্মানার্থ ফোর্ট উইলিয়ম হইতে তোপ-ধ্বনি হইয়াছিল শুনা যায়।

বঙ্কিমের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালা গদ্যঃ—বঙ্কিমের পূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্য বক্তৃতা দিবার, ধর্ম্মোপদেশ প্রচার এবং গভীর বিষয়-সমূহের আলোচনা ও নানা বিষয়ক গবেষণা করিবার উপযোগী হইয়াছিল। তাহার নিদর্শন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, কেশবচন্দ্র প্রভৃতিতে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ইহাকে দম্পতীর বিশ্রাম-কক্ষে, বিরহিণীর শূন্য-শয্যাপার্শ্বে, ঠাকুরমার মজলিসে, এবং পল্লীর বনবীথিতে গমনাগমন করিবার উপযোগী করিয়া তুলিতে,—এককথায় ধাঁধা লাগাইয়া দিবার যোগ্যতা প্রদান করিতে, বঙ্কিমের অসামান্য প্রতিভারই একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার আবির্ভাবের ফলেই যে উহা সর্ব্বতোভাবে সুসিদ্ধ হইয়াছে, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

পাঠ্যাবস্থা হইতেই বঙ্কিমের বাঙ্গালা রচনা করিবার বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি গুপ্ত-কবির "প্রভাকরে" মাঝে মাঝে রচনাদি প্রকাশ করিতেন। এই সময়ে "ললিতা-মানস" নামক একখানি ক্ষুদ্রাকার কাব্য গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। "দুর্গেশ-নন্দিনী"তে বঙ্কিমের মহীয়সী প্রতিভার প্রথম জাগরণ দেখা দিল। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাসের ভাষায় বলিতে গেলে,—"This splendid work, interpersed with some fascinating landscape delineation * * * came upon the public like the dawning of a new sun in the skies. It was a delightful open sesame to a young novelist's dreams at Romance and peotry." "দুর্গেশ-নন্দিনী"র পরই বঙ্কিমের অমর গদ্যময় কাব্য "কপাল-কুণ্ডলা" রচিত হয়।

কবিত্বের দিক্ দিয়া "কপাল-কুণ্ডলা" বঙ্কিমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি। "কপাল-কুণ্ডলা" বঙ্গ-সাহিত্যে অতুলনীয়,—ইহার তুলনা স্থল বিশ্বসাহিত্যেও

বোধ হয় বড় বেশী মিলিবে না। মনুষ্য-সমাজের সংসর্গ-বিবর্জ্জিত প্রকৃতির নিভৃত নিকেতনে আবাল্য প্রতিপালিতা কানন-কুমারীকে সমাজে আনিয়া স্থাপন করিলে কিরূপ ঘটে, তাহাই "কপাল-কুণ্ডলা"তে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকৃতি-দুহিতা কপাল-কুণ্ডলার চিত্র সম্বন্ধে বঙ্কিমের জনৈক প্রসিদ্ধ সমালোচক লিখিয়াছেন,—"কপাল-কুণ্ডলার প্রকৃতি আমাদিগের এ সমাজের ভাবাদ্বারা বর্ণনা করাও অসাধ্য। * * * কপাল-কুণ্ডলার অভিধান স্বতন্ত্র এবং আদ্যন্ত এই অভিধান স্বতন্ত্র রাখিতে পারাতেই কবির অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ স্বভাব সন্তান, কই আর ত কোথাও দেখিতে পাই না? দেখাইবে মিরান্দাকে? মিরান্দাও অপূর্ব্ব সৃষ্টি বটে, কিন্তু যে বালিকা কাননাভ্যন্তরে প্রতিপালিতা হইয়াও স্বামীর সহিত খেলিবার সময় **you play me false my lord** বলিতে পারিল তাহার সহিত কি আমাদের এই কপাল-কুণ্ডলার তুলনা হয়? দেখাইবে শকুন্তলাকে? কই শকুন্তলায় ত কপাল-কুণ্ডলাত্ব দেখাইবার চেষ্টা করা হয় নাই। * * কপাল কুণ্ডলা কবির সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। এরূপ চরিত্রে এরূপ সামঞ্জস্য আর কোথাও দেখিতে পাইনা।" ইহার পর মৃণালিনীর উদ্ভব। মৃণালিনী কপাল-কুণ্ডলারই এক অভিনব সংস্করণ এবং দাম্পত্য প্রেমের একটা দিকের বিশদ বিশ্লেষণ। এতদ্ভিন্ন ইহাতে দেশানুরক্তির যে ফল্গু-ধারা পরিদৃষ্ট হয়, উহাই ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া, "আনন্দ-মঠে" জাহ্নবীর মুক্তপ্রবাহে পরিণতি লাভ করিয়াছে। অতঃপর বঙ্কিম "বিষবৃক্ষ", "কৃষ্ণকান্তের উইল", "চন্দ্রশেখর", "আনন্দ-মঠ", "দেবী চৌধুরাণী" ও "সীতারাম" প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে অমরতা লাভ করিয়াছেন।

বঙ্কিমের উপন্যাসে প্রেম ও দাম্পত্য-ধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ

স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর আকর্ষণ এবং স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ এই বিশ্বসৃষ্টি মধ্যে এক অতি অপূর্ব্ব রহস্য। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই এই সৃষ্টি স্রোত অপ্রতিহত

গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। জনৈক সুধী লেখকের ভাষায় বলিতে গেলে,—"ঐ যে দিগন্তব্যাপী সংসার চক্র মহান্ কোলাহল করিয়া দিবানিশি অবিশ্রান্ত বিঘূর্ণিত হইতেছে, স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধই ইহার প্রধান কারণ। * * তত্ত্বদর্শী মনীষিগণ স্ত্রীপুরুষের এইরূপ নৈসর্গিক প্রবল আকর্ষণ দৃষ্টি করিয়া ইহা হইতে ভগবানের অভিপ্রেত শুভফল উৎপাদন-মানসে বিবাহ-প্রথার প্রচলন করিলেন। ক্রমে মানব-সমাজে এই শুভ-প্রথা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সমস্ত সভ্য জাতিই ইহার শুভফল ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে একমত হইয়া পরিণয়-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন, স্বাভাবিক রহস্য সামাজিক রহস্যে পরিবৃত হইয়া আরও সুন্দর হইয়া দাঁড়াইল।" ভালবাসা রহস্যের এবং দাম্পত্য জীবনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং অবস্থা প্রকার ও পাত্র ভেদে ইহার যেরূপ প্রভেদ ঘটিতে পারে তাহারই বিশদ আলোচনা বঙ্কিমের উপন্যাস সমূহের মর্ম্মকথা। প্রেমের বিভিন্নমুখী গতি এবং পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ লইয়াই তাঁহার উপন্যাস। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার উপন্যাসগুলি প্রেমেরই এক একটী লীলাবৈচিত্র্য। বঙ্কিম বুঝিয়াছিলেন, পরিবারের উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি এবং সমাজের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি। কেননা পরিবারকে লইয়া সমাজ ও দেশ—ব্যষ্টিকে লইয়াই সমষ্টি। দেশকে উন্নত করিতে হইলে পারিবারিক জীবনকে উন্নত করিতে হইবে, পারিবারিক জীবনকে উন্নত করিতে হইলে, দাম্পত্য ধর্ম্মকে উন্নত আদর্শে গড়িতে হইবে। কেননা এই পরিবারের উন্নতি উচ্চতম দাম্পত্য আদর্শের উপরই নির্ভর করে। তাই বঙ্কিম দীর্ঘকাল-ব্যাপী এই দাম্পত্য ও পারিবারিক আদর্শেরই চিন্তা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বদেশ-প্রেমাত্মক উপন্যাস "আনন্দ-মঠ" এই দাম্পত্য ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে স্বদেশ প্রেমকে সংগ্রথিত করিয়াছে।

বঙ্কিমের স্বাদেশিকতার আদর্শ ও আনন্দমঠ

ইংরাজের সহিত এবং ইংরাজের সাহিত্য, ইতিহাস ও ভাবধারার সহিত পরিচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের গণতন্ত্র, জাতীয়তা এবং স্বাধীনতার

অগ্নিমন্ত্র নব্যবঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা-সমর, ফরাসীর রাষ্ট্রবিপ্লব এবং মৃত গ্রীসে নব জীবন-সঞ্চারের কাহিনী বঙ্গীয় নব্য-শিক্ষিত-হৃদয়গুলিকে উদ্বেলিত করিতে লাগিল। হেম, নবীন ও মধুতে তাহার অভিব্যক্তি আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। এই অনুপ্রেরণা ও উন্মাদনাকে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়গণের উপযোগী এবং ভারতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য ও ভাবধারার সহিত সামঞ্জস্য সাধন করিয়া গ্রহণ করিতে মনস্বী বঙ্কিমই সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাতে বঙ্কিম যে কি অপূর্ব্ব মনস্বিতা ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বঙ্কিমের স্বাদেশিকতা ধর্ম্মের ভিত্তি, এবং ত্যাগের আদর্শের উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত। এই স্বাদেশিকতা বা দেশাত্মবোধ পাশ্চাত্যের দেশাত্মবোধ অপেক্ষা অনেক উচ্চ ও অনেক শ্রেষ্ঠ। পাশ্চাত্য দেশাত্ম-বোধের মূল সূত্র প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতা। তত্রত্য জাতি বা সম্প্রদায়-বিশেষের ধারণা এই যে, আমরাই বড় হইব, অপরাপর জাতিগুলিকে মারিয়া কাটিয়া পর্য্যুদস্ত ও উৎসন্ন করিয়া দিয়া, তাহাদিগের শিল্প, বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্য লইয়া কেবল আমরাই শক্তিশালী জাতি হইয়া উঠিব। ইঁহাদের স্বদেশানুরাগ শুধু স্বীয় প্রদেশের সীমার মধ্যেই সন্নিবদ্ধ। ইঁহারা বিশ্বজনীনতা সম্বন্ধে যে সকল লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়া থাকেন কার্য্যতঃ স্বীয় প্রদেশের চতুঃসীমাই তাহার পরিসর-ক্ষেত্র। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষ জগতের কল্যাণ-কামনা লইয়াই ইতিহাসে পদার্পণ করিয়াছে। ভারত জগতের শাশ্বত মঙ্গল-চিন্তাতে নিরত হইয়াই তুচ্ছ পার্থিব রাজ্য-শাসনের কার্য্য উপেক্ষা করিয়া তপোবনের আদর্শটীকেই প্রাধান্য প্রদান করিয়াছে। এখনও হিন্দু-সন্তান প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যায়—"জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়"—জগতের কল্যাণের জন্যই শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করে। ঋষি বঙ্কিমের স্বাদেশিকতায় মূলে হিন্দুর এই উদার—অত্যুদার নীতিটীই প্রতিষ্ঠিত। আদর্শ দাম্পত্য, আদর্শ পরিবার, আদর্শ সমাজ ও আদর্শ স্বদেশ গঠন করিয়া, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে

অবহিত হইয়া, ভগবানের প্রীত্যর্থ জগতের হিতসাধনের ভাবটাই ইহাতে মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং ঋষি ও সন্ন্যাসীর অনুশাসনে শাসিত। ধর্ম্মের ভিত্তি ভিন্ন এখানে কিছুই দাঁড়াইতে পারে না। বঙ্কিমও ইহার ভিত্তি ধর্ম্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাই বিষয়নিস্পৃহ, স্বেচ্ছায় সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী সত্যানন্দ ও ভবানীপাঠককেই এই অভিযানের সেনাপতি-পদে বরণ করা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বঙ্কিম দাম্পত্য ধর্ম্মের সংমিশ্রণে স্বদেশানুরাগের প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। "আনন্দ-মঠ" এই উচ্চতম স্বদেশানুরাগ এবং শ্রেষ্ঠতম দাম্পত্য ধর্ম্মের প্রয়াগ-সঙ্গম। "দেবী চৌধুরাণী"তে এই মহান্ দাম্পত্য আদর্শের সূচনা—আর "আনন্দ-মঠে" ইহার চরমতম পরিণতি। যুদ্ধান্তে গ্রন্থকার শান্তি ও জীবানন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "হায়! আসিবে কি মা? জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা আবার গর্ভে ধরিবে কি?" সমালোচক শশাঙ্কমোহন বলেন, "বঙ্কিম একদিকে নিষ্কাম কর্ম্ম সন্ন্যাসের মধ্যেই দেশানুরাগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, অন্যদিকে ভারতবর্ষীয় সংযম নিষ্ঠা, উন্নত জীবন সাধনা এবং দম্পতির পরস্পর-প্রাণতার স্থির আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন; পরিশেষে আদর্শের তুহিন-শীর্ষে—সংসারের মর্য্যাদা-শিখরে—অনন্ত লক্ষী ধর্ম্ম মন্দিরের মধ্যে দাম্পত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং পরম আনন্দোচ্ছ্বাসে এই আনন্দ-মঠের উপসংহার করিয়াছেন। সংসারে এবং সন্ন্যাসে, গৃহে এবং বনে আনন্দ-মন্দির-প্রতিষ্ঠার নামটাই 'আনন্দ-মঠ'।"

উপন্যাসের বিভিন্ন লক্ষ্যঃ—এক সম্প্রদায় বলেন, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি এবং চিত্তবিনোদনই উপন্যাসের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। অপর সম্প্রদায়, বলেন যে, উপন্যাসের লক্ষ্য শুধু সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি এবং চিত্তবিনোদনই নহে, লোকশিক্ষা এবং আদর্শ প্রচারও উপন্যাসের অপরিহার্য্য উদ্দেশ্য

হওয়া প্রয়োজন। আমাদের মতে কবি বা ঔপন্যাসিকের কার্য্য কেবল মাত্র স্কুল মাষ্টারী করা নহে, নব নব সৌন্দর্য্যের অবতারণা ও চিত্তবিনোদনই কবি বা সাহিত্য-রসিকের প্রধান কার্য্য। এই গুণেই তিনি কবি বা সাহিত্য রসিক, এইখানেই স্কুল মাষ্টার বা ধর্ম্মযাজকের সহিত তাঁহার পার্থক্য। সৌন্দর্য্য ও রস সৃষ্টির দিকে সম্পূর্ণ অবহিত হইয়া, তাহার মধ্য হইতে যত ইচ্ছা শিক্ষাদান ও আদর্শ প্রচার করুন না কেন তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু লোক-শিক্ষা বা আদর্শ প্রচারকেই প্রাধান্য দিলে, সাহিত্য সাহিত্য না হইয়া দর্শন বা নীতি-শাস্ত্রে পরিণত হয়। বঙ্কিমের "দুর্গেশ-নন্দিনী", "মৃণালিনী" ও "কপাল-কুণ্ডলা" কোনও উদ্দেশ্য সাধনার্থ লিখিত হয় নাই। এই স্তরের উপন্যাসগুলির মধ্যে "কপাল-কুণ্ডলা"ই যে অনুপম তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাসগুলি উদ্দেশ্যমূলক হইলেও অনুপম কাব্যশ্রী, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও অসামান্য শিল্প-সমাধান-নৈপুণ্যে উহারা চির সমুজ্জ্বল। এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত "কৃষ্ণকান্তের উইল" বঙ্গ-সাহিত্যে নিরুপম। ইহা বঙ্কিমের দাম্পত্যাদর্শে সূক্ষ্মদৃষ্টি ও শ্রেষ্ঠ শিল্পি-প্রতিভার বিজয়-স্তম্ভ। কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী "দেবী চৌধুরাণী" ও "সীতারাম" প্রভৃতিতে বঙ্কিম আদর্শ প্রচারের দিক্‌টা বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাই কাব্যাদর্শের দিক্ দিয়া এগুলি যেন অনেকখানি নামিয়া পড়িয়াছে।

বঙ্কিমের "আনন্দ-মঠ" ও "দেবী চৌধুরাণী"তে স্বদেশ-সেবা অভিপ্রায়ে যেরূপ দস্যুবৃত্তি অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়, এই ধরণের দস্যুবৃত্তির দৃষ্টান্ত **Scot, Lytton** ও **Byron**এর মধ্যেও মিলে। বঙ্কিমের "দুর্গেশ-নন্দিনী"তে **Ivanhoe**এর ছায়া পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। দুর্গেশ-নন্দিনীর বিদ্যাদিগ্‌গজে যে **humour** পরিদৃষ্ট হয়, তাহা অনেকটা **Shakespeare**এর **falstuff** এবং অন্যান্য ইংরাজী গ্রন্থ-বর্ণিত **fools** দিগের অনুরূপ।

বঙ্কিমের হিন্দু আদর্শঃ—বঙ্কিম সর্ব্বতোভাবে ভারতীয় শিল্পী,—কালিদাস প্রভৃতির শিল্প-রাজ্যের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। বঙ্কিমে হিন্দু শিল্পাদর্শের—ভারতীয় ফলশ্রুতি আদর্শের পূর্ণ অভিব্যক্তি।

রবীন্দ্রনাথ

"বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই বলে
কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি
গান গেয়ে কবি জগতের তলে
স্থান কিনে দাও তুমি।"

কবির সংক্ষিপ্ত জীবনকথাঃ—সাধারণ ছেলেরা যে বয়সে হাতে-খড়ি দিয়া বিত্তালয়ে প্রবিষ্ট হয়, রবীন্দ্রনাথও সেই বয়সে বিত্তালয়ে প্রবিষ্ট হন। দুর্ভাগ্যবশতঃ নহে—বরং সৌভাগ্যবশতঃই বলিব বিত্তালয়ের অধীত-বিত্তা-লাভ তাঁহার বিশেষ ঘটে নাই। গিলিয়া উদ্গীরণ করিবার নিমিত্ত বিত্তালয়-নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যে মনোনিবেশ করা জগতের শ্রেষ্ঠ বাণী-বরপুত্রের পক্ষে আদৌ উপযোগী হয় নাই। অন্যান্য বিষয়ে মনোনিবেশে বিরত হইলেও বাঙ্গালা পড়িবার ঝোঁক তাঁহার খুব বেশী ছিল। তিনি না পড়িয়াছেন এমন বাঙ্গালা পুস্তক তখনকার দিনে খুব কমই পাওয়া যাইত। নিম্ন-বিত্তালয় পরিত্যাগ করিয়া কবি যখন ইংরাজী বিত্তালয়ে প্রবিষ্ট হন, তখন পিতা দেবেন্দ্রনাথ রবিকে হিমালয় ভ্রমণে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। হিমালয় ভ্রমণান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অত্যল্পকাল পরেই কবির মাতৃবিয়োগ হয়। তাহার পর হইতে রবিকে বিত্তালয়ে পাঠান নিতান্ত অসাধ্য হইয়া পড়ে। এইখানেই তাঁহার বিত্তালয় জীবনের পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু তাঁহার বাঙ্গালা পড়িবার ঝোঁক ক্রমেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

কবির প্রথম রচনা ঠাকুরবাড়ী হইতে প্রকাশিত "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই "ভারতী" পত্রিকার প্রতিষ্ঠা-সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ১৬ বৎসর হইয়াছিল। ১৭ বৎসর বয়সে কবি বিলাত যাত্রা করেন। তৎপূর্ব্বে আমেদাবাদে তাঁহার ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথের নিকট কিছুকাল ছিলেন। এই স্থানে অবস্থান সময়ে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। ইতঃপূর্ব্বে পিতার নিকট কিছু কিছু ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই কবি ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন হইয়া উঠেন। ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিলাত হইতে ফিরিবার পর তাঁহার "ভগ্ন-হৃদয়", "সন্ধ্যা-সঙ্গীত" ও "প্রভাত-সঙ্গীত" প্রকাশিত করেন। ইহার পর ক্রমান্বয়ে "প্রকৃতির প্রতিশোধ"নামক নাট্য-কাব্য, এবং "ছবি গান" ও "মানসী" রচিত হয়। "মানসী"র অনেক কবিতা গাজীপুর অবস্থানকালে লিখিত হইয়াছিল। এই সময়ে পশ্চিমের কোন মনোরমস্থানে নিভৃত কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিবার স্পৃহা কবির হৃদয়ে বলবতী হইয়াছিল। কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অতঃপর গাজীপুর হইতে ফিরিয়া গো-শকটযোগে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া বরাবর পেশোয়ার পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিবার সংকল্প করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পিতার আদেশে জমীদারীর কাজ-কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণজন্য কবিকে নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার শিলাইদহ নামক স্থানে আগমন করিতে হয়। এখানে আসিয়া কবি বাঙ্গালার গ্রাম্য প্রকৃতি এবং পল্লী-জীবনের সুখদুঃখ, হাসি কান্না এবং সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠতম-ভাবে পরিচিত হন। অজ্ঞাত, অখ্যাত, দীন শিলাইদহ পল্লীখানি কবি-ভূস্বামীকে বুকে ধরিয়া আজ সাহিত্য-জগতে অমর হইতে চলিয়াছে। রবীন্দ্র নাথের শিলাইদহের জীবন সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় সমালোচক অজিত কুমার লিখিয়াছেন, —"এ সময়ের জীবনটী প্রকৃতির একটী অতি নিবিড় উপভোগের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ছিল। নৌকাবাসের জীবন—নদীতে নদীতে ভ্রমণ—কখনো জনশূন্য পদ্মার বালুচরে কখনো গ্রামের ঘাটে বোট বাঁধিয়া থাকা। * * * 'নিমগ্নপ্রায়

ধানের' পাশ দিয়া নৌকা-যাত্রা—কি চমৎকার পরিপূর্ণ দিনগুলি তখনকার, তাহা কেবল কবিতা হইতে নহে, তাঁহার 'গল্পগুচ্ছ' এবং সেই বয়সের অনেকগুলি চিঠি হইতে বেশ বুঝিতে পারি। বাংলার গ্রাম্য জীবনের যে সকল ছবি, যে সকল ঘটনা চোখে পড়িতেছিল বা কানে আসিতেছিল তাহাকে গল্পের সূত্রে ধরিয়া প্রকৃতির ভাবের দ্বারা গাঁথিয়া তুলিয়া প্রকাশ করাই গল্প লিখিবার ভিতরের কারণ।" এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩০৮ সালের মধ্যে তাঁহার "সোনার-তরী", "চিত্রা", "চৈতালী", "কথা" ও "কাহিনী" প্রভৃতি রচিত হয়। "কথা" ও "কাহিনী"র রচনার কালে কবি ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। বৌদ্ধযুগে এবং শিখ ও মারাঠা জাতির অভ্যুত্থানসময়ে দেশময় যে প্রচণ্ড ত্যাগ ও আত্মবিসর্জ্জনের বন্যা ছুটিয়াছিল, সেই অপূর্ব্ব ত্যাগের কাহিনীগুলিকেই রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের মধ্য হইতে সঞ্জীবিত করিয়া তুলেন। "নৈবেদ্য" রচনার সময় অর্থাৎ ১৩০৮ সাল হইতে "বঙ্গদর্শনে"র সম্পাদকতা গ্রহণ করিবার সময় হইতেই কবির স্বাদেশিক জীবনের সূত্রপাত হয়।

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার আদর্শ ঃ—রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার আদর্শ অনেকটা বঙ্কিমেরই অনুরূপ। ইহা ভারতীয় ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং ধর্ম্মের সুমহৎ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কবি ভারতীয় সমাজ-শক্তিকে সর্ব্বাগ্রে সবল করিয়া তুলিতেই সমধিক অবহিত। ইউরোপে রাষ্ট্র বা State যেমন সকল স্বাতন্ত্র্য ও সকল বিচ্ছেদকে সমন্বয়ের সূত্রে গাঁথিয়াছে, ভারতে সমাজ তেমনি সকল বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার ঐক্য সাধন করিয়াছে। ইউরোপীয় আদর্শের রাষ্ট্র-সূত্রে সমন্বয় আমাদের দেশে কোন দিন ছিলনা, কিন্তু সমাজই চিরদিন আমাদিগকে ঐক্য-সূত্রে বাঁধিয়া সব বিভিন্নতার সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছিলেন। এখন আমাদিগকে বাঁচিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে এই সমাজ নামক প্রতিষ্ঠানটীকেই পুনরায় সুদৃঢ় করিয়া

তুলিতে হইবে। নচেৎ আমাদিগের ধ্বংস অনিবার্য্য। শ্রদ্ধেয় সমালোচক অজিতকুমারের ভাষায় বলিতে গেলে কবির অভিমত এই যে,—"ইউরোপীয় জাতিদের যেমন 'নেশন' সকল স্বাতন্ত্র্যকে, সকল বিচ্ছেদকে ঐক্য দিয়া রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে জোরালো করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের তেমনি বহুকালের একটা সমাজ আছে * * তাহাকে প্রাণদিয়া খাড়া করিয়া রাখাই আগে প্রয়োজন। সেইখানেই আমাদের সমস্ত জাতি মিলিবে। সেইখানেই আমাদের সমস্ত সেবা সমস্ত পূজা আসিয়া উপস্থিত হইবে। "স্বদেশী-সমাজ"কে জাগ্রত না করিলে আমরা বিদেশের আক্রমণ স্রোতে ভাসিয়া যাইব—পৃথিবীর ইতিহাস হইতে আমাদের নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ইহা যদি সত্য হয় যে, অনুকরণ করিয়া আমরা বাঁচিব না—কোনও জাতিই কোন দিন বাঁচে নাই তবে আমাদের ইতিহাসের ভিতর হইতেই আমাদের প্রাণ পাইতে হইবে। এবং আমাদের ইতিহাসে যখন কোনও দিনই আমরা নেশন গড়ি নাই অথচ সমাজের সূত্রে যখন আমাদের ঐক্যও একটা স্থির হইয়াছিল এবং আছে এখনও, তখন সেই সমাজকে কালের উপযোগী করিয়া অথচ প্রাচীনের নিত্য আদর্শের সঙ্গে সঙ্গত করিয়া গড়িতেই হইবে।" রবীন্দ্রনাথের স্বদেশানুরাগ তাঁহার বিশ্বানুভূতি হইতেই উৎসারিত,—মূলতঃ অপরিসীম ভগবৎ-প্রীতির পুণ্যসলিলে স্নাত হইয়া ইহা পূত, পবিত্র, ও অনবদ্য।

১৩১২ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ একজন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রাণময়ী বক্তৃতা ও মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীতে দেশবাসীকে সত্য ও আদর্শের পথে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। অতঃপর বৃহত্তম ভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া কবি আন্দোলনের দল হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করেন। স্থূলবুদ্ধি জনসাধারণ এজন্য সেদিন কবিকে নানারূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ ও গালি-গালাজ করিতেও ত্রুটি করে নাই।

ইহার পর "খেয়া" এবং জগতের গীতি-সাহিত্যে অতুলনীয় "গীতাঞ্জলির" রচনা-কাল। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালা ১৩০৯ সালে কবির পত্নী-বিয়োগের পর

তাঁহার অভিনব কাব্য "শিশু" রচিত হয়। এই "গীতাঞ্জলি"র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ "নোবেল পুরস্কার" লাভ করেন।

রবীন্দ্র-পরিচয়

রবীন্দ্র-গীতির কথা ভাবিতে গেলে মনে হয়,—উপনিষদের যুগে ভারতের চিত্তক্ষেত্রে যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, বৈষ্ণব-যুগে চৈতন্যের প্রেমাশ্রু-সেচনে অভিসিক্ত হইয়া উহা অঙ্কুরিত হইল। তৎপর রবির প্রতিভা-কিরণ এবং পাশ্চাত্যের সজল হাওয়া সংযোগে উহা আজ শান্তি ও সান্ত্বনার ছায়া সমন্বিত মহামহীরূহে পরিণত হইয়াছে।

কবির জীবন-দেবতা

রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং রবীন্দ্রের সাধন তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, সর্ব্ব প্রথমে কবির এই জীবন দেবতাকে বুঝিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বের চরম সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব বা বৈষ্ণবগণ কথিত নিখিল রসামৃত মূর্ত্তিকেই তাঁহার চিরজনমের জীবনদেবতারূপে পরিকল্পনা করিয়া, স্বীয় আত্মাকে বৈষ্ণব কবির শ্রীরাধিকার মত রমণী সাজাইয়াই তাঁহার অভিসারে বাহির হইয়াছেন; তাহা আমরা বৈষ্ণব-পদাবলী আলোচনা-কালে বিবৃত করিয়াছি। এই জীবন দেবতাই তাঁহার প্রাণেশ্বর বা প্রিয়তম; আর ভক্তকবির আত্মা "নবীনা বুদ্ধি বিহীনা বালিকা বধূ।" এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে উপনিষদের তত্ত্ব বৈষ্ণব কবির প্রেমাশ্রুতে ধৌত এবং স্বীয় অসামান্য প্রতিভা-চন্দনে অভিষিক্ত করিয়াই রবি কবি তাঁহার গীতি-কুসুমের মালা গাঁথিয়াছেন।

উপনিষদ-কথিত ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই যে আপনাকে বহুতে পরিণত করিয়া, এই জীব-জগৎ লইয়া, আপনার রসাস্বাদ করিতেছেন, তাহা বৈষ্ণবের "রাধা-কৃষ্ণ"-তত্ত্ব আলোচনা কালে আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। তিনি এক হইয়াও বহু, আবার বহু হইয়াও এক। তিনি যুগপৎ বিশ্বানুগ

(**Immanent**) এবং বিশ্বাতিগ (**transcendent**)। প্রপঞ্চাভিমানী হইয়াও তিনি প্রপঞ্চাতীত। জীবাত্মা ও পরমাত্মার এই লীলা-খেলা আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। পরমাত্মা আপনাকে জীবাত্মারূপে বহুতে পরিণত না করিলে, আপনার রসাস্বাদ করিতে পারেন না এবং জীবাত্মাও তিনি ভিন্ন অপর কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। এই জীবাত্ম-পরমাত্ম-তত্ত্ব,—এই "তুমি আমি"র তত্ত্বই রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা-বাদের গোড়ার কথা। কবি বলেন, তাঁহার "জীবনদেবতা" আবহমান কাল ধরিয়া তাঁহাকে লইয়া নব নব ভাবে ও নব নব রূপে লীলা-খেলা করিতেছেন। তাঁহার সহিত তাঁহার জীবনদেবতার এই লীলা-খেলার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই,—কেবল তাঁহার প্রিয়তমের যখন যেরূপ ইচ্ছা হইতেছে, সেইরূপে কবিকে রূপান্তরিত করিয়া লইতেছেন মাত্র। তাই ঋষি কবি গাহিয়াছেন—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই।
কত দূরকে করিলে নিকটবন্ধু
পরকে করিলে ভাই।
পুরাণো আবাস ছেড়ে যাই যবে,
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে,
আমার নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন
সে কথা যে ভুলে যাই।"

সেই জন্যই ভক্তকবি তাঁহার জীবন-দেবতাকে বলেন,—

"জীবন-কুঞ্জে অভিসার-নিশা
আজি কি হয়েছে ভোর?
ভেঙ্গে দাও তবে আজিকার সভা,
আন নব রূপ আন নব শোভা,

নূতন করিয়া লহ আর বার
চির পুরাতন মোরে।”

ইহার কয়েক শতক পূর্ব্বে কবি বিদ্যাপতিও বলিয়াছিলেন,—

“কত চতুরানন মরিমরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা।”

কবির বিশ্বানুভূতির মূলসূত্র ঃ—রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভূতি বা জল-স্থল-আকাশের প্রতি একাত্মক ভাবের মূলেও তাঁহার জীবন-দেবতার এই লীলা-রহস্যটাই নিহিত। জীবন-দেবতা তাঁহাকে বিভিন্ন জন্মে, বিভিন্ন রূপ জীব-পর্য্যায়, বিভিন্ন মানব-পর্য্যায় এবং বিভিন্ন প্রকার পদার্থ নিচয়ের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতেছেন; এইরূপে এ জগতে তিনি বহুকাল ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া আসিতেছেন—বিশ্ব-সৃষ্টির সমুদায় পদার্থের মধ্যে তাঁহার সত্ত্বা একদিন না একদিন বিদ্যমান ছিল—তাই এ জগতের সকলের সঙ্গেই তাঁহার একটা আত্মীয়তা বা সম্পর্ক আছে।

(১) “আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের ; তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন
যুগ যুগান্তর ধরি।”

(২) “এ সাত মহলা ভবনে আমার,
চির জনমের ভিটাতে

স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা যে গিঠাতে গিঠাতে।"

* * *

"বিশাল বিশ্বের চারিদিক্ হতে
প্রতি কণা মোরে টানিছে
আমার দুয়ারে নিখিল জগত
শত কোটী কর হানিছে।"

রবীন্দ্র-সাহিত্যে অতীন্দ্রিয়তা বা Mysticism

জিজ্ঞাসা প্রবণতা, অনুসন্ধিৎসা, অপ্রাপ্ত বা দুর্জ্ঞেয় বস্তুকে জানিবার জন্য ব্যাকুলতা ও ঔৎসুক্য মানব-মনের একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মানব-চিত্ত চির দিনই সুদূরকে নিকটবর্ত্তী করিবার, অজ্ঞেয়কে জানিবার এবং অপ্রাপ্যকে পাইবার জন্য লালায়িত। এই সৃষ্টি-রহস্যের নিগূঢ় তত্ত্ব বা চরম-সত্যকে জানিবার এবং সম্যগ্‌ভাবে বোধগম্য করিবার জন্য মানব ব্যাকুল-চিত্তে যুগ-যুগান্ত ধরিয়া ছুটিতেছে। কিন্তু জ্ঞান বা মানব-বুদ্ধি এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে ধারণা করিতে সমর্থ হয় নাই,—ইন্দ্রিয়-জগৎ ইহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। ভারতীয় তত্ত্বদর্শিগণ বা ঋষিগণ অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি বলে সেই চরমতম-তত্ত্বের—জ্ঞান বুদ্ধির অগম্য সেই অতীন্দ্রিয়-রাজ্যের সন্ধান পাইয়া, তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন,—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পুরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥"

উপনিষদ এই পরমতত্ত্বের আভাস পাইয়াছিলেন, চরমতম আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি বলে ইহার সহিত একাত্মতা লাভও করিয়াছিলেন; কিন্তু এই অবাঙ্‌-মনসগোচর তত্ত্বকে ইন্দ্রিয়-জগতে আনিতে গেলেই উহা হারাইয়া গিয়াছে।

তাই উহা ধরি ধরি করিয়াও ধরা যায় নাই—কাছে পাইয়াও হারাইয়া গিয়াছে। সেই জন্যই ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি বলিয়াছিলেন,—

নাহং মন্যে সুবেদিতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো ন স্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥"

অর্থাৎ আমি যে ব্রহ্মকে জানি এমনও নহে, আবার জানি না এমনও নহে, এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন। এই অতীন্দ্রিয়-বাদই রবীন্দ্র-গীতির প্রধান সম্পদ। কবি তাঁহার জীবন-দেবতাকে এমনি করিয়াই ছুঁই ছুঁই করিয়া ছুঁইতে পারেন নাই, চিনিয়াও চিনিতে পারেন নাই, কাছে থাকিয়াও সে 'অরূপরতন' অদৃশ্য হইয়াছে। তাই কবি বলেন,—

"যাব অভিসারে
তাঁর কাছে জীবন সর্ব্বস্ব ধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে।
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানব যাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।"

আবার কখনো বলেন,—

"আমি জানি না চিনি না একথা বলো তো
কেমনে বলি?
খনে খনে তুমি উঁকি মারি যাও
খনে খনে যাও ছলি।"

রবীন্দ্র-গীতি এই আলো-ছায়ার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। অধ্যাপক ইন্দু প্রকাশ বাবুর ভাষায় বলিতে গেলে,—"কবি পরমাত্মাকে দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছেন না, বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না। কখন কবি ব্রহ্ম প্রকাশে

আত্মহারা, কখনো ব্রহ্ম-ধ্যানে কবি তন্ময়—অন্ত জ্ঞান-বিরহিত, কখনো বা তিনি প্রার্থনায় ব্যাকুল, আবার কখনো বা সেই পরব্রহ্মের আভাস মাত্র পাইতেছেন, কখনো বা সে আভাসেরও অভাব অনুভব করিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতেছেন।" এ চিত্র আমাদিগকে বৈষ্ণব-কবির শ্রীরাধাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্রীমতীও এমনি করিয়া বলিয়াছিলেন—"তুঁহু কৈছে মাধব কহবি মোয়।"

রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের অতীন্দ্রিয়তা-বাদিগণ

পাশ্চাত্য সাহিত্যে ব্লেক ও মেটারলিঙ্ক প্রথিতনামা **Mystic** কবি। এই মেটারলিঙ্ককে ইউরোপ অন্যতম **light-giver** রূপে বরণ করিয়াছে। ইঁহাদের অধ্যাত্ম ভাবুকতা বা অতীন্দ্রিয়তা বস্তুতান্ত্রিক ইউরোপের চক্ষে যতই অপূর্ব্ব এবং অভিনব হউক না কেন, ব্রহ্মবিদ্যার জন্মভূমি, ঋষিপুত্রধাত্রী ভারতের নিকট উহা অনেক নিম্নস্তরের। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-ভাবুক মেটারলিঙ্ক নিজেই একজন সংশয়ী, আর ঋষি-বংশধর রবীন্দ্রনাথ পরম বিশ্বাসী। মেটারলিঙ্কে সংশয়-মিশ্রিত অজানার অন্বেষণ, আর রবীন্দ্রনাথে সুস্থির বিশ্বাস ও প্রগাঢ় নিষ্ঠাই পরিস্ফুট।

Symbolism অর্থাৎ প্রতীক বা রূপকবাদ

মানব ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ ও সান্ত হইলেও যিনি বিরাট্, অসীম ও অনন্ত তিনিই তাহার কামনা, সাধনা ও তপস্যার বস্তু। মানব হৃদয় সৃষ্টির আদিকাল হইতেই এই পরম তত্ত্বের সন্ধানে ছুটিয়াছে। কিন্তু একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যায় যে তাহার এই জীবন-পথের সম্বল ও একমাত্র অবলম্বন যে-বুদ্ধি এবং জ্ঞান তাহা তাহার সেই আকাঙ্ক্ষা সাধনের পক্ষে একেবারেই অসমর্থ। তাই বিশ্ব-মানব স্মরণাতীত যুগ হইতে সেই অনন্ত, অচিন্তনীয় ও অনির্ব্বচনীয়কে আয়ত্ত করিতে রূপক বা প্রতীকের

সাহায্য গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। স্বীয় বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গম্য বিষয়সমূহ অবলম্বনেই তাঁহাকে ধারণায় আনিবার প্রয়াস পাইতেছে।

হিন্দুর মূর্ত্তি-পূজা এই প্রতীকবাদেরই একটা দিক্। অনাদি অনন্ত মহাকালের বক্ষে বিশ্ব-প্রকৃতি বা নিসর্গদেবীর ভীষণ রমণীয়রূপের পরিবর্ত্তন দেখাইতে গিয়াই প্রাচীন হিন্দুগণ শিব-কালীর মূর্ত্তি-কল্পনা করিলেন। যীশুর মহান্ আত্মত্যাগ সংসারমুগ্ধ জনগণকে বুঝাইতে ক্রস-রূপকের প্রয়োজন হইল। এইরূপে সেই বিশ্বাতীতকে বা বিশ্বসুন্দরকে আয়ত্ত করিতে গিয়া, আমরাও নিজেদের Temperament বা প্রকৃতি অনুযায়ী আমাদের সংসার, সমাজ ও বাস্তব জীবনের বিভিন্ন প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি। প্রেমিক ও ভাবুকগণ সেই অনাদি সুন্দরকে নিজেদের মত প্রেমিকরূপে, বন্ধুরূপে ও প্রিয়তমরূপে পরিকল্পনা করিয়া সেই প্রেমময়ের চরণে প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। জননীর বাৎসল্য, সখার স্নেহ ও পত্নীর প্রণয়ের মধ্যে তাঁহারই অনন্ত প্রেমের সন্ধান পাইতেছেন। এইরূপ প্রতীক-কল্পনাকে আমরা person symbol নাম দিতে পারি। বৈষ্ণব কবিতা, ও রবীন্দ্র-গীতিতে ইহারই পরিপূর্ণ বিকাশ।

অনেকে আবার সেই অনাদি সত্যকে পুণ্যস্থান বা তীর্থরূপে পরিকল্পনা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে জীবন-সাধনা কেবল সেই তীর্থধামের উদ্দেশে যাত্রা বা যাত্রার উদ্যোগ ব্যতীত অপর কিছুই নহে। Hiltonএর জেরুজালেম যাত্রার উদ্যোগ ও নরোত্তম ঠাকুরের বৃন্দাবন-যাত্রার জন্য ব্যাকুলতা এই place symbol বা স্থান-প্রতীকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার রূপকের সাহায্যে অক্ষম মানব তাহার চির-প্রার্থিত বস্তুর প্রাপ্তি চেষ্টা করিয়া আসিতেছে; ইহাকে state symbol বা অবস্থা-প্রতীক নাম দিতে পারি। ইহারা বলেন যে বিশ্বের চিরন্তন সত্যবস্তু ব্যক্তিও নহেন বা তীর্থস্থানও নহেন। তিনি মানবের অমৃত স্বরূপ অবস্থা মাত্র।

অমৃতের পুত্র মানব অজ্ঞতা বা ভ্রান্তিবশে এই অমৃতত্ব হারাইয়া মৃত্যুর অধীন বলিয়া পরিতাপ করিতেছে। সাধনার দ্বারা, তপস্যার দ্বারা আবার সেই অমৃতত্বের অবস্থা (state of inward purity or perfection) পুনরায় লাভ করা যাইতে পারে। প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ এই অবস্থা প্রতীক-কেই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এই ত্রিবিধ প্রতীক বা রূপকের মধ্যে রবীন্দ্র-কাব্যে ব্যক্তি বা person symbolই যে সমধিক পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহা আমরা উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। এই ব্যক্তিরূপকের প্রকৃষ্ট প্রকাশেই গীতাঞ্জলির সার্থকতা।

পাশ্চাত্য সিম্বোলিষ্টগণঃ—বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য সাহিত্যেও এই সিম্বোলিষ্ট আদর্শ প্রবল। এই রীতির চরমপন্থীগণ অনেক স্থলে কাব্য বা সাহিত্যকে হেঁয়ালিতে পরিণত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সিম্বোলিষ্টগণের মধ্যে বডলেয়ার, ভার্লেন, মেটারলিঙ্ক, মরিয়াস, বিগ্নিয়ার প্রভৃতির নাম সুবিখ্যাত।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রকৃতির স্থান

আমাদের ইংরেজী-নবিশগণের ধারণা যে আমরা প্রকৃতিকে চেতনাময়ী বা চৈতন্যস্বরূপিণী রূপে দেখিতে,—প্রাকৃতিক লীলা-বৈচিত্র্যের মধ্যে লীলাময়ের লীলা-বৈচিত্র্য উপলব্ধি করিতে এবং প্রকৃতিকে একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে কাব্য মধ্যে স্থান দান করিতে শিখিয়াছি পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে। এ বিষয়ে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থই আমাদের সর্ব্ব প্রধান গুরু। কিন্তু তাহা নহে, আমাদের ভারতীয় কাব্যকুঞ্জই এই নিসর্গ কবিতার (nature poems) জন্মভূমি এবং ভারতীয় কবিই এই নিসর্গ কবিতার আদি স্রষ্টা। বেদের উষাসূক্ত, অরণ্যানী সূক্ত, বসুন্ধরা সূক্ত প্রভৃতিতে নিসর্গদেবী ভাবময়ী ও চৈতন্যস্বরূপিণী

"ব্যক্তি"রূপেই স্থান পাইয়াছেন। পরবর্ত্তী সাহিত্যে প্রকৃতির সহিত মানবের অচ্ছেদ্য বন্ধন এবং সমবেদনা ও সহানুভূতির ভাব রামায়ণের সীতা-অন্বেষণ, কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যের সীতা-নির্ব্বাসন এবং "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" নাটকের শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা-প্রসঙ্গে পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও লীলা-বৈচিত্র্যের মধ্যে বিশ্বসুন্দরকে উপলব্ধি করা যাহা রবীন্দ্র গীতিতে চরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহার নিদর্শন আমাদের বৈষ্ণব-সাহিত্যেও মিলে। শ্যামসুন্দরের নবজলধর কান্তির রূপক কল্পনার মধ্যেই ইহার অনেকখানি সার্থকতা নিহিত। নিসর্গ-বৈচিত্র্যের মধ্যে বিশ্বসুন্দরের আভাস পাইয়াই, বৈষ্ণব কবির রাধা যমুনার জলে—সমুদ্রের নীলজলে ঝাঁপ দিতে গিয়াছেন,—মেঘ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। প্রকৃতি-পুরোহিত ইংরাজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থও জানিতেন **"All nature is the reflection of the living God."** জনৈক রসগ্রাহী লেখকের ভাষায় বলিতে গেলে কিন্তু—"ওয়ার্ডসওয়ার্থ রাধার ন্যায় তমালের শাখায় পরিণত হইতে চাহেন নাই—যমুনার জলে গা ঢালিতে পারেন নাই, খাঁটী প্রকৃতি-পূজক হইতে পারেন নাই।" রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বদেব-কবিতা" নিসর্গের মধ্য দিয়া বিশ্বসুন্দরের উপলব্ধির চরমতম অভিব্যক্তি। এই কবিতাটীর সার মর্ম্ম কান্তকবি রজনীর,—

"আছ অনলে অনিলে চির নভোনীলে,
ভূধরে সলিলে গহনে।
আছ বিটপী লতায় জলদেরি গায়
শশী তারকায় তপনে"

অংশে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। "শ্রাবণ-সন্ধ্যা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটী ফুলের সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাঁহার চির-সুন্দরের সৌন্দর্য্য-কণারই একটী প্রকাশ দেখিয়াছেন এবং ফুলকে তাঁহার সেই প্রিয়তমের দূত বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে শ্রাবণের ধারাপাত ও আষাঢ়ের মেঘোৎসবের মধ্যে

সেই নটরাজের আভাস পাইয়াছেন এবং নিসর্গের মধ্য দিয়া কবি সেই নিসর্গরাজের সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন।

প্রকৃতিকে এবং প্রাকৃতিক পদার্থনিচয়কে কবি যেরূপ জীবনময়, ভাবময় ও বিলাসময় রূপে দেখিয়াছেন তাহার তুলনা খুব কমই মিলে। তাঁহার "নব বর্ষা" কবিতা ইংরাজ কবি শেলীর cloud কবিতার সহিত মিলাইয়া পড়িতে গেলে, শেলীর cloud অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত অংশেই মেঘের মধ্যে জীবন ও চেতনার ভাব সমধিক পরিদৃষ্ট হয়।

"ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়াছে কেশ এলায়ে
কবরী এলায়ে?
ওগো নবঘন-নীলবাস খানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি
তড়িৎ শিখার চকিত আলোকে
ওগো কে ফিরিছে খেলায়ে?"

Keatsএর ode to Autumn কবিতার পাশে রবীন্দ্রনাথের "শরতে বঙ্গলক্ষ্মী" কবিতা ধরিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, শরৎ প্রকৃতির চিত্র, তাহার অন্তর্নিহিত আশা, আনন্দ এবং চেতনার ভাব Keats অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথেই বেশী ফুটিয়াছে। "বর্ষা-মঙ্গল" কবিতার নিম্নোক্ত অংশগুলি এই ভাবেরই প্রকৃষ্ট বিকাশ।

(১) "আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,"

(২) "এসেছে বরষা এসেছে নবীন বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন ভরসা।"

নগর জীবনের কৃত্রিমতা, আড়ম্বর ও প্রাণহীনতা প্রকৃত সুখ শান্তি ও পরিতৃপ্তির প্রধান অন্তরায়। তাই ভাবুক, ভক্ত ও প্রেমিকগণ ইহা হইতে দূরে

সরিয়া যাইতেই সমধিক ব্যগ্র। এই নগর সভ্যতার নিষ্ঠুরতায় প্রপীড়িত হইয়াই ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ লোকালয় ছাড়িয়া প্রকৃতির নিভৃত নিকেতনে আশ্রয় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথেও আমরা এই ভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই।

"হায়রে রাজধানী পাষাণ কায়া

* * * *

কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথ-ঘাট,
পাখীর গান কই, বনের ছায়া।

* * * *

ইঁটের পরে ইঁট—মাঝে মানুষ কীট্
নাইকো ভালবাসা—নাইকো খেলা।
দেবে না ভালবাসা দেবে না আলো
সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দীঘির সেই জল শীতল কালো
তাহারই কোলে গিয়ে মরণ ভাল।"

কবি বর্ত্তমান যুগের এই লৌহ লোষ্ট্র সমন্বিত সভ্যতা হইতে পলায়ন করিয়া প্রকৃতির নিভৃত নিকেতন তপোবনের সেই গ্লানিহীন দিনগুলি ফিরিয়া পাইবার জন্যই দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন,—

"দাও ফিরে সে অরণ্য লহ এ নগর,
লহ যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা, হে নিষ্ঠুর সর্ব্বগ্রাসী
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়া রাশি
গ্লানিহীন দিন গুলি।"

বিরাট্ রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভবপর নহে। আমরা প্রধান কয়টী দিকের আভাস দিয়াই এখানে ক্ষান্ত হইলাম।

পৃথিবীতে অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তিই জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। এক একজন এক এক দিক দিয়া দিক্‌পাল হইয়াছেন, কিন্তু এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা আর কাহারও মধ্যে দেখা যায় নাই। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, দার্শনিক, উপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রবন্ধকার, সমালোচক. ভাষাতত্ত্ববিদ্‌, গায়ক ও বক্তা। তিনি যে কি নহেন, তাহা নির্ণয় করাই দুঃসাধ্য। রবীন্দ্রনাথই বঙ্গভাষায় **Psychological Novel** রচনার পথ-প্রদর্শক। তাঁহার প্রদর্শিত পন্থানুসরণ করিয়াই শরৎচন্দ্র যশোমাল্যে বিভূষিত হইয়াছেন।

কবির 'শিশু' কাব্য শিশুমনস্তত্ত্বের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ। রবীন্দ্রনাথই বঙ্গসাহিত্যে **Symbolic** ও **Mystic** নাটকের অবতারণা করিয়াছেন। এগুলি ব্রাউনিং মেটারলিঙ্ক ও শেলী প্রভৃতির রূপক নাট্যগুলির সহিত তুলিত হইতে পারে। ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ লেখক খুব কমই মিলে। তাঁহার "প্রাচীন সাহিত্য" ও "আধুনিক সাহিত্য" সমালোচনা সাহিত্যে এক অভিনব সম্পদ।

